একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন

প্রাক্-স্নাতক বাঙলা পাঠপর্ষৎ
কর্তৃক সংকলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০০

প্রথম প্রকাশ—১৯৯২
দ্বিতীয় প্রকাশ—২০০০

মূল্য : ৭০ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস-এর সুপারিনটেন্‌ডেন্ট শ্রীপ্রদীপ কুমার ঘোষ কর্তৃক
৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—৭০০ ০১৯ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

প্রবন্ধ সূত্র

সৌন্দর্যের সন্ধান ঃ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ; ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার ঃ বিচিন্তা ; ইতিহাসের মুক্তি ঃ প্রসঙ্গ ইতিহাস ; পটুয়া শিল্প ঃ যামিনী রায় ; ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঃ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস ; বাঙালীর রুচি ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে ; শিক্ষা ও বিজ্ঞান ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনাসংগ্রহ ; মার্কস্‌বাদ ও মনুষ্যধর্ম ঃ বক্তব্য ; দেশের জাগরণ ঃ শাশ্বত বঙ্গ ; ইল্ ফাশিস্‌মো ঃ প্রসঙ্গ ইতিহাস ; রামকথার প্রাক্-ইতিহাস ঃ রামকথার প্রাক্-ইতিহাস ; প্রগতি ও পরিবর্তন ঃ কুলার কালপুরুষ ; সংস্কৃতির গোড়ার কথা ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর ; যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা ঃ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ; সাধু ও সজ্জন ঃ পথের শেষ কোথায় ; ভাষা ও রাষ্ট্র ঃ স্বদেশ ও সংস্কৃতি ; যামিনী রায় ঃ যামিনী রায় ; সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব ঃ বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ; চার্বাক ও লোকায়ত ঃ ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে ; রাজা রামমোহন রায় ঃ অর্থনীতির পথে ; সাংবাদিকতা ও কিংবদন্তী ঃ সরোজ রচনাবলী (২য়) ; কৃষি সমস্যা ও আমরা ঃ সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা।

প্রাক্ কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক বাংলার পাঠ্য-গ্রন্থ হিসেবে 'একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হল। যে দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি এই সংকলন গ্রন্থটি সে সম্পর্কে পর্ষৎ-এর পক্ষ থেকে দুএকটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাংলা প্রবন্ধের বয়স সার্ধশত বছর অতিক্রম করেছে। এই কালসীমার মধ্যে রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রথম পর্বের রচনাসমূহে লেখকদের যে চিন্তাধারা প্রকাশিত হতো, তার যথেষ্ট বিষয় গৌরব ছিল, একথা স্বীকার করেও বলা যেতে পারে যে সেখানে রচনার শব্দবিন্যাসে ও যুক্তির পারম্পর্যে জটিলতা ছিল, অনেক সময় অসঙ্গতিতে ভাষাও অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে চিন্তার সমস্ত দ্বার যেমন অবারিত হয়েছে, তেমনি মননে ও নৈয়ায়িকের পরিশীলিত যুক্তি বিন্যাসে তার অবাধ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। বিষয় ও বিষয়ী উভয় গৌরবেই বাংলা প্রবন্ধ তাঁর হাতে শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-সৃষ্টি প্রবন্ধের সীমানাকে আরো প্রসারিত করেছেন। শব্দের লালিত্যে, ভাষাদেহের লাবণ্যে, অলংকারের দীপ্তিতে এবং চিন্তার গভীরতায় প্রবন্ধ আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি। ছন্দের জ্ঞান তাঁর অভ্রান্ত। তাঁর প্রবন্ধের গদ্য কবিত্বের অতিরিক্ত স্বাদুতায় যেমন মনোহর, তেমনি ছন্দের গতি-সৌন্দর্যেও বিশিষ্ট। কারুশিল্পীর কৃতির পরিচয় তাঁর প্রবন্ধের সর্বত্র। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বিচিত্র ও বিভিন্ন। বিষয়ভেদে তাঁর রচনার বর্ণ-বৈচিত্র্যও অসাধারণ ও স্বতন্ত্র। প্রবন্ধে 'বিষয়ীর' আত্মপ্রকাশের এমন সার্থকতা পূর্বে দেখা যায়নি। তাঁর রচনায় এমন একটি প্রসাদগুণ আছে যে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য জটিল-ভাবনার সর্বত্র অনায়াস গ্রন্থি মোচন সম্ভব না হলেও তা সহজেই হয়েছে হৃদ্য। চিন্তার জগতেও তাঁর প্রবন্ধ বহুস্থলেই নূতন মাত্রা যোগ করেছে। রবীন্দ্রনাথ অজস্র নিবন্ধের মধ্য দিয়ে মুখ্যতঃ মননধর্মী এই ধারাটিকে কাব্যরসসুরভিত শিল্পের জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু বাংলা গদ্য নিবন্ধের বিবর্তন ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সাহিত্যে এই বিশেষ ধারাটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। উত্তর-রবীন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার এবং নূতন মানসিকতাকে স্বীকৃতিদান করে নানা ধারা-উপধারায় আজ বহমান। তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরাই 'একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন'-এর মূল লক্ষ্য।

'প্রাক্-স্নাতক বাঙ্‌লা পাঠপর্ষৎ' সাম্মানিক স্তরের বাংলা পাঠ্যবিষয়ের আধুনিকীকরণের কথা স্মরণে রেখে পুনর্বিন্যাস করার সময়, রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের কিছু প্রবন্ধের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে বর্তমান সংকলন গ্রন্থখানি প্রস্তুত করেছেন। সংকলনের সময় সাধারণভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে প্রবন্ধগুলির প্রকাশ-কাল যেন ১৯৪১-এর পরবর্তী হয়। সেই সঙ্গে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র সাহিত্য-সমালোচনায় নিবদ্ধ না থেকে চিন্তা জগতের ভিন্নতম ক্ষেত্রের সন্ধান যেন দেয়। তাই নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি সৌন্দর্যতত্ত্ব, সংস্কৃতি, লোকায়ত ও লোক-সংস্কৃতিসহ ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি সমাজ-ভাবনায় সম্পৃক্ত বিচিত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থীরা চিন্তার বিশাল জগৎ সম্পর্কে কতকটা পরিচিত ও আগ্রহী হয়ে উঠলেই এ সংকলনের সার্থকতা।

পরিশেষে যাঁদের প্রবন্ধ এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাঁদের তথা স্বত্বাধিকারীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটি প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের কর্মীরা এবং সুপারিনটেন্‌ডেন্ট প্রদীপকুমার ঘোষ যে সহযোগিতা করেছেন সে জন্য আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

সৌন্দর্যের সন্ধান

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হল মনে না ধরার ঝগড়া। ইমারতে-ঘেরা বন্দিশালার মতো এই যে শহরের মধ্যে এখানে ওখানে একটুখানি বাগান, অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখি প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই না এরা এইসব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধুলোমাখা রোদে সকাল সন্ধ্যে ডানা মেলে সুরে ছন্দে ভরে তুলছে শহরের বুকের আবদ্ধ অফুলন্ত স্থানটুকু! আর এইসব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে খেলছে ছেলেরা—শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধুলো মাটি, তাই তো খেলছে ওরা ধুলোকে নিয়ে ধুলোখেলা! রথের দিনে রথো সামগ্রী—সোলার ফুল পাতার বাঁশী—তার সুর আর রঙ আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে বুড়োর মেলায়, তাই না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ সোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের কোণটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙা কাচের মতো একখণ্ড আকাশ—ময়লা ঝাপ্‌সা প্রাচীরে-ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোরকাঁটা আর দোপাটি ফুলের খেলাঘর, সবই মনে ধরেছে আমার, তাই না কোণের দিকে মন থেকে-থেকে দৌড় দিচ্ছে, চোরকাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয় তো দোপাটি ফুলের রঙের ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম-রকম, আর থেকে-থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়ারিদের আকাশ-বাতাস-আড়াল-করা চৌতলা পাঁচতলা বাড়িগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে চলেছে বিশ্রী বিশ্রী বিশ্রী! মাড়োয়ারি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপগুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তাদের নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ি আর ভাঙাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের-নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের-নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার-করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাবো তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্যে নানা মুনি নানা মতো আরসী আমাদের জন্যে সৃজন করে গেছেন, সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হত তো মানুষ কোন কালে এই সব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতসী কাচের চশমা বানিয়ে চোখে পরে বসে থাকতো, সুন্দরের খোঁজে কেউ চলতো না ; কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে আমাদের

প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতোকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতোটি।

জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাজকে দেখছে সুন্দর সে দিনরাত কাজের ধান্ধায় ছুটছে, কেউ দেখছে অকাজকে সুন্দর সে সেই দিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দু জনেরই সুন্দর কাজ অথবা সুন্দর রকমের অকাজ! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্বস্ব আগ্‌লাবার সুন্দর চাবিকাটি, বিশ্রী তালাচাবি কেউ খোঁজে না—আর দেখ চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁদ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে, শাক্ত খুঁজছেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়িজুড়ি, বি.এ. পাশের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরি এবং এমন সুন্দর একটি বাসাবাড়ি যেখানে সব জিনিস সুন্দর করে উপভোগ করা যায়। হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনালক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবি-লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে, ধরতে গেলে সব হা-হুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এইজন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়। সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে-জনে মতভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই।

যেভাবেই হোক যা কিছু বা যারই সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে—একটা মনে ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক, আর-একটা মনে না ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক, আমাদের জনে-জনে মনেরও ঐ দু রকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি। কাজেই দেখি, যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে-ভিতরে মিললো তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেলো, না হলেই গোল। রাধিকা কৃষ্ণকে সুরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপকসুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন সমালোচকের সৌন্দর্য সমালোচনার উপর নির্ভর করে এই দুই মূর্তির বিচার করবো? আ-কা-শ এই তিনটে অক্ষরে আকাশ জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভালো, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে 'নব-নীরদ-শ্যাম' যা দেখে চোখ ভুললো মন ঝুরলো, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়লো সেই সুন্দর। সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের-নিজের মন। পণ্ডিতের কাজই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে দেখতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল-তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রীসে হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে

সুন্দর বলে স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্তিকেই সৌন্দর্যসৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ-বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোন আর্টিষ্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, ঐটেই সুন্দর। আমাদের দেশ যখন বললে—সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না, সুন্দর করে দেবমূর্তি গড়ো সেই ভালো, ঠিক সেই সময় গ্রীস বললে—না, মানুষকে করে তোল সুন্দর দেবতার প্রায় কিংবা দেবতাকে করে তোল প্রায় মানুষ! আবার চীন বললে—খবরদার, দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্যকে একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে বা মূর্তিতে। নিগ্রোদের আর্ট, যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিষ্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য রঙ-রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিষ্টের নিজের-নিজের মনে ছাড়া বাইরে নেই, কোনো কালে ছিল না, কোনো কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হত তবে এতদিনে সৌন্দর্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোনো-এক বেরসিক পরম সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে যেতো তথাকথিত কলারসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বললে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে-জনে মনে-মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেন নি। তাঁর সৃষ্টি এটি সুন্দর অসুন্দর দুই-ই, এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণও নয় পরিপূর্ণও নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে-অশান্তিতে সুখে-দুঃখে সুন্দরে-অসুন্দরে মিলিয়ে হল ছোট এই নীড়, তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশির-বিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চললো। এই হল প্রথম শিল্পীর মানস কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে কোনো কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিষ্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্য দিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইলো, মিটলো না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোনো দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভরে ওঠার, পাতার ঘন-সবুজ হয়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা মূর্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁচ্‌নী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়, তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখনো পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস ভারত চীন ঈজিপ্ট

সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি, কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে। আজ যেখানে মনে হল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হতে পারে তাই হল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে, হয়নি, আরো এগোতে হবে কিংবা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হবে। পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে-সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এইভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছচ্ছে আর্ট, এবং একটা গতি আর-একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠলো ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর-এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চলো, আরো বাকি আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানাদিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন-নতুন।

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে-মনে ভাবে, সুন্দর! ঠিক সেই সময় আর-একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে ; যে ভাবছিল সে অবাক হয়ে বলে, তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর, অমনি স্বপ্নের মতো ছায়া হেসে বলে, আমার চোখে তুমি সুন্দর! এইভাবে এক আর্টে আর-এক আর্টে, এক সুন্দরে আর-এক সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎজুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে-মনে খেলা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন কালে শেষ হয়ে যেতো। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস্য-অবতার উঠে আসতো তবে সে মানুষ কোনো দিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করতো না, সে তখনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কলম হাতে মাছ বিক্রির হিসেব পরীক্ষা করতে বসতো, আর যদি তখনও খেলার আশা তার কিছু থাকতো তো এমন জায়গায় গিয়ে বসতো যেখানে ছিপে মাছ ধরাই দিতে আসে না, ধরি-ধরি করতে-করতে পালায়! পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্য দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আর্টিষ্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিষ্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয়, খেলা চলেও সেই জন্যে। এক-একটা ছেলে আছে খেলতে জানে না খেলার আরম্ভেই হঠাৎ কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে রস-ভঙ্গ করে দেয় আর সব ছেলেগুলো তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে। তেমনি পরম সুন্দরও যদি আর্টিষ্টদের সামনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে রসভঙ্গ করতে বসেন তবে আর্টিষ্টরা তাঁকে নিয়ে বড় গোলে পড়ে যায় নিশ্চয়ই। আর্টিষ্টরা ভক্তেরা কবিরা—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর-সুন্দর খেলা খেলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অণুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড়হদ্দের সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাজেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে না সৌন্দর্য সম্বন্ধে এ

দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট-স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলো পড়ে নেওয়া সহজ কিন্তু পড়ে তার মধ্য থেকে সৌন্দর্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিষ্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে মনের সামনে অথচ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই। 'সুন্দর কাকে বলো' এই প্রশ্নের জবাবে আর্টিষ্ট ড্যুরার বললেন, 'আমি ওসব জানিনে বাপু' অথচ তাঁর তুলির আগায় সুন্দর বাসা বেঁধেছিল! লিয়োনার্ডো দ্য ভিন্‌চি যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর্ট থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেছে, তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুইই দুর্লভ, পাঁচ-পাঁচিই জগতে প্রচুর।

এক সময়ে আর্টিষ্টদের মনে জায়গা-জায়গা থেকে তিল-তিল করে বস্তুর খণ্ড-খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি রচনা করার মতলব জেগেছিল। গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচ জন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রীসকে চমকে দিয়েছিল। কিছুদিন ধরে ঐ মূর্তিরই জল্পনা চললো বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এলো যে ঐভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা একথাও আর্টিষ্টরা বলে বসলো! আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্তিকেই রম্য বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করলেন, সে শাস্ত্র আর-কিছু নয় কতকগুলো মাপ-জোক এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড নিম্বপত্র এইসব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেণ্ট খাদ্য-সামগ্রী! মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না, কাজেই আমাদের শাস্ত্রসম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগলেও সেখানেই আর্ট শেষ হল একথা খাটলো না। একেষাং মতম্ বলে একটা জিনিষ সে বলে উঠলো 'তদ্‌রম্যং যত্র লগ্নংহিযস্যহৃৎ', মনে যার যা ধরলো সেই হল সুন্দর। এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না-ধরার উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোনো কিছুর একটা আদর্শ থাকে না। ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর-সব অসুন্দর, যেমন শ্রীচৈতন্য বললেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

আর্টিষ্ট বললেন,—কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে ইত্যাদি। যার মন যেটাতে টানলো তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্য সবার চেয়ে। এখন সহজেই আমাদের মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয়—কোন দিকে যাই, ভক্তের ফুলের সাজিতে গিয়ে উঠি, না আর্টিষ্টের বাঁশিতে গিয়ে বাজি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই

দেখা যায়, ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী দুই জনেই চাইছেন একই জিনিষ—ভক্ত ধন চাইছেন না কিন্তু সব ধনের যা সার তাই চাইছেন, জন চাইছেন না কিন্তু সবার যে আপনজন তাকেই চাইছেন, সুন্দরী চান না কিন্তু চান ভক্তি, কবিতা নয় কিন্তু যিনি কবি যিনি স্রষ্টা—সুন্দরের যিনি সুন্দর—তাঁর প্রতি অচলা যে সুন্দরী ভক্তি তার কামনা করেন। আর্টিষ্ট ও ভক্ত উভয়ে শেষে গিয়ে মিলেছেন যা চান সেটা সুন্দর করে পেতে চান এই কথাই বলে। মুখে সুন্দরী চাইনে বললে হবে কেন, মন টানছে বৈরাগীর ও অনুরাগীর মতোই সমান তেজে যেটা সুন্দর সেটার দিকে। মানুষের অন্তর-বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে বিপুল আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুনতে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর, উঠতে চাই, বসতে চাই, চলতে চাই সুন্দর, সুন্দরের কথা প্রত্যেক পদে-পদে আমরা স্মরণ করে চলেছি। পাই না-পাই, পারি না-পারি, সুন্দর বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই এমন লোক কম আছে। যাকিছু ভাল তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। আমরা কথায়-কথায় বলি—গাড়িখানি সুন্দর চলেছে, বাড়িখানি সুন্দর বানিয়েছে, ওষুধ সুন্দর কাজ করছে ; এমন কি পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো সুন্দর হয়েছে একথাও বলি। এমনি সব ভালর সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ, আমাদের মনকে ভালর দিকেই নিয়ে চলে, আর যাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে, সেও তো যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে ধরা এবং মন টানার দিক থেকে সুন্দরে অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে? কাজেই সুন্দর-অসুন্দর দুই মিলে চুম্বক পাথরের মতো শক্তিমান একটি জিনিষ বলেই আমার কাছে ঠেকছে। সুন্দরের দিকটা হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক এবং অসুন্দরের দিকও হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক। এখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে-পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে, আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর-এক ভাবে টানতে-টানতে নিয়ে চলে কদর্যতার দিকেই। কিন্তু সত্যিকার একটা কাঁটা আর চুম্বক নিয়ে যদি এই সত্যটা পরীক্ষা করতে বসা যায় তবে দেখবো সুন্দরের একটা চিহ্ন দিয়ে তারি কাছে যদি চুম্বকের টানের মুখ রাখা যায় তবে কাঁটা সোজা সুন্দরে গিয়ে ঠেকবে নিজের ঘর থেকে, আবার ঐ চুম্বকের মুখ যদি অসুন্দর চিহ্ন দিয়ে সেখানে রাখা যায় তবে ও কাঁটা উল্টো রাস্তা ধরেই ঠিক অসুন্দরে গিয়ে না ঠেকে পারে না। কিন্তু এমন তো হয় যে, আমি যদি মনে করি তবে অসুন্দরের গ্রাস থেকেও কাঁটাকে আরো খানিক টেনে সুন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কিংবা সুন্দরের দিক থেকে অসুন্দরে নামিয়ে দিতে পারি! সুতরাং সুন্দর-অসুন্দরের

মধ্যে কোনটাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দেশকর্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হল তো সুন্দরে গিয়ে লাগলেম, মনে হল তো অসুন্দরে গিয়ে পড়লেম কিংবা সুন্দর থেকে অসুন্দর, অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ বিষয়ে নিয়ন্তা। টানে ধরলে যে চুম্বক ধরেছে তার মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রয়োজন না রেখেই কাঁটা আপনিই তার চরম গতি পায়, কিন্তু এই গতিকে সংযত করে অধোগতি থেকে ঊর্ধ্ব বা ঊর্ধ্ব থেকে অধোভাবের দিকে আনতে হলে আমাদের মনের একটা ইচ্ছাশক্তি একান্ত দরকার। বিল্বমঙ্গল বারবনিতার প্রেমোন্মাদ থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে যে ঠেকলেন সে শুধু তাঁর মনটি শক্তিমান ছিল বলেই। নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টে, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, যার মন অসুন্দর সেও এইভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে। আর্টিষ্ট কবি ভক্ত এঁদের মন এমনিই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ। ভক্ত কবি আর্টিষ্ট সবাই এক ধরনের মানুষ ; সবাই আর্টিষ্ট, আর্টিষ্টের কাছে ভেদ নেই পণ্ডিতের কাছে যেমন সেটা আছে। আর্টিষ্টের কাছে রসের ভেদ আছে, মনের অবস্থাভেদে সু হয় কু, কু হয় সু এও আছে, তাছাড়া রূপভেদও আছে ; কিন্তু সু কুএর যে নির্দিষ্ট সীমা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অপণ্ডিত পর্যন্ত টেনে দিচ্ছে, এ রূপ সে রূপের মাঝে সেই পাকাপোক্ত পাঁচিল নেই আর্টিষ্টের কাছে। নীরসেরও স্বাদ পেয়ে আর্টিষ্টের মন রসায়িত হয়, এইটুকুই তফাত আর্টিষ্টের আর সাধারণের মনে। তুমি আমি যখন খরার দিনে পাখা আর বরফ বলে হাঁক দিচ্ছি আর্টিষ্ট তখন সুন্দর করে খরার দিন মনে ধরে কবিতা লিখলে—'কাল বৈশাখী আগুন ঝরে, কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে! গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই!' রসের প্রেরণা সুন্দর-অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে, আর্টিষ্টের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরে মিলিয়ে এক রসরূপ সে দেখে চললো। আর্টিষ্ট রূপমাত্রকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে—কেন সুন্দর কেন অসুন্দর এ প্রশ্ন অর্টিষ্ট করলে না, শুধু রসরূপে যখন বস্তুটিকে দেখলে তখন সে সাধারণ মানুষের মতো আহা ওহো বলে ক্ষান্ত থাকলো না, দেখার সঙ্গে আর্টিষ্টের মন আপনার সৌন্দর্যের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুন্দর উপায় নির্বাচন করতে লাগলো সুন্দর রঙ চঙ সুন্দর ছন্দোবদ্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম নিয়ে আর্টিষ্টের সমস্ত মানসিক বৃত্তি ধাবিত হল সুন্দরের স্মৃতিটিকে একটা বাহ্যিক রূপ দিতে, কিংবা সুন্দরের স্মৃতিটিকে নতুন-নতুন কল্পনার মধ্যে মিশিয়ে নতুন রচনা প্রকাশ করতে। সুন্দর বা তথাকথিত অসুন্দর দুয়েরই যেমন মনকে আকর্ষণ করবার শক্তি আছে, তেমনি মনের মধ্যে গভীরভাবে নিজের স্মৃতিটি মুদ্রিত করবারও শক্তি আছে—সুতরাং সুন্দরে-অসুন্দরে এখানেও এক। সুন্দরকেও যেমন ভোলবার জো নেই অসুন্দরকেও তেমনি টেনে ফেলবার উপায় নেই। দুই স্মৃতির মধ্যে শুধু তফাত এই, সুন্দরের স্মৃতিতে আনন্দ, অসুন্দরের স্পর্শে মন ব্যথিত

হয়, সুখও যেমন দুঃখও তেমনি মনের একস্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, শুধু দুঃখকে মানুষ ভোলবারই চেষ্টা করে আর সুখের স্মৃতিকে লতার মতো মানুষের মন জড়িয়ে-জড়িয়ে ধরতেই চায় দিনরাত। সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, আর্টিষ্ট মানুষের মনেও তেমনি সহজভাবেই সুন্দর-অসুন্দরের ক্রিয়া হয়, শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাত হচ্ছে মনের অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে। দুঃখ পেলে সাধারণ মানুষ বেজায় রকম কান্নাকাটি শুরু করে, আর্টিষ্টও যে কাঁদে না তা নয়, কিন্তু তার মনের কাঁদন আর্টের মধ্য দিয়ে একটি অপরূপ সুন্দর ছন্দে বেরিয়ে আসে। অসুন্দরের মধ্যে, অ-সুখের মধ্যে আর্টিষ্টের কাছ থেকে রস আসে বলেই আর্ট মাত্রকে সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই কারণে আর্টের চর্চায় ক্রমে সুন্দরের অনুভূতি আমাদের যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন সৌন্দর্য সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পড়ে কিংবা শুনে হয় না। আসলে যা সুন্দর তা কখনও বলে না, আমি এইজন্যে সুন্দর ; আমাদের মনেও ঠিক সেইজন্যে সুন্দরকে গ্রহণ করবার বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না যে, কেন এ সুন্দর! আসলে যে সুন্দর নয় সেই কেবল আমাদের সামনে রঙ মেখে অলঙ্কার পরে হাব-ভাব করে এসে বলে আমি এই কারণে সুন্দর, মনও আমাদের তখনই বিচার করে বুঝে নেয় এ রঙের দ্বারা অথবা অলঙ্কারে বা আর কিছুর দ্বারায় সুন্দর দেখাচ্ছে কি না! আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিষ্ট কিংবা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না, সবাই বলে—সুন্দর ঠেকছে, কেন তা জানি না। কিন্তু সুন্দরের সাজে যে অসুন্দর আসে তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিষ্টের মনে তর্কের উদয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মনের ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে, অসুন্দরের বিচার সেখানে নেই, সব বিচার বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে। যা সুন্দর আমরা দেখেছি তা নিজের সুন্দরতা প্রমাণের কোনো দলিল নিয়ে এলো না কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাতে রত হল, কিন্তু পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠলো সুন্দরকে নিয়ে—তুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি! সুন্দর, সে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরলো বলেই সুন্দর, এ সহজ কথা সেখানে খাটলো না। পণ্ডিত সেই সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করছেন—কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য? সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর, (২) কাজের বলেই সুন্দর, (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর, (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর, (৭) বিচিত্র-অবিচিত্র সম বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর।—এইসব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে ঠিক যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করি না ; তবে আমি এইটুকু বলি—অন্যের কাছে সুন্দর কি বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করছে তা আমাদের

দেখায় লাভ কি? আমাদের নিজের-নিজের কাছে সুন্দর কি বলে আসছে তাই আমি দেখবো। আমি জানি সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাজও দেয় না—বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের! সুন্দর, এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর। আর্টের মধ্যে রীতিনীতি, চক্ষু-জোড়ানো মন-ওড়ানো প্রাণ-ভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিংবা এর যেকোনো একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট বলেই যেমন সে আর্ট সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর। সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনোরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর তেমন সুন্দর সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর! আমাদের জিব যেমন চাখে মেঠাই সন্দেশ সরবৎ ইত্যাদি পৃথক-পৃথক জিনিষের মধ্য দিয়ে মিষ্টতাকে—ঠিক সেইভাবেই জীব বা জীবাত্মা মনোরসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা রয়েছে সেটা নানা বস্তু ধরে মেটাতে চলে। অতএব বলতে হয়, মন যার যেমনটা চায় সেইভাবে সুন্দরকে পাওয়াই হল পাওয়া, আর কারু কথা মতো কিংবা অন্য কারু মনের মতো সুন্দরকে পাওয়ার মানে—না-পাওয়াই। মা-বাপের মনের মতো হলেই বৌ সুন্দর হল একথা যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্য জ্ঞান হয়েছে সে মনে করে না। বৌ কাজের, বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না, এবং হয়তো বা ডাকসাইটে সুন্দরীও হতে পারে অন্য সবার কাছে, কিন্তু ছেলের নিজের মনের মধ্যে কাজ কর্ম সংসার সুরূপ কুরূপ ইত্যাদির একটা যে ধারণা তার সঙ্গে অন্যের পছন্দ-করা বৌ মিললো তো গোল নেই, না-হলেই মুস্কিল। হিন্দিতে প্রবাদ আছে 'আপ্ রুচি খানা—পর রুচি পহেরনা', খাবারের স্বাদ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে নিতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের স্বরাজ, কিন্তু পরনের বেলায় পরে যেটা দেখে সুন্দর বলে সেইটেই মেনে চলতে হয়, না-হলে নিন্দে ; সুতরাং সেখানে কেউ জোর করে বলতে পারে না এইটেই পরি পাঁচজনে যা বলে বলুক, আমরা নিজের বুদ্ধিকেও সেখানে প্রাধান্য দিতে পারিনে, দেশ কাল যে সুন্দর পরিচ্ছদের সম্মান করে তাকেই মেনে নিতে হয়। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট-পালট সময়ে-সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে। যদি সত্যই এই জগৎ অসুন্দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিছক সুন্দর জিনিষ দিয়ে গড়া পরিপূর্ণ সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত একটা কিছু হত তবে এর মধ্যে এসে সুন্দর অসুন্দরের কোনো প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হত না। আমরা এই জগৎ সংসার চিরসুন্দরের প্রকাশ ইত্যাদি কথা মুখে বললেও চোখে তা দেখিনে অনেক সময় মনেও সেটা ধরতে পারিনে, কাজেই অতৃপ্ত মন সুন্দরের বাসনায় নানা দিকে

ধাবিত হয় এবং সুন্দরের একটা সাক্ষাৎ আদর্শ খাড়া করে, দেখার চেষ্টা করে এবং সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমাদের সৌন্দর্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব হয়ে পড়ে তা আর মনেই থাকে না। সুরূপ কুরূপ দুয়ে মিলে সুন্দরের অখণ্ড মূর্তির ধারণা করা শক্ত কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব মানুষের পক্ষে তা বলা যায় না। ভক্ত কবি এবং আর্টিষ্ট এদের কাছে সুন্দর-অসুন্দর বলে দুটো জিনিষ নেই, সব জিনিষের ও ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি সেটিই সুন্দর বলে তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তা অনিত্য, তার সুখ শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই কেবল গ্রহণ করতে পারে সুন্দরের আস্বাদ—সুতরাং মনোরসনা রোগ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো ভীষণ বিপত্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে যৌবনই সুন্দর বার্ধক্য সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, পরিষ্কার দিন বাদলা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, পূর্ণচন্দ্রই চন্দ্রকলা নয়—কেউ একথা বলতে পারে না। যে একেবারেই আর্টিষ্ট নয় শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড ভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্যকে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিষ্ট তাই তিনি বলেছিলেন—"সবহি মূরত বীচ অমূরত, মূরতকা বলিহারী।" যে সেরা আর্টিষ্ট তারি গড়া যাকিছু তারি মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালমন্দ সব মূর্তির মধ্যে অমূর্তি বিরাজ করছেন! "ঐসা লো নহি তৈসা লো, মৈঁ কেহি বিধি কথৌঁ গম্ভীরা লো"—সুন্দর যে অসুন্দরের মধ্যেও আছে এ গভীর কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত তাই কবীর এককথায় সব তর্ক শেষ করলেন "বিছুড়ি নহিঁ মিলিহো"—বিচ্ছিন্নভাবে তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এইযে সুন্দরের অখণ্ড ধারণা কবীর পেলেন তার মূলে কি ভাবের সাধনা ছিল জানতে মন সহজেই উৎসুক হয় ; এর উত্তর কবীর যা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সব আর্টিষ্টের এক ছাড়া দুই মত নেই দেখা যায়—"সংতো সহজ সমাধ ভলী, সাঁঈসে মিলন ভয়ো যা দিনতে সুরত ন অন্তি চলি ॥ আঁখ ন মূদুঁ কান ন রূংধু, কায়া কষ্ট ন ধারূঁ। খুলে নয়ন মৈ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ ॥" সহজ সমাধিই ভাল, হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর, যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই। যার প্রাণে সুর আছে বিশ্বের সুর বেসুর বিবাদী সম্বাদী সবই সুন্দর গান হয়ে মেলে তারি মনে। আর যার কাছে শুধু পুঁথির সুরসপ্তক স্বরলিপি ও তাল-বেতালের বোল মাত্রই আছে, তার বুকের কাছে বিশ্বের সুর এসে তুলোট কাগজের খড়মড়ে শব্দে হঠাৎ পরিণত হয়।

এখন মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সুন্দর-অসুন্দরের যাচাই করবার আদর্শ কোনখানে পাওয়া যাবে এই আশঙ্কা সবারই মনে উদয় হয়। সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই

করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। ধর, সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইলো না, প্রত্যেকে আমরা নিজের-নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চললেম—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিষ্ট যেভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য উপভোগ সৌন্দর্য সৃষ্টির ধারা কি একদিনের জন্য বন্ধ হল জগতে? বরং আর্টের ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোনো জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসলো পুরুষ-পরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকলো। আমাদের সঙ্গীতে সেই তানসেন ও আকব্বরী চাল, ছবিতে দিল্লীর চাল বা বিলাতী চাল যে কুকাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং সেই আদর্শকে উল্টে ফেলে চললেও যা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমস্ত আমাদের সামনেই ধরা রয়েছে, সুতরাং আমার মনে হয় সুন্দরের একটা আদর্শের অভাব হলে তত ভাবনা নেই, যত ভাবনা আদর্শটা বড় হয়ে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও অনুভবশক্তির বিলুপ্তি যদি ঘটায়। কালিদাসের আমলে 'তন্বী শ্যামা শিকরিদশনা' ছিল সুন্দরীর আদর্শ। অজন্তার এবং তার পূর্বের যুগ থেকেও হয়তো এই আদর্শই চলে আসছিল, মোগলানী এসে এবং অবশেষে আরমাণি থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্যন্ত এসে সে আদর্শ উল্টে দিলে এবং হয়তো কোনদিন বা চীনই এসে সেটা আবার উল্টে দেয় তারও ঠিক নেই। আদর্শটা এমনই অস্থায়ী জিনিষ যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুস্কিল। রুচি বদলায় আদর্শও বদলায়, যেটা ছিল এককালের চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল, ছিল টিকি এলো টাই, ছিল খড়ম এলো বুট, এমনি কত কি! গাছগুলো অনেককাল ধরে এক অবস্থায় রয়েছে—সেইজন্যে এইগুলোকেই আদর্শ গাছ ইত্যাদি বলে আমাদের মনে হয় কিন্তু পৃথিবীর পুরাকালের গাছ পাতা ফল ফুলের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অথচ তারাও তো ছিল সুন্দর! —সুতরাং পরিবর্তনশীল বাইরেটার মধ্যে সুন্দর আদর্শভাবে থাকে না। শিশু গাছ বড় গাছ এবং বুড়ো গাছ প্রত্যেকেরই মধ্যে যে সুন্দরের ধারা চলছে, পরম সুন্দর হয়ে দেখা দেবার নিত্য এবং বিচিত্র চেষ্টা সেই প্রাণের স্রোত নিয়ে হচ্ছে গাছ সুন্দর। এমনি আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি, আর কিছুকে নয়, এবং সেই আদর্শই সুন্দরকে যাচাই করার যে নিত্য আদর্শ নয় তা জোর করে কে বলতে পারে! সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে, অনিত্য রস যা তা নিয়ে বাইরের রঙ রূপ বদলে চলে কিন্তু নিত্য যা তার অদল-বদল নেই। সব শিল্পকে যাচাই করে নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য সুন্দরের যে একটি আদর্শ ধরা আছে—তার চেয়ে বড় আদর্শ কোথায় আর পাবো? যেভাবেই হোক যে বস্তুই হোক যখন সে নিত্য তার আস্বাদ দিয়ে আমাদের মনে পরম-সুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ

অনুভব করিয়ে গেলো সে সুন্দর বলে আমাদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করলে। আমার কাছে কতকগুলো জিনিষ কতকগুলো ভাব সুন্দর ঠেকে কতক ঠেকে অসুন্দর, এই ঠেকলো সুন্দর এই অসুন্দর, তোমার কাছেও তাই, আমার মনের সঙ্গে মেলে না তোমারটি তোমার সঙ্গে মেলে না আমারটি। সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবনে কোথাও নেই, সুতরাং যেদিক দিয়েই চল সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে বিতর্ক মেটবার নয়, কাজেই এই অতৃপ্তিকেই—এই সুখ-দুঃখে আলো-আঁধারে সুন্দর, অসুন্দরে মেলা খণ্ড-বিখণ্ড সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকে—সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে যে চলতে পারে, সেই সুন্দরকে এক ও বিচিত্রভাবে অনুভব করবার সুবিধে পায়। জগৎ যার কাছে তার ছোট লোহার সিন্দুকটীতেই ধরা আর জগৎ যার কাছে লোহার সিন্দুকের বাইরেও অনেকখানি বিস্তৃত ধুলোর মধ্যে কাদার মধ্যে আকাশের মধ্যে বাতাসের মধ্যে তাদের দু-জনের কাছে সুন্দর ছোট বড় হয়ে দেখা যে দেয় তার সন্দেহ নেই ; সিন্দুক খালি হলে যার সিন্দুক তার কাছে কিছুই আর সুন্দর ঠেকে না, কিন্তু যার মন সিন্দুকের বাইরের জগৎকে যথার্থভাবে বরণ করলে তার চোখে সুন্দরের দিকে চলবার অশেষ রাস্তা খুলে গেলো, চলে গেলো সে সোজা নির্বিচারে নির্ভয়ে। যখন দেখি নৌকা চলেছে ভয়ে-ভয়ে, পদে-পদে নোঙ্গর আর খোঁটার আদর্শে ঠেকতে-ঠেকতে, তখন বলি, নৌকা সুন্দর চললো না, আর যখন দেখলেম নৌকা উল্টো স্রোতের বাধা উল্টো বাতাসের ঠেলাকে স্বীকার করেও গন্তব্য পথে সোজা বেরিয়ে গেলো ঘাটের ধারের খোঁটা ছেড়ে নোঙ্গর তুলে নিয়ে, তখন বলি, সুন্দর চলে গেলো।

সুন্দর-অসুন্দর—জীবন-নদীর এই দুই টান—একে মেনে নিয়ে যে চললো সেই সুন্দর চললো আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইলো যে-কোনো একটা খোঁটায় বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলে যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে এঁকে বেঁকে,—আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এইভাবেই চিরসুন্দরের দিকে। সুন্দর করে বাঁধা আদর্শের খোঁটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক-ওদিক দোলে, তারপর একদিন যখন বান ডাকে খোঁটা সে দিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়। আর্ট এবং আর্টিষ্ট এদের মনের গতি এমনি করে পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে ধরা তথাকথিত দড়ি খোঁটা অতিক্রম করে উপড়ে ফেলে চলে যায়। বড় আর্টিষ্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে-কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে, সেইগুলোকেই ভেঙে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর-অসুন্দরের মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। যে পারে সে ভেসে চলে মনোমত স্থানে মনতরী ভেড়াতে-ভেড়াতে সুন্দর সূর্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমত

সুন্দর করে বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে-ঠুকেই মরে, সুন্দর-অসুন্দরের জোয়ার-ভাঁটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে।

বাঁধা নৌকা সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকা সে আর-এক ভাবে সুন্দর ; তেমনি কোনো একটা কিছু সকরুণ সুন্দর, কেউ নিষ্করুণ সুন্দর, কেউ ভীষণ সুন্দর, আবার কেউ বা এত বড় সুন্দর কি এতটুকু সুন্দর—আর্টিষ্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে ; আর্টিষ্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিষটাই অসুন্দর, কিন্তু তর্কের সভায় যখন ঘাড় নড়ছে হাত নড়ছে ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর। সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হোক তাজাই হোক সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হল এইটেই বোধহয় চরম কথা সুন্দর-অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড়-বড় আর্টিষ্টরা যা আজ রচনা করে গেলেন, আস্তে-আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাউরে নেয় তার কারণ আর-কিছু নয়, আমাদের সবার মন সত্যিই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে রচনার মধ্যে যে জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় করে না বোধ করে সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন, ক্রমে দশ জন। এবং এমনো হয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে, সে, অথবা সুন্দরের কোনো ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্যবোধের ভাণ করছে, সেও, আর্ট বিশেষকে আস্তে-আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে ধরে,—ঠিক যেভাবে বিশেষ-বিশেষ জাতি আপনার-আপনার এক-একটা জাতীয় পতাকা ধরে তারি নীচে সমবেত হয় ; সে পতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ তোলে নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের Standard বা সৌন্দর্য বোধের চিহ্ন। এইভাবে একের পর আর এসে নতুন-নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙা-গড়া হতে-হতে চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে, কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে নিজেকে বলাতে পারছে না কেউ। আর্টিষ্টের সৌন্দর্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতো সুডৌল ও সুগোল কিন্তু জ্যামিতির গোলের মতো একেবারে নিশ্চল গোল নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু খুঁৎ আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয় ; সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিষ্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেননা সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা-না একটা ধরে থাকেই, কাজেই সে সত্য কথাই বলে যখন বলে যাচ্ছেতাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিষ্টের ইচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছেতাই শব্দটি বড় চমৎকার, এটিতে বোঝায়—যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বললে বলি, যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা

মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিষ্ট এই শব্দটির যথার্থ অর্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপর ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে পণ্ডিতানাং মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে; খোঁটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত-প্রাণ! তাই দেখছি সুন্দর-অসুন্দরের বাছ-বিচার পরিত্যাগ করে তারি সঙ্গে গিয়ে লাগবার স্বাধীনতা আর্টিষ্টের মনকে বড় কম প্রসার দেয় না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন, বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে দেওয়া,—সে লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেই, নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুড়িয়ে কিংবা ভরাডুবি করে স্রোতের মাঝে। বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হলে কতটা সংযম আর বাঁধা-বাঁধির মধ্য দিয়ে নিজেকে ও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে হয়। ছোট সে তো বোঝে না যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছয় মন ; আর নিজের ইচ্ছামত চলতে-চলতে ভুলে হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে যায়, তখন তার কোন কারিগরিই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অন্ধতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসারজোড়া সর্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর-কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্যের এবং আর্টের লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেই সঙ্গে আর্টিষ্টকেও বাঁচাতে। যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ—একথা যাঁরা শিল্পবিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বললেন না। কেননা তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয় সুন্দর নয়, হৃদয়ে যা ধরে তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিষে গিয়ে লগ্ন হয় যা অসুন্দর এবং একেবারেই আর্ট নয়, এবং এও দেখা যায় পরম সুন্দর এবং অপূর্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগলো না, মধুকরের মতো উড়ে পড়লো না ফুলের দিকে, কাদাখোঁচার মতো নদীর ধারে-ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগলো পাঁকে।

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় গিয়ে লগ্ন হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে, আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে, অন্যে রাধে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই। এইসব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ-পরম্পরায়, তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে খণ্ড-বিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগলো না-লাগলো তা নিয়ে দু-চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হলে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর

তাকে বড় করে সবার করে দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয়; সেখানে individuality-কে universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিংবা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করলে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, art-এও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিষ্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙে নদী যদি চলে শতমুখী ছোট-ছোট তরঙ্গের লীলা-খেলা শোভা-সৌন্দর্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যে শিল্পে পূর্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন-নতুন সৌন্দর্যসৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধা স্রোত বেয়ে, আস্তে-আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে চলে। বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে, তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর-অসুন্দরকে বোঝাবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

রাজশেখর বসু

সকল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রকার ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয় এবং অনর্থক বার বার দেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। যেমন লোকবিশেষের তেমনই জাতি বা শ্রেণী বিশেষেরও মুদ্রাদোষ আছে। দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা জানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিস দেয়। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলোয়—চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী মেয়ে নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে—সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বৃদ্ধদেরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অবৃদ্ধরা তা বলতে পারবেন।

জাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের ভাষায় সম্প্রতি যেসকল মুদ্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তা সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন শব্দদ্বৈত। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে।' তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন—গদ্‌গদ, বর্বর, জন্মজন্মনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দদ্বৈত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, হাড়ে হাড়ে—এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক। বুকে বুকে, কাঠে কাঠে—পরস্পর সংযোগ বাচক। সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে—নিয়তবর্তিতা বাচক। চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া—দীর্ঘকালীনতা বাচক। অন্য অন্য, লাল লাল, যারা যারা, ঝুড়ি ঝুড়ি—বিভক্ত বহুলতা বাচক। টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে—প্রকর্ষ বাচক। যাব যাব, শীত শীত, মানে মানে—ঈষদুনতা মৃদুতা বা অসম্পূর্ণতা বাচক। পয়সা টয়সা, বোঁচকা বুঁচকি, গোলা গুলি, কাপড়-চোপড়—অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক।

হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অল্পাধিক শব্দদ্বৈত আছে। বিদেশীর দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। শুনেছি, সেকালে চীনাবাজারের দোকানদার

সাহেব ক্রেতাকে বলত, টেক টেক নো টেক নো টেক, একবার তো সী। একজন ইংরেজ পর্যটক লিখছেন, মাদ্রাজ প্রদেশে কোনও এক হোটেলে হুইস্কির দাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর পেয়েছিলেন—টেন টেন আনা ওয়ান ওয়ান পেগ। বিদেশীর কাছে যতই অদ্ভুত মনে হ'ক, শব্দদ্বৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না। কিন্তু যদি অনাবশ্যক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে দিয়ে বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক' বলেছেন সেই শ্রেণীর অনেক জোড়া শব্দ সম্প্রতি অকারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এগুলির বিশেষ লক্ষণ—জোড়ার শব্দদুটি অসমান কিন্তু প্রায় অনুপ্রাসযুক্ত এবং প্রত্যেকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ জোড়া শব্দও অনেক আছে, যেমন—মণি-মুক্তা, ধ্যান-ধারণা, জল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়-ক্ষতি, সুখ-সুবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি জোড়া শব্দ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রয়োগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি শব্দই যথেষ্ট। কেবল দুঃখ বা দুর্দশা, কেবল ক্ষয় বা কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই রকম শব্দ যদি সর্বদাই জোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ।

দুজন সুস্থ সবল লোক যদি সর্বদা পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করে তবে দুজনেরই চলনশক্তির হানি হয়, একের অভাবে অন্য জন স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। প্রত্যেক শব্দেরই স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশ শক্তি আছে যার নাম অভিধা। এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে করে যদি সর্বদা আর একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কাজ চলতে পারত সেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আজকাল জনসাধারণের ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ভাল বা মন্দ, যে প্রয়োগ লোকে বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে আত্মসাৎ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে 'পরিস্থিতি, বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্যকরী উপায়', ইত্যাদি শোনা যায়।

সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধূলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে বেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধুলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে—মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছি। খেলাধুলা দেখতে যাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলার সঙ্গে অনর্থক ধূলা যোগ করবার দরকার কি?

শব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম এখন নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে। শুধু নেতাজী রোড বা সুভাষ রোড করলে কিছুমাত্র অসম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর লিখতে সুবিধে হত। সম্প্রতি ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের নাম নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে। শুধু নীলরতন কলেজ করলে কি দোষ হত? বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বদলে বঙ্কিমচন্দ্র বা বঙ্কিম স্ট্রীট করলে অমর্যাদা হত না। যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর দরকার হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ। কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে সাধারণে তাঁদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভক্তজন তাঁদের স্কন্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছেন। অনেকে মনে করেন প্রত্যেকবার নামোল্লেখের সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি রাজনারায়ণ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র না লিখলে তাঁদের অসম্মান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্রাট প্রভৃতি তুচ্ছ বিশেষণের উর্ধ্বে উঠে গেছেন, দরকার হলে তাঁকে শুধু কবি বা কবিগুরু আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়।

যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে। দারোয়ানের চৌগোঁপ্‌পা, পাগড়ি আর জমকালো পোষাক, ফিল্‌ড-মার্শালের ভালুকের চামড়ার প্রকাণ্ড টুপি, সন্ন্যাসী বাবাজীর দাড়ি জটা গেরুয়া আর সাতনরী রুদ্রাক্ষের মালা—এ সমস্তই মহিমা বাড়াবার কৃত্রিম উপায়। আধুনিক শংকরাচার্যদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি শংকরাচার্যের শ্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি শ্রীতেই তুষ্ট।

বাণ গৌড়ী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষরডম্বর। এই আড়ম্বরের প্রবৃত্তি এখনও আছে। অনেক বাক্যে অকারণে শব্দবাহুল্য এসে পড়েছে, লেখকরা গতানুগতিক ভাবে এই সব সাড়ম্বর বাক্য প্রয়োগ করেন। 'সন্দেহ নাই'—এই সরল প্রয়োগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলছে—'সন্দেহের অবকাশ নাই'। 'চা পান' বা 'চা খাওয়া' চলে না, 'চা পর্ব' লেখা হয়। 'মিষ্টান্ন খাইলাম' স্থানে 'মিষ্টান্নের সদ্‌ব্যবহার করা গেল'। মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু যদি বার বার দেখা যায় তবে তা মুদ্রাদোষ।

শব্দের অপচয় করলে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে 'ব্যর্থ হইবে' লিখলে চলে সেখানে দেখা যায় 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে'। অনেকে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন', 'যোগ দিলেন' স্থানে 'অংশগ্রহণ করিলেন' বা 'যোগদান করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন' লেখেন। 'হিন্দীভাষী' লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়,

অথচ লেখা হয় 'হিন্দীভাষাভাষী'। 'কাজের জন্য (বা কর্মসূত্রে) বিদেশে গিয়াছেন'—এই সরল বাক্যের স্থানে দুরূহ অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়—'কর্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছেন'। ব্যপদেশের মানে ছল বা ছুতা। 'পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল' স্থানে লেখা হয়—'পূর্বাহ্ণেই…'। পূর্বাহ্ণের একমাত্র অর্থ সকালবেলা।

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বশে চলবার কোনও দরকার নেই—এই কথা অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিকৃত সংস্কৃতপ্রীতি দেখা যায়। বাংলা 'চলন্ত' শব্দ আছে, তবু তাঁরা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ 'চলমান' লেখেন, বাংলা 'আগুয়ান' স্থানে অশুদ্ধ 'অগ্রসরমান' লেখেন, সুপ্রচলিত 'পাহারা' স্থানে 'প্রহরা' লেখেন। বাকীর সংস্কৃত বক্রী নয়, পাঁঠার সংস্কৃত পণ্টক নয়, পাহারার সংস্কৃতও প্রহরা নয়।

অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ঝোঁক দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করেন। একজন গল্পকারের লেখায় চার পৃষ্ঠায় পঁচিশ বার 'রীতিমত' দেখেছি। অনেকে বারবার 'বৈকি' লিখতে ভালবাসেন। কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্ভে 'হাঁ' বসান। আধুনিক লেখকরা 'যুবক যুবতী' বর্জন করেছেন, 'তরুণ তরুণী' লেখেন। বোধ হয় এঁরা মনে করেন এতে বয়স কম দেখায় এবং লালিত্য বাড়ে। অনেকে দাঁড়ির বদলে অকারণে বিস্ময়চিহ্ন (!) দেন। অনেকে দেদার বিন্দু (…) দিয়ে লেখা ফাঁপিয়ে তোলেন। অনাবশ্যক হস্-চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করা বহু লেখকের মুদ্রাদোষ। ভেজিটেবল ঘি-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে তাতে দেখেছি—'তিন্‌টি ডিম্ ভেঙ্গে নিন্, তাতে একটু নুন্ দিন্'।

আর একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রাদোষ বললে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচারব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তর ভাল জিনিস পেয়েছি। দু শ বৎসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথায় ও লেখায় কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কি বর্জনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

পাঁচ বছরের মেয়েকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়—কুমারী দীপ্তি চ্যাটার্জি। সুশিক্ষিত লোকেও অম্লান বদনে বলে—মিস্টার বাসু (বা বাসিউ), মিসেস রয়, মিস ডাট। মেয়েদের নামে ডলি লিলি রুবি ইভা প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। যার নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখে Sheila। অনিল হয়ে যায় O'neil, বরেন হয় Warren। এরা স্বনামে ধন্য হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতা-সূচক তা খেয়াল হয় না। সংক্ষেপের

জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি না করে বন্দ্য করলে দোষ কি? সেই রকম মুখ্য চট্ট গঙ্গ্য ভট্টও চলতে পারে। সম্প্রতি অনেকে নামের মধ্যপদ লোপ করেছেন, নাথ চন্দ্র কুমার মোহন ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন। ভালই করেছেন। দিব্যেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন ফ্যাশন নয়। পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে ক্ষতি কি? মিস-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বৎসর পূর্বেও কুমারী সধবা ও বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌমার্য তো ঘোষণা করা হয় না।

প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের নাম আর. জি. কর কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখতে পাই—Better Bengal Society. বাংলা দেশ এবং বাঙালীর উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?

মেরুদণ্ডহীন অলস সুকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, সন্তানের নামকরণে তা প্রকাশ পায়। দোকানদারেরও স্বপনপসারী তরুণকুমার হবার সাধ হয়েছে। আমাদের পাড়ার একটি দরজীর দোকানের নাম—দি ড্রিমল্যাণ্ড স্টিচার্স। অন্যত্র স্বপন লন্ড্রিও দেখেছি। তরুণ হোটেল, তরুণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এবং ইয়ং গ্র্যাজুয়েট নামধারী দোকান বিস্তর আছে। পাঁচ ছ বৎসর আগে বউবাজারে একটি দোকান ছিল—ইয়ং মোসলেম গ্র্যাজুয়েট ফ্রেণ্ড্স। একসঙ্গে তারুণ্য ইসলাম আর পাশ করা বিদ্যার আবেদন।

ইতিহাসের মুক্তি

অতুল গুপ্ত

১

মানুষ মানুষের কথা শুনতে ভালোবাসে—প্রাচীন মানুষের কাহিনী, সমকালীন মানুষের সংবাদ। আধুনিক সভ্য জগতে এই দ্বিতীয় চাহিদার যোগান দেয় খবরের কাগজ। প্রথম আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের জন্য অনেক পূর্ব থেকেই মানুষ রচনা করছে ইতিহাস। কোনো ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই স্বীকার করতে রাজি হবেন না যে তাঁদের ইতিহাস-রচনা খবরের কাগজ প্রকাশের সমধর্মী। ইতিহাস গড়ার মালমসলা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সম্ভব অসম্ভব নানা মূল থেকে বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ কি খবরের কাগজের জন্য ঋজু পথে ও কুটিল কৌশলে সাংবাদিকের সংবাদ-সংগ্রহের সমতুল্য? সংগৃহীত সংবাদের সত্যাসত্য ও লঘুগুরু যাচাই করে সম্পাদকীয় সন্দর্ভ যে তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে, সংগৃহীত উপকরণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ও নির্মম বিচারে খাঁটি সত্য নির্ণয় করে ঐতিহাসিক সে ব্যাপারের যে বিবরণ দেন ও তার মর্মগত ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার করেন, সে কি ঐ খবরের কাগজের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের সমগোত্রীয়? নিজ কর্মের গুরুত্বে অবহিত কোনো আত্মসম্মানী ঐতিহাসিক এমন কথা ভাবতে পারেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে তিনি অতীত ঘটনার সাংবাদিক! যদিচ মনে পড়ছে, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড ফাউলার তাঁর রোমের চটি ইতিহাসে, প্রাচীন রোমান সেনেটের যে বিবরণ পণ্ডিতেরা অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষায় সংগ্রহ করেছেন, তার কিছু পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, এসব পাণ্ডিত্য বিস্মৃতির অতলে ডোবাতে তিনি রাজি আছেন যদি ঐ রোমান সেনেটের একদিনকার অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন, অর্থাৎ যদি একদিনের অধিবেশনের রিপোর্টার হতে পারতেন।

খবরের কাগজের সঙ্গে ইতিহাসের নাম একসঙ্গে উচ্চারণে ঐতিহাসিকের বিরক্তির কারণ তার চেষ্টা ও সৃষ্টিকে খেলো করে দেখাতে। যে বিচারবুদ্ধি ও মননশক্তি, সত্যসন্ধিৎসা ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ইতিহাস-রচনায় প্রয়োজন তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে। সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও সম্পাদকীয় স্তম্ভের পেশাদার লেখকদের কথা তোলা বিকৃতরুচি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চাঙ্গ মানসিক চেষ্টাকে খাটো করে দেখাই ইতিহাসকে হেয় করার মুখ্য কথা নয়। বড় কথা ইতিহাসের লক্ষ্যকেই ছোট করে ফেলা। মনের নানা খেয়ালখুশির চরিতার্থতায় মানুষ অনেকরকম সৃষ্টি করেছে। রাজা-রাজড়া এবং

বীরপুরুষেরা প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী শুনতে চেয়েছে। চারণেরা কিম্বদন্তী ও কল্পনায় মিশিয়ে গাথা রচনা করে রাজসভা ও বীরসভায় গান করেছে। মানুষ সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে নিয়ে হাসি-কান্না উপহাস-পরিহাসের কথায় মশগুল হয়। তাই কথাসরিৎসাগরের মতো বই দেশে দেশে লেখকেরা লেখে। মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। পড়তে-লিখতে-জানা আধুনিক পৃথিবী গল্প-উপন্যাসে ছেয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাস এসব মনোরঞ্জকদের দলে নয়। তার লক্ষ্য উঁচু। অতীতের কাহিনী সে বলে বটে—সমস্তরকম মিথ্যা রাগ-বিরাগ-কল্পনার খাদ-মুক্ত অতীতের খাঁটি সত্য। কিন্তু সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের কাজ নয়, যদিও গল্প সত্য হলে লোকের তাতে বেশি অনুরাগ। লোকে ভূতের গল্পেও সত্য-ভূতের গল্প শুনতে চায় ; কারণ গল্প বলাটা ইতিহাসের উপলক্ষ না হোক, উপায় মাত্র। ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা যেসব উপদেশ করেছেন তাঁদের উপদেশের বাস্তব রূপ দেখা যায় ইতিহাসে। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।

২

ইতিহাসের এই উপদেষ্টার পদগৌরব অনেক কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, যেসব লোক আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও বলেন ইতিহাসের মতো সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি, সেইসব অল্পবুদ্ধি অরসিক সাধুলোকদের নমস্কার করেছেন।

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায় ॥

ধনঞ্জয়ের মতে নাট্যের স্থান ইতিহাসের উপরে কি না সে কথা অবান্তর। কিন্তু ইতিহাসের কাজ যে আনন্দ দেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়া, তাঁর এ অভিমত সুস্পষ্ট।

ধনঞ্জয় আধুনিক লেখক। মাত্র হাজার বছর পূর্বেকার লোক। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সময়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশের নানা পুঁথিতে ইতিহাস নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে দ্বিজাতির পাঠ্যের তালিকায় একটি পাঠ্যবিষয় হচ্ছে ইতিহাস।

বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোঽন্বহম্ ॥

আচার, ৪৫

বেদাথর্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞার্থসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাং চাঽধ্যাত্মিকীং জপেৎ ॥

আচার, ১০১

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি খুব কম করেও ধনঞ্জয়ের পাঁচ শো বছর পূর্বের।

মনুস্মৃতিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের সময় যেসব শাস্ত্র পড়ে শোনাবার বিধি আছে তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥ ৩।২৩২

মনুস্মৃতির যে পুঁথি আমরা পেয়েছি, খৃস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকে মেধাতিথি যার ভাষ্য লিখেছিলেন, তার রচনা বা গ্রন্থন-কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। কিন্তু কোনোমতেই সে রচনাকাল খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে নয়। তার চেয়ে দু-তিন শো বছর পূর্বে হওয়াই খুব সম্ভব।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সামবেদ ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদ এই ত্রয়ীর বাইরে ইতিহাসকেও অথর্ববেদের সঙ্গে বেদ বলা হয়েছে।

সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।
অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ ॥

প্রথম প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসকে বেদ বলাতে বোঝা যায় যে, নানা বিদ্যাকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। ওর অর্থ কী তা রাজার নানাবিদ্যাচর্চার প্রসঙ্গে কৌটিল্য নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা দিনের পূর্বভাগে যুদ্ধের নানা অঙ্গের বিদ্যা শিখবেন।

পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে। পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যা-
য়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।

দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায়

দিনের শেষভাগে ইতিহাস-শ্রবণে শিক্ষালাভ করবেন। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—এদের বলে ইতিহাস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল

পণ্ডিতদের বিরাট তর্কস্থল। কিন্তু অপণ্ডিত লোকও যদি প্রচলিত মনুস্মৃতির সঙ্গে এ অর্থশাস্ত্র পড়েন তবে প্রতীতি হতে দেরি হয় না যে, কৌটিল্যের বহু অংশ মনুস্মৃতির চেয়ে প্রাচীনতর। সুতরাং যে পণ্ডিতেরা অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল বলেন খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক তাঁদের মত অগ্রাহ্য করবার কোনো সংগত কারণ নেই।

গৌতমধর্মসূত্রে, যেসকল বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষা করেন তাঁদের বহুশ্রুতত্বলাভের জন্য যেসব বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয় তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

> দ্বৌ লোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতঃ। ৮।১
> স এষ বহুশ্রুতো ভবতি।
> লোকবেদবেদাঙ্গবিৎ।
> বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ ॥ ৮ ॥৪-৬

বাকোবাক্য নামে বিদ্যাটির উল্লেখ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচনেও আছে—টীকাকাররা ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রশ্নোত্তর-রূপ বিদ্যা, সম্ভব তর্কশাস্ত্র, গ্রীসে Socratic dialogue-এ যার আরম্ভ।

যেসকল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি টিকে আছে বা এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, গৌতমধর্মসূত্র তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এর যেসব প্রসঙ্গ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে এক তাদের মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, গৌতমধর্মসূত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীনতর কালের ব্যবস্থা। পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, গৌতমধর্মসূত্রের রচনাকাল খৃস্টপূর্ব ছয় শো থেকে চার শো শতকের পরে নয়। এ মত গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে থেকেই আমাদের দেশে ইতিহাস নামে বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল ও চর্চা চলেছিল। এ বিদ্যার স্বরূপ কী ছিল?

৩

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের গণনা স্পষ্টই পারিভাষিক ব্যাপার। ওর মূল অপারিভাষিক অর্থ, অন্য যেসব বিদ্যার নাম করা হয়েছে তাদের সমষ্টি—পুরাতনকালের বৃত্তান্ত, আখ্যায়িকা ও তাদের মধ্যে যে উপদেশ নিহিত আছে, যেসব ঘটনার উদাহরণ তাদের দৃঢ় করে। এরকম উদাহরণের বেশ একটু চমকপ্রদ নমুনা কৌটিল্য থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

কৌটিল্য রাজাকে বাইরের ও ঘরের নানা শত্রু থেকে আত্মরক্ষায় সাবধানতার উপদেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ এই ঃ অন্তঃপুরে মহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রাজা পূর্বে পরিচারিকাকে দিয়ে অনুসন্ধান নেবেন যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, এবং এমন পরিচারিকাকে সঙ্গে না নিয়ে একাকী যাবেন না, কারণ—

> দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জঘান।
> মাতুঃশয্যান্তগতশ্চ পুত্রঃ কারূশম্।
> লাজান্মধুনেতি বিষেণ পর্যস্য দেবী কাশিরাজম্।
> বিষদিগ্ধেন নূপুরেণ বৈরন্ত্যং মেখলামণিনাং সৌবীরং।
> জালুথমাদর্শেন বেণ্যাগূঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী
> বিদূরথং জঘান। ১৷৷১৭

পট্টমহিষীর ঘরে লুকিয়ে থেকে রাজা ভদ্রসেনকে তার ভাই হত্যা করেছিল। মার শয্যার তলে প্রচ্ছন্ন থেকে কারূশ-রাজাকে তার ছেলে হত্যা করেছিল। মধুর ছলে খইয়ে বিষ মেখে কাশিরাজের মহিষী তাকে হত্যা করেছিল। বিষদিগ্ধ নূপুরের আঘাতে বৈরন্ত্য-রাজাকে, মেখলামণির আঘাতে সৌবীর-রাজাকে, মুকুরের আঘাতে জালুথ-রাজাকে তাদের মহিষীরা হত্যা করেছিল। বেণীতে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে বিদূরথ-রাজার মহিষী বিদূরথকে হত্যা করেছিল।

সন্দেহ নেই যে, কৌটিল্য প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বোধেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছেন, কল্পিত আখ্যায়িকার নয়। সে ইতিহাসের মূলে তথ্যের সঙ্গে কিম্বদন্তীর যতই মিশ্রণ থাক্। অজ্ঞাত-অতীতের ভদ্রসেন-বিদূরথের হত্যা থেকে হাল-আমলের 'লিকুইডেশন' পর্যন্ত ক্ষমতালোভী মানুষের ছল ও নিষ্ঠুরতার পরিবর্তন হয় নি।

৪

মনুস্মৃতির যে শ্লোকে 'ইতিহাসাংশ্চ' ব'লে বহুবচনে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখেছেন, 'ইতিহাসা মহাভারতাদয়ঃ'। যাজ্ঞ-বল্ক্যস্মৃতির 'ইতিহাসাংস্তথা'র ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় ঐ এক কথাই বলেছেন, 'ইতিহাসান্মহাভারতাদীন্'। মেধাতিথি ও বিজ্ঞানেশ্বর মনুর তুলনায় অনেক আধুনিক। মেধাতিথি খৃস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকের, বিজ্ঞানেশ্বর দশম কি একাদশ শতকের লোক। কিন্তু ইতিহাস যে মহাভারতের মতো গ্রন্থ এ ঐতিহ্য প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অথর্ববেদের সঙ্গে ইতিহাসকে বেদ বলা, ও মহাভারত যে পঞ্চম বেদ এই প্রচলিত ধারণা, সম্ভব তার প্রমাণ। মনুস্মৃতির কোথাও নাম করে মহাভারতের উল্লেখ নেই। অনেকে মনে করেন যে, মনুস্মৃতির বর্তমান আকারে রচনার সময় বর্তমান আকারের মহাভারতের রচনা হয় নি। কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনী অবশ্য অনেক

প্রাচীন ; এবং সে কাহিনী নিয়ে অনেক রচনা, অনেক গাথিকার নিশ্চয় সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই সে স্বীকৃতি রয়েছে। সৌতি বলছেন, অদ্ভুতকর্মা ব্যাসের যে রচনা তিনি শোনাতে যাচ্ছেন—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিনং ভুবি ॥

আদি, ১।২৬

সে ইতিহাস কোনো কোনো কবি পূর্বে আংশিক বলেছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন, এবং অন্য কবিরা ভবিষ্যতে বলবেন। এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে যে অনেক কল্পিত উপাখ্যানের মিশ্রণ ঘটেছে, সে কথা মহাভারতে স্পষ্ট করেই বলা আছে। উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু উপাখ্যান বাদ দিয়ে যে চব্বিশ হাজার শ্লোকে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন প্রকৃত মহাভারত।

ইদং শতসহস্রন্তু শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়ং শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্ ॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥

আদি ॥ ১ ॥ ৬৩-৬৪

অনুমান করা কঠিন নয় যে, লক্ষকে কেটে নয়, চব্বিশ হাজারকে বাড়িয়েই লক্ষ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত রচনাটিই মূল ভারতেতিহাস। সে কাহিনী যে ঐতিহাসিক, প্রাচীনকালে সত্য সত্যই ঘটেছিল, প্রাচীনদের এ বিশ্বাস দৃঢ়। আখ্যায়িকা ও পুরাণ থেকে তাঁরা মহাভারতের কাহিনীকে ভিন্ন করে দেখেছেন। পুরাণের কথায় মেধাতিথি বলেছেন, 'পুরাণানি ব্যাসাদিপ্রণীতানি সৃষ্টাদিবর্ণনরূপাণি', অর্থাৎ যার বেশির ভাগ কল্পনা। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন, যেমন থুকিডিডেস হোমার-বর্ণিত ট্রোজান-যুদ্ধকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন। তবে মহাভারতের কাহিনীও যে উপদেশাত্মক, শাস্ত্রকারেরা সে কথা বলতে ভোলেন নি। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে বিনয়ের সুফল ও অবিনয়ের কুফল বর্ণনা আছে। জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশে চলার নাম বিনয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অবিনয়। অবিনয়ের ফলে রাজারা সপরিগ্রহ বিনষ্ট হয়, আর বিনয়ের গুণে কোশহীন বনবাসীও রাজ্যলাভ করে। উদাহরণ,

বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাস-যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ। ৭ ॥ ৪১-৪২

মেধাতিথি খুব সংক্ষেপে ভাষ্য করেছেন, 'এতানি মহাভারতাদাখ্যানানি জ্ঞেয়ানি'। এবং মহাভারতেই তার উপদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আছে। 'এতে চার বেদেরই কথা আছে, এ কাহিনী পবিত্র ও পাপভয়হারী'।

বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্ ॥
আদি ॥ ১। ২১

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সৌতির কাছে সোপাখ্যান লক্ষশ্লোকের 'শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্' শুনতে চেয়েছিলেন।

৫

মহাভারতের কাহিনী থেকে নানা উপদেশ-সংগ্রহ কিছুই কঠিন নয়। মানুষের অনেক কর্মচেষ্টা ও তার পরিণতি থেকেও কঠিন নয়। কিন্তু মহাভারতের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসের রচনা হয়েছিল গুটিকয়েক উপদেশের উদাহরণ-স্বরূপে—ঐ উপদেশই লক্ষ্য, কাহিনীর বর্ণনাটা উপলক্ষ—এমন কল্পনা সুস্থ মনের কল্পনা নয়। কোনো তত্ত্বের মায়ায় বুদ্ধির বিভ্রান্তি না ঘটলে সর্পে এমন রজ্জুভ্রম হয় না। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা মহাভারত-কথা শোনার জন্য সৌতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ সে কথা বিচিত্র—'চিত্রাঃ কথাঃ'।

তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ ॥
আদি ॥ ১। ৩

যে কাহিনী বিচিত্র, গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়, তা মানুষের মনে গভীর দাগ কাটে। মানুষ সে কাহিনী ভুলতে চায় না। তাকে রচনায় নিবদ্ধ করে স্থায়ী করে রাখতে চায়। উপদেশের চিরকালীন ভাণ্ডবোধে নয়, অসাধারণ বিচিত্রকে স্থায়িত্ব দেবার মনের স্বাভাবিক প্রবণতায়। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং।' কিন্তু সমাজের হিতে যাঁরা অনন্যচিত্ত তাঁরা একে উপদেশের পুণ্যজলে শোধন করে মানুষের কাজে লাগাতে চান। ঐতিহাসিক কাহিনী যে কাহিনীমাত্র নয়, সংসারের যাত্রাপথে অঙ্গুলিসংকেত, সে শিক্ষা তাঁরা ইতিহাসের কাহিনী থেকে নিষ্কাশিত করেন—সহজে বা কষ্টে। সমাজহিতৈষীদের 'প্রবৃত্তিরেষা'। ঐতিহাসিক বলেন, 'তথাস্তু। ভেবেছিলাম অতীত নিয়ে খেলা করছি, কিন্তু দেখি সমাজের হিত করছি। মনে করেছিলাম প্রাচীন কাহিনী-তৃষ্ণার জল এনেছি, কিন্তু দেখছি যা এনেছি তা উপদেশের অমৃত। ধন্যোঽহং।'

৬

বর্তমানে আমরা যাকে বলি 'যথার্থ ইতিহাস' (real history), হোমারের ট্রয়-যুদ্ধের কি বেদব্যাসের ভারতযুদ্ধের ইতিহাসের মতো ইতিহাস নয়, তার লেখকেরাও অনেকে বলেছেন যে, তাঁরা ইতিহাস লিখেছেন কেবল অতীতের কাহিনীকে বর্ণনার জন্য নয়, যাতে অতীতের কাহিনীর আলোতে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন, যাতে সেই অতীত ঘটনা থেকে এর পর অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। পলিবিয়াস রোম-কার্থেজ-যুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধের অনুসন্ধান করেছেন, যাতে ভবিষ্যতের সদৃশ ঘটনায় এ সম্বন্ধের প্রয়োগ করা যায়। ইউরোপের কেবল গ্রীক কি গ্রীকো-রোমান যুগে নয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের এই রূপই কল্পনা করেছেন। ইতিহাস লোকশিক্ষক—ন্যায়পথের শিক্ষা দেয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের সে পরামর্শদাতা। এই কল্পনাকে মৃদু উপহাস করে র‍্যাঙ্কে তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের গোড়ায় বলেছেন, 'ইতিহাসের উপরে যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়, অতীতকে যাচাই করে বর্তমানকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, সে গুরুভার-বহনে তিনি অক্ষম। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র দেখাতে চেষ্টা করতে পারেন যে, যা ঘটেছে তা ঠিক কেমন করে ঘটেছে।'

শাস্ত্রকৃৎ কি দার্শনিকেরা যে কারণে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিককে উপদেষ্টার আসনে বসিয়েছেন সে সম্মান বহু ঐতিহাসিক লিওপোল্ড র‍্যাঙ্কের মতো প্রত্যাখ্যান করেন নি। সে মর্যাদা ও সম্মান শিরোধার্য করেছেন এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু যদি বাইরের দেওয়া পদবীর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজের কাজ পরীক্ষা করে দেখেন 'কিমিদং' তবে ইতিহাসের স্বরূপ ও লক্ষ্যের যথার্থ জ্ঞান, বৌদ্ধেরা যাকে বলেন 'সম্যক জ্ঞান' তা লাভ হয়।

থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের গ্রন্থ এই বলে আরম্ভ করেছেন :

'এথেন্সবাসী থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান ও এথেনিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করেছেন। যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এই ধারণায় যে পূর্বে পূর্বে যা সব ঘটেছে এ যুদ্ধের গুরুত্ব তাদের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি দেখলেন, সমস্ত গ্রীস দেশ এই যুদ্ধে এক পক্ষে নয় অন্য পক্ষে যোগ দিয়েছে বা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এবং অনেক অ-গ্রীকেরাও যোগ দিচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হবে। অতীতের, বিশেষ দূর-অতীতের, কথা কালের ব্যবধানে সম্পূর্ণ জানা যায় না। কিন্তু অনুসন্ধান

ও গবেষণায় যতদূর জানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় না যে অতীতের কোনো যুদ্ধ বা ঘটনারই এ যুদ্ধের মতো গুরুত্ব ছিল।'

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত থুকিডিডেসের পেলপনেসিয়ান-যুদ্ধের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বের ধারণা অতিমাত্রায় মাত্রাজ্ঞানহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেমন এইচ, জি, ওয়েলস বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত ও যুদ্ধটা ছিল একটা মাঝারি রকমের ঝগড়া ; ওর স্মৃতি একটু বেশি টিকে আছে এইজন্য যে, থুকিডিডেস তার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। থুকিডিডেসের ধারণায় বিজ্ঞতার হাসি হাসার পূর্বে মনে করা ভালো যে, যেসব ঘটনা ও ব্যাপারের গুরুত্বে ও ব্যাপকত্বে আকৃষ্ট হয়ে বর্তমানের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখছেন, আড়াই হাজার বছর পরে সেসব ঘটনা ও ব্যাপারে তাঁদের ধারণা লোকে কী চোখে দেখবে—অবশ্য যদি ততদিন তার স্মৃতি বেঁচে থাকে।

থুকিডিডেস তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, উপদেশ দেবার মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। এ রচনায় তাঁর প্রবৃত্তি এসেছিল, কারণ এ যুদ্ধের কাহিনী তাঁর মনে হয়েছিল 'চিত্রাঃ কথাঃ' ; এবং অতীতের সমস্ত ঘটনার তুলনায় 'বিচিত্রাঃ কথাঃ'।

এর পর থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ ও রচনারীতির কথা বলেছেন :

'এই যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অনুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করি নি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয় নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যারা দেখে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।'

৭

থুকিডিডেসকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার গুরু। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও বিচারের এবং অপক্ষপাত কল্পনাশূন্য অনাবিল কাহিনী রচনায় যে সূত্রের তিনি সূত্রকার, আধুনিক ঐতিহাসিক রীতিকে তার ভাষ্য বলা যায়।

অবশ্য অতি বিস্তৃত ভাষ্য। কারণ, আধুনিক কালে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও মূল্যবিচারের চেষ্টা ও পদ্ধতি যেমন বিপুল তেমনি জটিল। দু-তিন শো বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত অনেক বিজ্ঞানবিদ্যা ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ের সহায়, যার কল্পনাও থুকিডিডেসের কালে সম্ভব ছিল না। বহু বিজ্ঞানবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্পষ্ট করে ঐতিহাসিককে অনেক প্রাচীন মূল্যহীন সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এবং এসব দৃষ্টফল বিদ্যার সার্থক অনুশীলন সত্যমিথ্যা-পরীক্ষার যে কঠোর মনোভাবের জন্ম দিয়েছে, ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ে ঐতিহাসিককে তা প্রভাবিত করেছে। তার স্বীকৃতির সঙ্গে উৎকর্ষের দাবি মিশিয়ে আধুনিক ইতিহাসকার নিজের রচিত ইতিহাসের নাম দিয়েছেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস,' অর্থাৎ যা প্রাচীনদের ঢিলেঢালা ইতিহাস থেকে ভিন্ন। এ নামকরণে সত্যাভাস কিছু আছে, নামের মহিমায় বস্তুর তথ্যপ্রকাশের চেষ্টায় যা অপরিহার্য। কিন্তু আজকের দিনের ঐতিহাসিকের হাতে সত্যনির্ণয়ের যা সব উপায় এসেছে তার তুলনায় প্রাচীনকালের ইতিহাসকার ছিলেন রিক্ত-অস্ত্র মুষ্টিযোদ্ধা মাত্র। একটু দূর-অতীতের ইতিহাস রচনা থুকিডিডেসের কাছে খুব সম্ভব মনে হয় নি। কারণ, তত পূর্বের ঘটনা সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তুত থুকিডিডেসের একুশ বছরের ইতিহাস তাঁর সমকালীন ঘটনার ইতিহাস। পলিবিয়াসের পিউনিকযুদ্ধের ইতিহাস ঠিক তেমন না হলেও প্রায় সমধর্মী। দূর-অতীতের ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে আধুনিক ঐতিহাসিকদের রীতিপদ্ধতি অনেক অগ্রসর ও অনেক সূক্ষ্ম। যে প্রাচীনেরা তাঁদের কালের ইতিহাস লিখে গেছেন বা এমন বিবরণ লিখে গেছেন যা থেকে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায়, সে ইতিহাস ও বিবরণকে বহু দিক থেকে পরীক্ষা করে সত্যনির্ণয়ের অসীম চেষ্টা—যে কাজকে থুকিডিডেস কঠিন বলেছেন তা থেকে বহুগুণে কঠিন কাজ—আধুনিক ইতিহাস-লেখকেরা নিত্য করছেন। বিবরণের লিপি কত প্রাচীন, তার ভাষা কোন্ কালের, যে প্রাচীন ভাষা ও লিপির স্মৃতি লোপ হয়েছে তার পাঠোদ্ধার, মানুষের সভ্যতার যেসব সৃষ্টি মাটির নীচে চাপা পড়েছে মাটি খুঁড়ে তার পরিচয়-লাভ, মনে হয় যেন অসাধ্যসাধন। সে অসাধ্যসাধন আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সাধারণ কাজ। অতীতকে জানার এই চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্ভব হয়েছে অতীতকে জানার আগ্রহে। আর কোনো কিছুর উপলক্ষ হিসাবে নয়, ঐ জ্ঞানই ঐতিহাসিকের চরম লক্ষ্য ব'লে। অতীতের নির্ভুল নিখুঁত জ্ঞানলাভের এই বিদ্যা মানুষ সৃষ্টি করেছে। সেই বিদ্যার ও তার আদর্শের আকর্ষণ ইতিহাসকারের উদ্যমের উৎস। সেই আদর্শে পৌঁছবার কোনো শ্রমকেই শ্রম মনে হয় না। এই আদর্শের মাপকাঠি ছাড়া অন্য যে-কোনো মাপকাঠির মাপে ঐতিহাসিকের অনেক শ্রম মনে হবে নিরর্থক পণ্ডশ্রম। যীশু জন্মেছিলেন খৃস্টপূর্ব চার অব্দে না দশ অব্দে, যুদ্ধটা আরম্ভ হয়েছিল শনিবার দুপুরে না রবিবার প্রাতে, সে গবেষণায় শ্রম ও বুদ্ধি ব্যয়ের আর কোন্ সার্থকতা আছে? সে সার্থকতা হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও সত্য কথনের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে

অবিচ্যুতি। সত্যের জন্যই সত্যের অনুসরণ। 'সত্যে নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ'—ঐতিহাসিকের সে ভয় হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয়। অন্য কোনো ভয় নয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যদি হত অতীত সত্য ঘটনার উদাহরণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া—ধর্মের নীতি, সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রের নীতি—তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিকৃত করলেই তা উপদেশের বেশি উপযোগী হত। অনলংকৃত নিরাবরণ সত্যের চেয়ে কল্পনায় রাঙানো ও সাজানো কাহিনীর আকর্ষণ লোকের কাছে অনেক বেশি—যে আকর্ষণের অভাব আছে বলে থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাস-রচনার ব্যাজনিন্দা করেছেন। যে কারণে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সোপাখ্যান ভারতকথাকে অধিকতর শ্রাব্য মনে করেছেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে সকল বিদ্যার ধারক ও বাহক ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকেরা। তাঁরা যে ইতিহাস তখন লিখেছেন তার বেশির ভাগ খৃস্টধর্মের নানা ঘটনার ও খৃস্টান সাধুসন্তদের জীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাসকে বিচিত্র কল্পনায় পুষ্ট ও মনোহারী করে ধর্মের উপর লোকের ভক্তি ও ভয় গাঢ় করার চেষ্টা দোষের ছিল না। তাতে লেখকের ধর্মপ্রচারের নিষ্ঠাই প্রমাণ হত। এ প্রয়োজনে অসত্যকথনেও দোষ ছিল না। কারণ ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক ঊর্ধ্বে। সে কাল গত হয়েছে, কিন্তু সে মনোভাবের বীজ মরে নি। আজ ক্রমশ ধর্মের দাবির জায়গা নিচ্ছে রাষ্ট্রের দাবি। ধর্মগুরুর আসনে বসেছে রাষ্ট্রনেতা। সেই ইতিহাস হবে তাঁদের কাম্য যাতে রাষ্ট্রের উপর, অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতাদের উপর, লোকের ভক্তি ও ভয় প্রবল ও প্রগাঢ় হয়। তাতে যদি কিছু অসত্যভাষণের প্রয়োজন হয় তাতে প্রমাণ হবে রাষ্ট্র-সচেতন ঐতিহাসিকের দেশপ্রেম। ইউরোপের মধ্যযুগে থুকিডিডেসের ইতিহাসের আদর্শ বেঁচে ছিল না। আজ সে পুনর্জীবিত আদর্শ অনেক বেশি কঠোর হয়েছে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকের অভাব হবে না। শোনা যাবে ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নয়। কেবল সত্যভাষণের আদর্শ থেকে তার লক্ষ্য অনেক উঁচুতে, তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত, জাতির মঙ্গল।

৮

এক কাল ছিল যখন, আজ যেসকল বিদ্যা নিজের গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ তার অনেকগুলি ছিল অন্য সাধনার অঙ্গ ও উপায়। সেই উপায়ের কাজ সম্পন্ন করাই ছিল তার লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্তু মানুষের চঞ্চল কর্মকৃৎ মন ও প্রতিভা উপায়ের গণ্ডি ভেদ করে স্বতন্ত্র বিদ্যায় তাদের গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গবিদ্যাগুলি তার উদাহরণ। যে বিদ্যা ছিল বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ও সত্য অর্থ গ্রহণের উপায় মাত্র, তা গড়ে উঠল ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান হয়ে। ছন্দঃশাস্ত্র বৈদিক

ছন্দোবিচারে আবদ্ধ থাকল না। জ্যোতিষ ও জ্যামিতি বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণতি পেল। মানুষের প্রতিভার এসব সৃষ্টি ও বিদ্যার চর্চাকে বৈদিক কুলপতিরা সুনজরে দেখেন নি। মনুসংহিতায় তার স্মৃতি রয়ে গেছে। 'যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করে অন্য বিদ্যায় শ্রম করে এই জন্মেই তার সবংশ আশু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হয়।'

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ২।১৬৮

'অন্যত্র' কথার ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেন, 'শাস্ত্রাঙ্গেষু তর্কশাস্ত্রগ্রন্থেষু বা'। কুল্লুক সোজাসুজি বলেছেন, 'অর্থশাস্ত্রাদৌ'। সর্বজ্ঞ নারায়ণ শুধু বলেছেন, 'অন্যত্র শাস্ত্রে', আর্থাৎ বেদ ভিন্ন অন্য বিদ্যায়।

ইউরোপের মধ্যযুগে খৃস্টান ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে অন্য বিদ্যার যারা চর্চা করত ধর্মগুরুরা তাদের সন্দেহের চোখেই দেখতেন। এর প্রেরণা যে ভগবানের নয়, আসে শয়তানের কাছ থেকে, সে সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন। ফাউস্টের প্রাচীন গল্প এর উদাহরণ। ধর্ম ও নীতির রথচক্রের বন্ধন থেকে বিদ্যাগুলির মুক্তি হয়েছে অনেক প্রতিকূলতার বাধা কাটিয়ে। ইতিহাসেরও ঘটেছে সেই মুক্তি। কিন্তু কোনো বন্ধন থেকে মুক্তিই চরম মুক্তি নয়। মুক্তিকে রক্ষার জন্য মানুষকে অতন্দ্র থাকতে হয়। কারণ পুরাতন বন্ধন নূতন নূতন রূপে মানুষের মুক্ত মন ও বিদ্যাকে আবার বাঁধতে চায়। মানুষের মুক্ত মন ও বুদ্ধির উপর আজকের পৃথিবী অনুকূল নয়। সম্ভব ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৯

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ইতিহাস মনের একটা খেয়ালপরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, মানুষের কোনো কাজে লাগে না? মানুষ নিজের কাজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সুতরাং মানুষের তা কাজে লাগে। কিন্তু যে মানুষের কাজে লাগে সে মানুষ সত্যের পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তত্ত্বের মাপে কাটাছাঁটা প্রমাণসই, স্ট্যাণ্ডার্‌ডাইজ্‌ড্ মানুষ নয়। মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় মুখ্যত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে। সুতরাং প্রয়োজনসিদ্ধির কাঠামে সে বস্তুকে পুরতে চায়। তাতে বস্তুর সমগ্রতা ধরা পড়ে না। কিন্তু সমগ্রকে ধরা কাঠামের কাজ নয় ; তাতে কাঠামো-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। কার্যসিদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে নিষ্প্রয়োজন অবান্তরকে দূরে রাখার জন্যই কাঠামো। যা থাকে কাঠামোর বাইরে, প্রয়োজনসিদ্ধির দৃষ্টিতে তা অবস্তু। তাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চলে এবং অগ্রাহ্য করলেই কাজ ভালো চলে। ক্রমে মানুষের ব্যবহারিক মনের ধারণা জন্মে যে, কাঠামোর মধ্যে যা রয়েছে তাই বস্তু, তার বাইরে বস্তুর আর অস্তিত্ব নেই।

আজ যারা সভ্য মানুষ, একদিন ছিল যখন তাদের পূর্বপিতামহদের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হত শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার আহার আবাস ও আচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায়। সে মানুষের কাঠামো বুদ্ধিমান দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামো। তারপর অনেক হাজার বছরের নানা সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মন শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্ত বাহুল্য মন সৃষ্টির প্রেরণায় ও আনন্দে বহু সৃষ্টি করে চলেছে যা শরীরের কাজে লাগে না, বাহুল্য-মুক্ত মনের কাজে লাগে। কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাস্কর্য সবই এই মুক্ত মনের সৃষ্টি। কিন্তু সেই আদিম কাঠামোর স্মৃতি মানুষের মনে বেঁচে আছে। তার এক কারণ, অনেক মানুষের মন আজও শরীরের সেই একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। তাই যখন প্রশ্ন হয়, এ বস্তু মানুষের কোন্ কাজে লাগে, তখন প্রশ্নকর্তা যে মানুষের কথা বলেন সে মানুষ হচ্ছে দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামোর মানুষ। প্রশ্নের অর্থ, সে বস্তু শরীরের পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগে কি না। যত গাম্ভীর্য ও মুরব্বিয়ানার সঙ্গে প্রশ্ন হোক না কেন, একটু বাজিয়ে দেখলেই আওয়াজ চিনতে ভুল হয় না। যে ইতিহাসের কথা বলছি সে ইতিহাসও মানুষের মুক্ত মনের সৃষ্টি। তাকে শরীরের কাজে লাগানো যায় না। যে সমাজ বহু শরীরের সমষ্টি মাত্র তার কাজেও লাগানো যায় না। চিরপরিচিত মানুষ মানুষের চিরকালের বিস্ময়। সেই চিরবিস্ময়ের বার্তা বহন করে ইতিহাস।

পটুয়া শিল্প

যামিনী রায়

বাংলার চলিত চিত্রকলার সাধারণ বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যাক।

চিত্রকলা বাংলাদেশে চলিত ছিল দু-ভাবে ; এক হল ঘারোয়া বা আটপৌরে শিল্প, আর এক হল পালাপার্বণের শিল্প যাকে পোশাকী শিল্প বলা যায়। বাংলা দেশের আটপৌরে ছবি তার পটের ছবি, আর তার পালাপার্বণের শিল্প দেবমূর্তি, প্রতিমা, ইত্যাদি। এ দুয়ের পার্থক্য স্পষ্ট প্রথমটিতে প্রসাধনের প্রচেষ্টা নেই, সংস্কারের উৎসাহ নেই। দ্বিতীয় ছবি সংস্কৃত, আভিজাতিক। বেদাদি ঐতিহ্যে তার নির্ভর। গঠনের দিক থেকে এই দু-জাতের ছবির বহু প্রভেদ।

পটুয়া শিল্প বলতে দেশে কয়েকটা কুসংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন যে পটুয়া ছবি আর কালিঘাটের ছবি দুটি শব্দই একার্থবাচক। এমন নয় যে এ-কথার পেছনে কিছুমাত্র সত্য নেই ; যদিও সত্য যা আছে তা নেহাতই অল্প। কলকাতা শহর যখন সবে গড়ে উঠছে তখন গ্রামের একদল লোক কালিঘাটে এসে বাসা বাঁধল এবং ছবি এঁকে চলল। এরা ছিল গ্রামের শিল্পী, সেখানে গড়ত প্রতিমা। কিন্তু নগর-সভ্যতার সংস্পর্শে কিছুটা পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসতে বাধ্য হল। কারণ, এরা আঁকতে শুরু করল শহরের চাহিদা মেটাতে—শহর বা শহরের আশেপাশে যে মেলা বসত, সেখানেই তারা ছবি বিক্রি করত। এই ভাবে নগরজীবনের সংস্পর্শে আসার দরুন, নগরজীবনকে অবলম্বন করে আঁকার দরুন, সে-জীবনের ছাপ এতে এসে পড়ল। এ ছবি তাই আসল পটুয়া ছবি নয় ; এর ভাষা রয়ে গেল গ্রাম্য, এর বক্তব্যে এল শহর। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিকের মিলন তাই সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ বিচ্যুত হল ছবি। বিদেশের সমালোচকরা ছবি সংগ্রহ করেছেন প্রধানত কালিঘাট থেকে। নানান কারণে এর বেশী তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই, তাঁরা যে কালিঘাটের ছবির সঙ্গে পটের ছবিকে অভিন্ন মনে করবেন তাতে বিস্ময়ের অবকাশ অল্প। কিন্তু দুঃখের কথা দেশের সমালোচকও প্রায়ই বিদেশীদের ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি তোলেন।

যে ছবি আসল পটুয়া ছবি, ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে কলকাতা শহর গড়ে উঠবার অনেক আগে, বাংলায় তার প্রচলন ছিল। বরং বিদেশীদের আগমনের অনেক আগেই তার দেহে প্রকৃত প্রাণ ছিল। যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই

ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল। তারপর অবশ্য, দিন যত গেল, পটের ছবি বাংলা দেশে চলিত রইল পটুয়ামহলের নিছক অভ্যাস হিসেবে, এবং শিল্পীরা হয়ে রইল অজ্ঞানেরও অধম। বাংলাদেশে লোকশিল্পের প্রথম যে বোধ এসেছিল সে-বোধ আজকের পটুয়ারা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু, যে শিল্পীসম্প্রদায় এ-বোধ প্রথম পেয়েছিল তারা এত পাকা ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল যে বাংলাদেশ আজও অন্তত অভ্যাস হিসেবে, তার জের টেনে চলেছে, তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারে নি। পটুয়া শিল্পের মূল তথ্যকে তাই শুধু বাংলা দেশের ছবির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায় বললে কমিয়ে বলা হবে। শিল্প-ইতিহাসেরই এটা মূল কথা, সমস্ত দেশেই প্রাগৈতিহাসিক ছবির মধ্যে এই ধরনের বক্তব্যের বিকাশ হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশে অন্যপথে হয়েছিল বলেই কিছুদিনের মধ্যে তার ধারা শেষ হয়ে গেল। শিল্পের মূল রহস্য কি তা জানতে হলে যে-কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবি বা বিশেষ করে বাংলা দেশের প্রাকৃত পটুয়া ছবিকে বিশ্লেষণ করতে হবে ; কারণ ছবির মূল সত্যের সন্ধান এখানে এসেছিল।

সব ছবিরই দুটো দিক থাকে, বলবার কথা আর বলবার ভাষা। প্রসঙ্গ আর আঙ্গিক। মূল পটুয়া ছবিকে দু-দিক থেকে দেখলেই বোঝা যাবে কেন একে শিল্পসাধনার অনিবার্য অধ্যায় বলতে হবে এবং কেন বলতে হবে শিল্পের সত্য এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পটুয়া শিল্পের বলার কথাটা কি? নিঃসন্দেহে বিশ্বপ্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি নয়, অথচ প্রকৃতির মূল কথাটুকু দেওয়া নিশ্চয়ই। বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল এ ছবির উদ্দেশ্য। তাই, পটের ছবিতে একটা গাছ দেখলে বুঝি যে ওটা গাছই, তবু এ-গাছ কোনো-গাছের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। অর্থাৎ গাছের সামান্য সংবাদটুকু আছে মাত্র, বিশেষ গাছের প্ল্যানিটা নেই। এদিক থেকে যে-কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির মিল অনেকখানি। অন্যত্রও শিল্পীর আবেগ নির্ভর খুঁজেছে বস্তুর সামান্য-স্বরূপে। তবু অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে মূল পটুয়া ছবির তফাৎও আছে ঃ প্রথমত, মূল পটুয়া ছবির আবেগ দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। ('পুরাণ' শব্দে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের সমাজ-উৎসৃত Myth বোঝাতে চাই।) দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের দিক থেকে, পটুয়া ছবির পাশেই দেশে ছিল সংস্কৃত শিল্প।

পটুয়া ছবি দানা বেঁধেছিল একটা পুরাণের উপর। এমনটা আর কোনো প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে হয় না এবং এমনটা না হলে শিল্পীর একটা প্রধান সমস্যারই সমাধান হয় না। অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক চিত্র কোনো নাচের ছন্দ এঁকেছে, কোনো মানুষ এঁকেছে, কোনো হরিণ এঁকেছে। কিন্তু খাপছাড়া ভাবে। সব মিলে

একটা জগৎ নয়, এবং কোনো পুরাণে বিশ্বাস নেই। বাংলার প্রাচীন পটুয়ারা কিন্তু এমন একটা জগতের সন্ধান পেয়েছিল যে জগৎ আগাগোড়া সামান্য-লক্ষণের জগৎ, এবং একটা পুরোপুরি সংহত পুরাণের উপর যার স্থিতি। সেখানে যে জটায়ু সে তো আর মরলোকের কোনো বিশেষ পাখি নয়, অথচ পাখির মূল কথাটা তার মধ্যে রয়েছে। সেখানে যে হনুমান সে তো আর কোনো দৃষ্ট বানর নয় ; তার জন্ম-ইতিহাস, তার ক্রিয়াকলাপ, এর কোনোটাই মরলোকের নয়। তবু বানর বলে তাকে চিনতেও ভুল হয় না। আর সেই জটায়ু, সেই বানর, সেই রাক্ষস সবের মধ্যে আশ্চর্য সংহতি। পুরাণের জগৎ মরলোকের জগৎ নয় ; সামান্য-লক্ষণের জগৎ, তবু সংহত জগৎ। আর পটুয়া শিল্পীদের বিশ্বাস এই জগতেই দানা বেঁধেছিল।

শিল্পের পক্ষে এই জাতের একটা পৌরাণিক জগতে বিশ্বাস করবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এখানে শুধু একটা উদাহরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় : ইওরোপের সংস্কৃত-শিল্প বহুদিন খ্রীস্টের পুরাণে বিশ্বাস অটুট রাখতে পেরেছিল, এবং যতদিন পেরেছিল ততদিন অশান্তি জোটেনি। রেমব্রান্টের পর দেখা গেল সামাজিক অবস্থার প্রভাবে উক্ত পুরাণে বিশ্বাস আর টিকিয়ে রাখা কঠিন। শিল্প পুরাণ ছাড়ল কিন্তু এল অশান্তি। গগাঁ ও ভ্যানগগ্ গ্রামের সরলতা ও খ্রীস্টের পুরাণ আঁকড়াবার শেষ চেষ্টা আবার করলেন, কিন্তু সম্ভব আর হল না। পশ্চিম ইওরোপের সাম্প্রতিক শিল্পে প্রকাশ কোনো জীবন নির্ভর বাস্তব পৌরাণিক বিশ্বাসের জন্যে মরিয়ার মতো সন্ধান, অথচ, সে আধুনিক মনে কোনো জীবন-পুরাণই আর ধরছে না। তাই অশান্তির শেষ নেই। মূল পটুয়া ছবির পুরাণ-নির্ভরতা তাই লক্ষ্য করবার। যদিও উত্তরকালে এ-বিশ্বাস নেহাৎ অভ্যাসে পরিণত হবার পর শিল্পীর দল যখন গতানুগতিকে পট এঁকে চলল, তখন এ ভিত্তি তারা বিস্মৃত হয়েছে অভ্যাসের অন্ধকারে।

এই তো গেল বলার কথা ; এবার বলবার ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাদের পৌরাণিক জগতের কথা বাংলার পটুয়ারা বলতে শিখেছিল আশ্চর্যরকম ঘরোয়া ভাষায়। তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই, সূক্ষ্ম কারিগরি নেই, বিলাসের চিহ্ন নেই ; অথচ, এই আটপৌরে ভাষার পাশেই আমাদের দেশে ছিল সাধুভাষার শিল্প, যাকে বলেছি দেশের পোশাকী শিল্প ; দেবতার মূর্তি, মন্দিরের কারুকার্য, সভাগৃহের চিত্র, গ্রামের পালাপার্বণে গড়া প্রতিমা। তার ভাষা গম্ভীর, তার দৃষ্টি শৌখিন, তার ভঙ্গি অতি সংস্কৃত। তবুও পটের ছবি সজ্ঞান ছিল না। কথাটার গুরুত্ব কম নয়। সত্যি কথা, জ্ঞানের কথা অনেক সময় অনেক শিশুও বলে থাকে ; তবু যতক্ষণ দেখা যায় এ কথা অজ্ঞানে বলা হয়েছে ততক্ষণ তার মূল্য দিতে আমরা নারাজ। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কথাকে আসল বলতে আমরা রাজি সে-কথা যখন সচেতন।

ছবির বেলাতেও তাই। প্রাগৈতিহাসিক ছবি, ছোট ছেলের আঁকা ছবি, অনেক সময় শিল্পের আসল সত্য প্রকাশ করে, বিষয়ের সামান্য-রূপ এঁকে দেয়। তবু তার মূল্য শেষ পর্যন্ত অনেক কমে যায়। কারণ এখানে সত্য কথা সজ্ঞানে বলা হয় না। পটুয়া ছবিতেও তা বলা হয় নি, যদিও পটুয়া ছবির দুটো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, পটুয়ারা সংহত কোনো পৌরাণিক জগতে স্থিতি পেয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় বাকি সব জায়গাতেই প্রাগৈতিহাসিক ছবি লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়া ছবি সম্পূর্ণ মরে নি। দ্বিতীয়ত, পোশাকী ছবিতে ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পী প্রমাণ রেখে গিয়েছিল যে শৌখিনতায়, সূক্ষ্ম কারুকার্যে, নিখুঁত করার কাজে, পালিশ করার কাজে, তারা কম দক্ষ ছিল না। তবুও উৎসবাদি ছাড়া শিল্পের প্রকৃত দৈনন্দিন জীবনে এর মূল্য নেই। একমাত্র পালাপার্বণেই মানুষ মেকি সাজতে পারে। ফলে পটের ছবিতে গৃহস্থ পাড়ার ভাষায় কথা বলবার ভঙ্গি দক্ষতার অভাবে নয়, সংস্কৃত ছবি আঁকবার কথা জানা ছিল না বলে নয়।

আর কোনো দেশের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী এ অবস্থা পায় নি—না ছিল তাদের পৌরাণিক জগতে স্থিতি, না জানত তারা পোশাকী ছবির ভাষা। আর তাই, শিল্পের সত্য অজ্ঞানে আবিষ্কার করেও তাকে ধরে রাখতে ওরা পারল না। সভ্যতার অগ্রসর হলে চাকচিক্যের প্রবল আকর্ষণে সে-শিল্প ভেঙে পড়ল, শৌখিনতার প্রখর আলোয় চোখে লাগল ধাঁধা। শিল্পীর দল কোমর বেঁধে নেমে পড়ল পালিশ করার কাজে, শিল্পের আসল কথা গেল ভুলে। আমাদের দেশে যাকে বলে বিভূতির আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হওয়া অনেকটা সেই রকম। ছবি নিখুঁত হল, ছবিতে পালিশ এল—এত নিখুঁত, এত সংস্কৃত যে কল্পনা করাও কষ্টকর। আঁকা আঙ্গুরকে সত্যি আঙ্গুর বলে ভুল করে পাখি পর্যন্ত ক্যানভাস ঠুক্‌রেছে, এত নিখুঁত। যোগশাস্ত্রে বিভূতি-দর্শনে যেমন নেশা ধরার কথা শোনা যায়, শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এই সংস্কার করার নেশাও কম নয়। যতদিন এ-নেশা ছিল ততদিন বেশ ছিল। তারপর, শিল্পসাধনায় এই দীর্ঘ ইতিহাসের পর, এতদিনে ইওরোপীয় শিল্পীদের আজ হঠাৎ টনক নড়েছে, নেশা ভেঙেছে। সংস্কৃত করার পথে এর বেশী তো যাওয়া যায় না। এর পর কী? শিল্পী চলবে কোন্ পথে? ওরা দেখলে এখন সব পথই প্রায় রুদ্ধ। অনেকটা দাবা খেলার মতো। যতক্ষণ খেলবার নেশা ছিল ততক্ষণ আলাদা কথা, কিন্তু হঠাৎ এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে পথ আর নেই। যে পথেই যেতে যায় মাৎ হয়ে যায়। এদিকে খ্রীস্টের পুরাণে বিশ্বাসও ক্ষয়ে গেছে এবং আর কোনো পুরাণও খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা তাই সমস্ত খেলার ছক লণ্ডভণ্ড করে ভাঙতে চায়, যে চাল এতদিন দিয়ে এসেছে সে সমস্ত চাল ফিরিয়ে নিতে চায়। আজকের ইওরোপীয় শিল্পে এই ভাঙ্গনের রূপ প্রত্যক্ষ। ওরা যদি গোড়া বেঁধে খেলতে শিখত তাহলে এ অবস্থা নিশ্চয়ই হত না।*

---

* শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

"ইতিহাস", অর্থাৎ "ইতি হ আস"—এমনটি পূর্বে ছিল ;—অতীতকালের কথা লইয়া ইতিহাস। অতীতকালের কাহার কথা? অতীতের মানুষের কথা। মানুষ ছাড়া অন্য জীব বা অন্য বস্তুর কথা বিভিন্ন বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে ; যেমন পৃথিবীর উৎপত্তি ও পূর্ব ইতিহাস লইয়া ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদের কথা লইয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ লইয়া জীবতত্ত্ব। মানুষের উদ্ভব ও প্রাচীনকালে মানুষের সভ্যতার ও সমাজের বিকাশ যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, তাহা হইতেছে নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান। মানুষকে লইয়া যাহা কিছু ঘটিতেছে, মানুষ একা বা মিলিতভাবে যাহা কিছু করিয়াছে ও করিতেছে, সে সমস্তকেই ব্যাপকভাবে নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞানের অধীনে ফেলা যায়। নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে আসে, মানুষের দেহের ও আবেষ্টনী অনুসারে মানুষের প্রকৃতির আলোচনা ; মানুষের উদ্ভব, ও বিভিন্ন প্রকার মানুষের প্রসারের আলোচনা ; মানুষের সমাজের ইতিহাস ; ও সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি মানব-ধর্মের প্রকাশভূমি যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিতে ইতিহাস (অর্থাৎ সুপ্রাচীন, প্রাচীন ও সাম্প্রতিক অতীতকালে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ যাহা করিয়াছে তাহার কথা) নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞানের মধ্যেই আসে। সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি ইতিমধ্যে Human Science বা মানব-বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে ; কার্য্যকারণাত্মক ঘটনাবলীর আলোচনা বলিয়া ইতিহাসকেও তেমনি Human Science-এর মধ্যে একটা বড়ো স্থান দিতে হয়। ভাষাতত্ত্বও তেমনি Human Science-এর পর্য্যায়ে গৃহীত হইবার মতো আর একটি বিজ্ঞান।

যাহা হউক "ইতিহাস"-এর ক্ষেত্র এখন একটু বেশ ব্যাপকভাবেই ধরা হয়—জাতির সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। আগে ইতিহাস বলিতে রাজা-রাজড়ার কথা, রাজাদের ও অন্য শাসকবর্গের কীর্তি ও কৃতিত্ব, রাজাদের সন তারিখ এবং রাজাদের রাজত্বের কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বড়ো বড়ো ঘটনার তারিখ ও বিবরণ—লোকে এইটুকু বুঝিত। এখন আমরা জানি, এ-সব ঠিক বা পুরা ইতিহাস নহে, এসব হইতেছে ইতিহাসের

কঙ্কাল। রাজার রাজত্বকাল, সন তারিখ—এ-সবকে আশ্রয় করিয়া তবে ইতিহাসের গতি বা ধারা বুঝা যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে জাতির লোকদের প্রগতির আলোচনা, ইহাই হইতেছে সত্যকার ইতিহাস। সূতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন মিছরি দানা বাঁধে, তেমনি সন তারিখ ও বিভিন্ন রাজার রাজত্বের সূত্রকে ধরিয়া কোনও মানব-সমাজের বিকাশের কথা পৌর্বাপর্বক্রমে আলোচনা করিতে পারা যায়। কোনও জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাঙ্গালায় এখন বেশ চলিতেছে। Civilisation বা 'সভ্যতা' বলিলে আমরা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানবসমাজের বহিরঙ্গ—তাহার উন্নত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, তাহার সামাজিক রীতিনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, তাহার রূপশিল্প, বাস্তুশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তাহার সাহিত্য ও ধর্ম, এইসব বুঝি ; এবং Culture বা সংস্কৃতি বলিলে বুঝি—তাহার উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি—তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য্যময় প্রকাশ ; তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যবোধ ;—তাহার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণবস্তু যাহা, মুখ্যতঃ তাহা-ই বুঝি। সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' এই শব্দটি প্রাচীন ভারতে প্রযুক্ত হইত—ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা এই 'সংস্কৃতি' শব্দ পাই—যাহার দ্বারা কোনও বস্তু সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত বা উন্নত হয় তাহাই 'সংস্কৃতি'। ইংরেজি Culture শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তি ধরিয়া, অনর্থক সংস্কৃত ধাতুগত শব্দ 'কৃষ্টি' শব্দ, আমরা Culture-এর প্রতিশব্দরূপে বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতেছিলাম, কিন্তু এই 'কৃষ্টি' শব্দ রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নাই—বেদে 'কৃষ্টি' মানে Tribe বা People অর্থাৎ জাতি বা জন বা জনগণ, এই জন্য তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব ছাত্র কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, অর্বাচীন সংস্কৃতে—বৌদ্ধ সংস্কৃতে—'সভ্যতা' বা 'সংস্কৃতি' অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দের প্রয়োগ ছিল এবং ইহার সমধাতৃক শব্দ 'উৎকর্ষ' উন্নতি অর্থে সংস্কৃতে ও বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত। সভ্যতার অন্তরঙ্গ দিক বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দ কত পূর্বে এবং কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে জানি না। আমি এই শব্দ ১৯২২ সালে প্রথম মারাঠীতে প্রযুক্ত দেখি, এবং তখন হইতে আমি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করিয়া বাঙ্গালাতে ব্যবহার করিতেছি ; নিজ দ্যোতনা শক্তির বলে, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সুন্দর শব্দটি সহজেই বাঙ্গালা ভাষায় সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছে। দুই একজন বাঙ্গালী মুসলমান লেখক 'সংস্কৃতি'র বদলে আরবী 'তমদ্দুন' শব্দ বাঙ্গালায় চালাইতে চাহিতেছেন। 'তমদ্দুন' কিন্তু ঠিক 'সংস্কৃতির' মত সূক্ষ্মভাবে সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানসিক সৌরভ বা তদনুরূপ কিছুর দ্যোতনা আনে না ; ইহা Civilisation অর্থাৎ নগরে যে সভ্যতা

ও নাগরিকতা গড়িয়া উঠে (লাতীন Civis নাগরিক, Civils নাগরিক-সম্বন্ধীয়, Civitas নগর শব্দ হইতে জাত) তাহারই দ্যোতনা করে—'তমদ্দুন' শব্দের মূলে আছে 'মদীনা' বা নগর। এই প্রসঙ্গে 'তমদ্দুন' শব্দটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, দুই একজন বাঙ্গালী মুসলমান লেখক বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার প্রসঙ্গে 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এতাবৎ বাঙ্গালাদেশে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ গ্রামীণ জীবনকে আশ্রয় করিয়া 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি'—নগরকে আশ্রয় করিয়া 'নাগরিকতা' অর্থাৎ Civilisation বা তমদ্দুন' নহে।

যাহা হউক, বাঙ্গালীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, তাহার সংস্কৃতির আলোচনাই মুখ্যবস্তু হইয়া পড়ে। জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব বিশেষ লক্ষণীয় নহে। প্রাচীনকালে নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে (সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বলিতেছি না)—বাঙ্গালীর আহৃত উপাদান লক্ষণীয় নহে। বাঙ্গালীকে দেশের রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষভাবে তাঁহার যুগের বাঙ্গালী জীবনের নিয়ন্তা ও পরিচালক বলিতে পারা যায় না—যে হিসাবে প্রাচীন গ্রীসের আথেন্স নগরীর শাসক পেরিক্লেস ও দ্বিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেক্সান্দর, ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড অথবা রানী এলিজাবেথ, রুশ-দেশের সম্রাট্ পিটর, প্রাচীন ভারতের মহারাজ অশোক ও মধ্যযুগের সম্রাট্ আকবর, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিংকন, ইঁহাদের স্ব স্ব জাতির পরিচালক বা নিয়ন্তা বলা যায়। বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষী জাতি নিজ বিশিষ্ট রূপ পাইতে কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যায় ; যখন বাঙ্গালী জাতি সৃজ্যমান, তখন বাঙ্গালা দেশ শাসিত হইত বিহার ও উত্তর-ভারত হইতে—মৌর্য্য ও গুপ্ত সম্রাটদের আমলে। বঙ্গভাষী জাতির সৃষ্টির সময় হইতে, বিভিন্ন কালে এক বা একাধিক রাজা বা অন্য কোনও শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতা এই জাতির মনের গতি এবং সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া দিতে ও তাহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ রাজা বা রাষ্ট্রনেতার কৃতিত্বের কথা মহাকাল অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বাঙ্গালা দেশেরও অধীশ্বর ছিলেন কি না জানা যায় না ; সম্ভবতঃ অশোক উত্তর-বঙ্গের কিছুটা অংশেরও সম্রাট ছিলেন এবং তাঁহার ধর্মরাজ্যের মধ্যে তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। অশোকের পরে বাঙ্গালাদেশের একাংশে বাঁকুড়া জেলার পুষ্করণার অধিপতি চক্রস্বামী বিষ্ণুর ভক্ত সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার শিলালেখ পাই, কিন্তু তাঁহার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নাই। গুপ্ত সম্রাটগণ বিহার ও মধ্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেন। এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আদিশূর রাজার নাম শুনা যায়। কিন্তু এই আদিশূর এখনও ঐতিহাসিকতার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। পাল

বংশের প্রথম নামী রাজা ধর্মপাল একজন ক্রান্তিকারী শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, হয়তো তাঁহার যুগের বাঙ্গালী জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অবকাশ পায় ; কিন্তু সে বিষয়ে ইতিহাস নিস্তব্ধ। সেন-বংশীয় বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফল মধ্যযুগের বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে কতদূর উপকারক হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ-নিয়ন্ত্রণে যেমন, তেমনি সমগ্র বাঙ্গালার রাজ্য-চালনে, কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণের হাত ছিল, কিন্তু সে অন্য কথা।

অন্য কোনও রাজা বাঙ্গালী জাতির গঠনে বা পরিচালনে কোনও বড়ো কাজ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস মূক হইয়াই আছে। মোগল যুগের পূর্বে তুর্কী পাঠান ও বাঙ্গালী মুসলমান সুলতানদের আমলেও শাসকদের মধ্যে তেমন কোনও বিরাট পুরুষের উদ্ভব দেখা দেয় নাই ; অন্ততঃ তেমন কাহারও খবর না মিলিতেছে ইতিহাসে, না জীবিত আছে জনশ্রুতিতে। রাজা কাঁশ বা কংশ দণুজমর্দনদেব বাঙ্গালা দেশে খ্রীষ্টীয় চৌদ্দর শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সারা বাঙ্গালায় নিজ ক্ষমতা স্থাপিত করেন, বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রান্তের টাকশালসমূহ হইতে মুদ্রিত তাঁহার বাঙ্গালা-লিপিময় মুদ্রাসমূহ হইতে ইহা প্রমাণিত হয় ; কিন্তু মহারাষ্ট্রে শিবাজী সতেরোর শতকে যেভাবে মারাঠা জাতীয় জাগৃতির আবাহন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য যে প্রকারে এখনও পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রজাবর্গের মধ্যে গানে ও কথায় তাঁহার কীর্তিকলাপ মুখরিত, দণুজমর্দনদেব অভাবনীয় ব্যাপার বাঙ্গালা দেশে ঘটাইলেও তাঁহার কথা লোকের মনে ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে নাই, ঐতিহাসিকেরাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করিতে গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন। এই সব কারণে বলিতে হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসে রাজা-রাজড়াদের স্থান অল্প—রাজনৈতিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক, অভিজাত-বর্গ অপেক্ষা জনসাধারণের জীবনকে ধরিয়াই ইহার মুখ্য কার্য্য বা বিকাশ ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। আসাম, কেরল, গুর্‌খা-বিজয় অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপাল প্রভৃতি ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ বা অঞ্চল রাজনৈতিক অপেক্ষা সাধারণ সাংস্কৃতিক দিক হইতে লক্ষণীয়। রাজস্থান, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর, মহারাষ্ট্র (বিশেষ করিয়া শিবাজীর অভ্যুদয়ের পর হইতে), উৎকল (সুলয়্‌মান কিরানী ও তৎপুত্র দাউদ কর্তৃক উৎকল-বিজয় পর্য্যন্ত), পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ (দিল্লী-আগ্‌রা অঞ্চল)—এই প্রদেশগুলির স্বকীয় সাংস্কৃতির গৌরব ছিল এবং তৎসঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাও ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস এই সব দেশের লোকেদের হাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত (১৩১১ সালে) তাঁহার সুবিখ্যাত কবিতাটিতে উচ্চভাবের রাজনৈতিক

এবং শান্তিময় গ্রামীণ, এই দুই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গালা দেশের ভাবগত পার্থক্য ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের চমৎকারভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন।—

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্-এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ—
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ—
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমলনির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লিসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি ॥

তারপরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রলিখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্ক পত্র যথা—
সেদিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা ॥

... ...

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ

আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে ॥

কিন্তু বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতিতে যে কখনও উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের এবং কর্মের সমাবেশ দেখা দেয় নাই, এ কথা বলা চলে না। তুর্কী-বিজয়ের পরে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে, নিখিল ভারতের জীবনে, বাঙ্গালী তেমন বড়ো অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে হিন্দু আমলে বাঙ্গালা দেশ একবার অন্ততঃ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বাঙ্গালার—গৌড়-বঙ্গের—একটা সম্মানপূর্ণ স্থান ছিল। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, আধুনিক বাঙ্গালীর—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—অবদান, কি ভাবজগতে কি কর্মজগতে, সুপরিচিত এবং সকলের দ্বারাই স্বীকৃত।

বাঙ্গালীর ইতিহাস অর্থাৎ বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। আজকাল সমভাষিতাকেই জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। যতদিন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙ্গালী জাতি বলিয়া একটা কিছুর কল্পনা করা যায় না। বাঙ্গালী জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙ্গালী বলা চলে না। টানা ও পড়িয়ান, এই দুইয়ের সূতা মিলিয়া বস্ত্র ; টানা ও পড়িয়ানকে পৃথক সত্তায় বস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

বাঙ্গালী জনগণের গঠনে কী কী উপাদান আসিয়াছে, তাহার আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে ও হইতেছে, আমিও কিছু কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস করিয়াছি। কিন্তু এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। যাহা কিছু বলা যায়, তাহা প্রধানতঃ অনুমানের আধারে। কয়েকটি বিভিন্ন race বা জাতির সমবায়ে বাঙ্গালী জনগণ গঠিত হইয়াছে ; এবং এই গঠনকার্য আরম্ভ হইয়াছে কয় সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা জানা যায় না। যে সকল বিভিন্ন জাতির লোকে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, তাহাদের সকলের দৈহিক সমাবেশ কী রকম ছিল, তাহা ঠিকমতো জানা যায় না। বাঙ্গালায় বা ভারতবর্ষে কোনও প্রকারের মানবের উদ্ভব হয় নাই—বাহির হইতেই ভারতে মানবের আগমন হইয়াছিল। অনুমান হয়, প্রথমে আসে Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু-জাতীয় মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে

ইহারা আফ্রিকা হইতে স্থলপথে ভারতে আসিয়া পৌঁছায়। বাঙ্গালা দেশে ইহাদের কোনও চিহ্ন নাই—তবে সম্ভবতঃ এদেশেও ইহারা আসিয়া বসবাস করিয়াছিল ; আসামের নাগাদের মধ্যে ইহাদের অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন মিলিতেছে ; ইহারা হয়তো পরবর্তী জাতির লোকেদের সহিত সংঘাতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ক্বচিৎ ইহারা তাহাদের মধ্যে মিশিয়া যায়। তাহার পরে আসে Proto-Australoid বা 'প্রাথমিক-অস্ত্রালাকার' নামে অভিহিত একটি জাতি—ইহাদের ভাষার কোনও অস্তিত্ব নাই, তবে ভারতের প্রায় সর্বত্র এখনকার নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইহারা মিশিয়া আছে। এই জাতির দৈহিক আকার-প্রকার সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্গণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের পরে ভারতে এবং বাঙ্গালা দেশে Austric-ভাষী জাতি বা জনগণের আক্রমণ হয়। অস্ট্রিক -জাতীয় লোকেদের আকৃতি কিরূপ ছিল, এবং কবে, কোথা হইতে, কোন্ পথ দিয়া তাহারা ভারতে আগমন করে, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু এই অস্ট্রিক -ভাষী লোক যে প্রায় সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাহাদের যে বিশেষ ভাবে প্রসার ও উপনিবেশ ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে কতকগুলি যুক্তি আছে, সেগুলি ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতিঘটিত যুক্তি। অস্ট্রিক-ভাষা এখন কতকগুলি অনুন্নত অরণ্যবাসী জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে—দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে এই সব অনুন্নত জাতি আর অনুন্নত এবং আরণ্য থাকিতেছে না। সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কুর্কু, শবর, গদব প্রভৃতি মধ্য এবং পূর্ব ভারতের কতকগুলি ভাষা, এবং আসামের খাসিয়া ভাষা—এইগুলি অস্ট্রিকের নিদর্শন। গঙ্গা-যমুনার দেশে এবং সম্ভবতঃ পঞ্চনদের দেশেও, অর্থাৎ উত্তর ভারতের সমতল ভূখণ্ডে, অস্ট্রিক-ভাষীরা এই অঞ্চলের এখনকার অধিবাসী, পাঞ্জাবী হিন্দী কোসলী বিহারী বাঙ্গালা উড়িয়া প্রভৃতি বলে এমন জনগণের মধ্যে, আত্মগোপন করিয়া আছে—উত্তর ভারতের তথা বাঙ্গালার অধিবাসীরা অস্ট্রিক জাতির সহিত, পরে ভারতে উপনিবিষ্ট দ্রাবিড়ভাষী ও আর্য্যভাষী জনগণের মিশ্রণে জাত। দ্রাবিড়েরা পশ্চিম হইতে আসে বলিয়া বোধ হয় ; তাহাদের উৎপত্তি দক্ষিণ ইউরোপের Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্য হইতে। দ্রাবিড়েরা বেশি করিয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতেই উপনিবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তর ভারতের নদীমাতৃক সমতল ভূমিতেও তাহাদের বসবাস ঘটে, অস্ট্রিকদের (বা কোলদের) মধ্যে। বাঙ্গালা দেশেও দ্রাবিড়দের আগমন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং এখানে তাহারা অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। দ্রাবিড়দের পরে আসে আর্য্যেরা, ইহাদের আগমন হয় পশ্চিম হইতে। আর্য্যেরা আসিবার পরে, ভারতে 'মহামানবের মেলা' যেন পূর্ণ এবং সার্থক হইবার পথ পায়। আর্য্যেরা সভ্যতায়, নগর-গঠনে, বাস্তু ও অন্য শিল্পে, খুব উন্নত ছিল না। কিন্তু তাহারা ছিল কল্পনাশীল ও কৃতকর্মা জাতি। তাহারা এদেশে প্রাচীনতর দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক

সভ্যতা ও সমাজ-নীতির আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে ; এবং উত্তর ভারতবর্ষে যে অনার্য্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগণের মধ্যে নবাগত আর্য্যেরা উপনিবিষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে রক্তে ও সভ্যতায় আর্য্যদের সংমিশ্রণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে, প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু জনগণ ও হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে। প্রথমটায় এই সভ্যতায় আর্য্যের আহৃত উপাদান-সমূহই বিশেষ প্রবল থাকে, পরে বহু অনার্য্য (অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়) ভাব ও রীতিনীতি অল্পবিস্তর পরিবর্তিত আকারে দেখা দিতে থাকে ; এবং ইহার ফলে, বৈদিক ও ঔপনিষদ ধর্ম ও চিন্তা এবং সভ্যতার পরে, তথাকথিত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম ও ভাবধারা এবং এই যুগের ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা রূপগ্রহণ করে ; আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সংমিশ্রণ না ঘটিলে কোনও বিশিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। উত্তর ভারতে এখনকার পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশে এবং বিহারে এইভাবে উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির ও জনগণের পত্তন ঘটিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যেই। পরে ঠিক সেই ভাবে বাঙ্গালা দেশেও তাহা ঘটিল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে এই মিশ্রণে, বিভিন্ন-জাতীয় উপাদানের অল্পতা বা আধিক্যকে পরবর্তীকালের ভারতের নানা প্রাদেশিক সংস্কৃতির ও ভাষার প্রকৃতির পার্থক্যের একটি মুখ্য কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোথাও আর্য্য উপাদান বেশি ছিল, কোথাও দ্রাবিড় এবং কোথাও বা অস্ট্রিক অথবা প্রাথমিক-অস্ত্রালাকার ; এবং পূর্বে আলোচিত এই কয়টি বিভিন্ন মৌলিক উপাদান ভিন্ন হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশসমূহের, উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালায়, ও আসামে আর একটি মানবীয় উপাদান ভারতের জনগণকে গড়িতে সাহায্য করিয়াছিল (বিশেষতঃ আসামে, উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালায়, ও নেপালে) এবং সেটি হইতেছে—ভোট-চীন বা মোঙ্গল জাতির মানব। উত্তর-চীন হইতে ইহাদের তিব্বতে আগমন হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে ; পরে ইহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া এবং আসামের পথ ধরিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব কোণে উপনিবিষ্ট হয়।

এইভাবে উত্তর ভারতে ভারতীয় জনগণের উদ্ভব হইল, চারটি বা পাঁচটি জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির ও সংস্কৃতির মানুষের সংমিশ্রণের ফলে। এই সংমিশ্রণ সর্বত্র একভাবে হয় নাই, এবং এককালেও হয় নাই। উত্তর ভারতের এই সংমিশ্রণ-কার্য্য পূরা হইবার পরে বাঙ্গালা দেশে ইহার আরম্ভ হয়। আবার উত্তর ভারতে এই সংমিশ্রণে solvent বা দ্রাবকের কাজ করিয়াছিল আর্য্যের ভাষা—বৈদিক, লৌকিক সংস্কৃত এবং বিভিন্ন প্রাকৃত রূপে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা (অথবা সংস্কৃতির ইতিহাসের কথা) এইবার ধরা যাক। বাঙ্গালা ভাষা তাহার আধুনিক অর্থাৎ বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল

খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে ; অধুনালব্ধ প্রাচীন বাঙ্গালার কতকগুলি নিদর্শন হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। উত্তর ভারতের আর্য্যভাষা, উত্তর ভারতে ও বিহারে মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য জনগণের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে যে রূপ ধারণ করে, আর্য্যভাষার সেই প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি প্রকারভেদ মাগধী প্রাকৃত, সম্ভবতঃ খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতক হইতে—মৌর্য্য রাজশক্তির বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে—বাঙ্গালা দেশে প্রতিবেশী মগধ হইতে আগত রাজকর্মচারী, বণিক, সৈনিক, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও যতি এবং সাধারণ ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক আনীত হইতে থাকে। শতকের পর শতক ধরিয়া যেমন যেমন এই মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তন মগধে হইতেছিল, বাঙ্গালা দেশেও তেমন হইতেছিল। আর্য্যভাষা বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি নগরে বা অন্য কেন্দ্রে প্রথমটায় বিহার ও উত্তর ভারত হইতে আগত ঔপনিবেশিকদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে ; পরে দেশের অভিজাত ও উচ্চবংশীয় লোকেদের দ্বারা এই ভাষা, রাজভাষা বলিয়া এবং শক্তিশালী উত্তর-ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের (ব্রাহ্মণ্য, জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ মতের) ভাষা বলিয়া, সাধারণতঃ বিনা আপত্তিতে সহজভাবে গৃহীত হইতে থাকে। আর্য্যভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষাই লোকে বলিত ; এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গালায় নবাগত ভোট-চীন বা ভোট-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর ভাষাও কতকটা নিজ স্থান করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চীন, এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে এক-ই ভাষা-সূত্রে এবং এক-ই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধিয়া দিল বিহারের পথ ধরিয়া আগত উত্তর ভারতের আর্য্যভাষা। বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার লিপি ছিল না। লিপির শক্তিতে শক্তিশালী আর্য্যভাষার যে মর্যাদা প্রথম হইতেই বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল, সে মর্য্যাদা এ দেশের অনার্য্যভাষার ভাগ্যে ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন লিখিত বা পুস্তক-নিবদ্ধ শাস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যখন বাঙ্গালায় আসিল, এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত-শ্রেণী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, সঙ্ঘ ও জৈন যতিগণের চেষ্টায়, রাজশক্তির সহায়তায় ও আদর্শবাদী প্রচারকের উৎসাহে বলীয়ান্ আর্য্যধর্ম তাহার তিনটি প্রধান রূপ লইয়া বাঙ্গালায় অনার্য্য জনগণের মধ্যে যখন দেখা দিল, তখন আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্মের গতিকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কিছু বাঙ্গালার অনার্য্য জগতে ছিল না। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় (ও পরে ভোট-চীন) জাতির লোকেরা ছিল খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ; তাহাদের মধ্যে ঐক্যের বা যোগসূত্রের অভাব ছিল ; এবং এই সব অনার্য্য জাতির পুরোহিত বা ধর্মনেতারাও সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের সমন্বয়াত্মক এবং উচ্চকোটির দার্শনিক চিন্তায় সমুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ আর্য্যধর্মের প্রতিস্পর্ধী কিছু তাহাদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত আদিম প্রকৃতির ধর্মানুষ্ঠান ও totemistic অর্থাৎ পিতৃপুরুষ রূপে কল্পিত পশু বা উদ্ভিদের কাহিনীর সহিত জড়িত পুরাণকথা হইতে প্রাপ্ত হয়

নাই। আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্মের জয় এইভাবে সহজেই ঘটিয়াছিল। ধীরে ধীরে দেশের লোকেরা আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতে থাকে, প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা হয় ; এবং দলে দলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্র লইয়া বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন—গুপ্ত যুগ হইতেই ভূমিদান করিয়া ব্রাহ্মণ বসানো একটা রীতিমতো কার্যক্রম হিসাবে যেন গৃহীত হইতে থাকে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্রীষ্টীয় ৪০০-র দিকে ভারতে তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে আসেন, তাঁহার ভ্রমণ-কথা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল ; এবং তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের মতো স্থান এদেশের বৌদ্ধ জ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউএন্‌ৎ-সাঙ্ বঙ্গদেশে আসেন, তাঁহার বর্ণনা পাঠে মনে হয়, সারা বাঙ্গালা দেশ তখন আর্য্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালার সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে ; মনে হয়, সেই সময়ে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন-জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্য্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট nation বা জনগণ-এ পরিণত হইয়াছিল। সমভাষিতাকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু nationhood অর্থাৎ জাতীয়তা বা একরাষ্ট্রিকতার ধারণা তখন পৃথিবীতে কোথাও দেখা দেয় নাই—ভারতেও নহে।

॥ ২ ॥

এইভাবে বাঙ্গালী জনগণের পত্তন হইল—বাঙ্গালীর সংস্কৃতি তাহার আদিম রূপ গ্রহণ করিল। এই সংস্কৃতিতে কোন্ জাতীয় লোকের কাছ থেকে কী কী উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একটা অতি জটিল সমস্যা। এখন থেকে হাজার বারো-শ কি পনেরো-শ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর ধর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ কি রকম ছিল, তাহা জানিবার চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ; এই জানার সার্থকতা এখানে, যে, তাহার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদেরই জানিতে পারিব এবং অতীত ইতিহাসের গতি আলোচনা করিয়া, জাতির প্রকৃতির কিছুটা আভাস পাইলে আমাদের ভবিষ্যৎকেও তাহার ফলে কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়তো আমরা সমর্থ হইব।

ইংরাজিতে একটি কথা আছে, The old gods never die—পুরাতন দেবতারা চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা মরেন না। দেশের বা জাতির প্রাচীন ধর্ম একেবারে নির্মূল হইয়া যায় না—নূতন ধর্ম বাহির হইতে আসিয়া গৃহীত হইলেও তাহাতে পুরাতনের অনেক জিনিসই একটু নাম ও রূপ বদলাইয়া নিজ মৌরশী পাট্টা কায়েম রাখিয়া থাকে। আর্য্যেরা আসিল তাহাদের হবন বা হোমমূলক ধর্মানুষ্ঠান লইয়া। দেশে,

অনার্য্যদের মধ্যে পূজামূলক ধর্মানুষ্ঠান ছিল ; 'পূজা' আংশিকভাবে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃত-ভাষাময় অনুষ্ঠান লইয়া আর্য্য-অনার্য্যের মিলিত ধর্মে (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মে) নিজ স্থান করিয়া লইল। আর্য্যদের দেবলোক ও অনার্য্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের দেবলোক, উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা মিল দাঁড়াইয়া গেল, আর্য্যানার্য্য অর্থাৎ পৌরাণিক দেব-লোকের 'সুধর্মা-সভার'-অধিবাসীদের সৃষ্টি হইল। প্রাচীনের ধারা নবীনের সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া পরিবর্তিত আকারে কোথাও বা ক্ষীণভাবে কোথাও বা আরও পরিবর্ধিত রূপে, এখনও পর্য্যন্ত প্রবাহিত রহিয়াছে।

প্রাচীন অনার্য্যভাষা, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এগুলি আর্য্যভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে ; এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে। এ সমস্ত হইতেছে ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং এই আলোচনার সাহায্যে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত ও সংমিশ্রণের পরিচয় আমরা কিছু পরিমাণে পাইতেছি। অনার্য্যধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি তেমনি অধুনা প্রচলিত ব্রাহ্মণানুমোদিত ও শাস্ত্র-নিবদ্ধ হিন্দু ধর্মে, তথা দেশের মধ্যে (বিশেষ করিয়া অনুন্নত ও অশিক্ষিত জনসমূহের মধ্যে) প্রচলিত নানা গ্রাম-দেবতার পূজায় ও লোকধর্মে এবং Folklore অর্থাৎ লোকযানের মধ্যে মিলিবে। এখন মোটামুটিভাবে আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈদিক আর্য্যধর্মের বাহিরে যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম মিলে, যে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগদর্শন ও যোগের নির্দ্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব-শক্তিবাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, সে সমস্ত জিনিস মুখ্যতঃ অনার্য্য-ধর্মজগৎ হইতেই গৃহীত। এই দিক দিয়া, উৎপত্তি ও বিকাশের দিক দিয়া, লৌকিক দেবতা লোকধর্ম ও লোকযানের আলোচনা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এগুলির মধ্যে আমাদের সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির এবং আধুনিক বাঙ্গালী গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত দুই চারিটি লোকধর্মের কথার উল্লেখ করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে, ধর্মপূজা নামে একটি সুপরিচিত লোকধর্ম প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ্যের সহিত এই লোকধর্মের একটা আপস হইয়া গিয়াছে—ধর্মপূজার প্রধান দেবতা ধর্মঠাকুর এখন কোথাও বিষ্ণুর সহিত, কোথাও শিবের সহিত, কোথাও বা সূর্যের সহিত অভিন্নরূপে গৃহীত হইয়াছেন। ধর্মপূজাকে এখন বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের একটি অঙ্গ বলিতে হয়। কিন্তু ইহাতে এমন অনেক অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতি, এমন অনেক ভাবধারা আছে, যেগুলিকে ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রানুমোদিত বলা চলে না, যেগুলি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেতর জগতের সহিত সম্পৃক্ত। আধুনিক শিক্ষিত জনের দৃষ্টি এদিকে পড়িল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী এ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করিলেন। 'ধর্ম' দেবতার নামটির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দুই একটি উল্লেখ ধর্মপূজা-বিষয়ক গ্রন্থে পাইয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ধর্মপূজা হইতেছে বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবশেষ মাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনার আবশ্যকতা আসিতেছে। ধর্মপূজার অন্তর্নিহিত ভাবাবলী এবং ইহার অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া মনে হয়, ইহা বৌদ্ধধর্মের সহিত সম্পৃক্ত নহে—ইহা একটি স্বতন্ত্র Cult বা আম্নায় এবং ইহা এদেশের (বাঙ্গালা দেশের ও উত্তর ভারতের) আদিম অস্ট্রিক জাতির মধ্যে আর্য্যদের আগমনের পূর্বে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উদ্ভবের পূর্বে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহারই ব্রাহ্মণানুমোদিত রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। ধর্মপূজা-মতে সৃষ্টি-পত্তন, ধর্মদেবতার বিশেষ ক্রিয়া বা শক্তি প্রভৃতি সমস্তই এক অতীত যুগের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গালায় ধর্মপূজা-সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি-কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী মধ্য ভারতের অনার্য্য (দ্রাবিড়)-ভাষী গোণ্ডদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে, Verrier Elwin ও তাঁহার সহকর্মী শ্যামরাও হিব্‌লে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। এই অস্ট্রিকভাষীদের ও সম্ভবতঃ বাঙ্গালার দ্রাবিড়ভাষীদের ধর্মের স্বরূপ কী ছিল তাহার একটা ক্ষীণ আভাস হয়তো ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে ; এই আদিম অস্ট্রিক ধর্ম, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের যুগ হইতেই যে ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য্যদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইতেছি বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা সৃজনের কালে, অর্থাৎ বিশিষ্টতা গ্রহণের কালে যে সমস্ত শুদ্ধ অনার্য্য এবং মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিবিষয়ক ভাব ও অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, ধর্মপূজার আদি-রূপ তন্মধ্যে যেমন অন্যতম, তেমনি সহজিয়া, তান্ত্রিকতা, নাথধর্ম এবং সর্পের দেবতা বিষহরী বা মনসার পূজা, ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রভৃতিও ছিল। তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মত সমসাময়িক মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যেমন মিশিয়া গিয়াছিল, তেমনি আবার ব্রাহ্মণ্য (শৈব ও শাক্ত এবং বৈষ্ণব) ধর্মের মধ্যেও এই দুইটি ধর্মমত ও পদ্ধতি নিজ স্থান করিয়া লয়, এবং নাথধর্ম, মনসাপূজা ও দক্ষিণ রায়ের পূজাও মধ্যযুগের বাঙ্গালার হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

আবার ওদিকে ইস্‌লামধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণ রায়ের পূজা ইস্‌লামী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গাজীমিয়াঁর নামে বাঙ্গালী মুসলমান জানপদবর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। ধর্মপূজা, নাথধর্ম, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকতা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক বিবিধ দেবতার পূজা—এ-সমস্তের ইতিহাসের সহিত হাজার বছরেরও অধিক কালের বাঙ্গলার ধর্মবিষয়ক ও উচ্চচিন্তাবিষয়ক 'সংস্কৃতি' ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও মর্ত্যে অবস্থিত তেত্রিশ জন দেবতাকে অগ্নির মাধ্যমে ঘৃত দুগ্ধ

সমিধ্ মাংস পুরোডাশ প্রভৃতির দ্বারা আরাধনা করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠাপন্ন ও শক্তিশালী হওয়া—ইহাই ছিল বাস্তববাদী আদি-আর্য্যের কাম্য। অনার্য্যদের মধ্যে (যেমন, অস্ট্রিকদের মধ্যে) জল, স্থল, গিরি, অরণ্য অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোকের ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অধোলোকের অধিবাসী দেবতার পূজা ছিল ; আবার তাহাদের মধ্যে যৌগিক বিভূতি বা অপার্থিব শক্তির অধিকারী যোগীতে, দিব্যজ্ঞান- ও শক্তি-সম্পন্ন পূজারীতেও বিশ্বাস ছিল। এই পূজারী বা যোগী—আধুনিক ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষায় এরূপ দিব্যশক্তিমান্ পূজারীকে Shaman শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়—মৃত্যুর পরেও যে-সমাজের লোক তিনি ছিলেন, সেই সমাজের ভালোমন্দ করিতে পারেন বলিয়া ধারণা ছিল ; পৃথিবীর বহু আদিম ও এমন-কি উন্নত জাতির লোকেদের মধ্যে এখনও অনুরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। এইরূপ শক্তিধর যোগী বা পূজারীর মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিতে লোকে তাঁহার আত্মার তুষ্টির জন্য নিয়মিত পূজা করিত ; তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ অথবা দগ্ধাবশিষ্ট দেহাস্থি বা দেহভস্মকে ভূপ্রোথিত করিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকা ইষ্টক অথবা প্রস্তর দিয়া একটি 'স্তূপ' গঠিত হইত, এবং এই স্তূপকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে সমাহিত মৃতের পূজা হইত। এই রীতি সম্ভবতঃ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয় জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ; এবং এই দুই জাতির মানুষের বসতির প্রসারক্ষেত্র ধরিয়া, পশ্চিমে ঈরান হইতে আরম্ভ করিয়া আফ্গানিস্থান এবং সমগ্র ভারত জুড়িয়া এই ধরনের প্রেতাত্মার সম্মাননার জন্য সমাধি-পূজা প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা দেহ ভূপ্রোথিত করিত, দাহও করিত ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এরূপ সমাধি-পূজার রীতি ছিল না। ভারতে আসিয়া এই জিনিসকে তাহারা গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই—'এড়ুক পূজা' বলিয়া মহাভারতে ও রামায়ণে ইহার অবজ্ঞাপূর্ণ উল্লেখ আছে। কিন্তু এই 'এড়ুক পূজা' বা সমাধি-পূজা ছিল অতি প্রাচীন রীতি, ইহা সহজে যাইবার নহে। বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধদেবের প্রতি অত্যধিক সম্মানের রীতি থাকায়, বৌদ্ধ চৈত্যপূজাকে আশ্রয় করিয়া এই সমাধি-পূজাই বলবৎ রহিল—সারা দেশ বৌদ্ধ রাজা ও ভাগ্যবান্দের প্রসাদে চৈত্যে চৈত্যে ভরিয়া গেল ; পরে দেখাদেখি ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও সন্ন্যাসী-গুরুর সমাধির পূজা বা সমাধির প্রতি বিশেষ সম্মানের রীতিও গৃহীত হইল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক এই প্রাগার্য্য রীতি গৃহীত বা অনুমোদিত হইবার পরে আফ্গানিস্থান, উত্তর ভারত ও বাঙ্গলা দেশের চৈত্যপূজক বৌদ্ধদের (এবং সন্ন্যাসীর সমাধির প্রতি সম্মান-প্রদর্শক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী লোকেদের) অনেকে নবাগত ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু চৈত্যপূজা ছাড়িল না ; এই পূজার বাহ্য অবয়ব ও অনুষ্ঠান এবং এই পূজা-সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ পরিবর্তিত হইল, চৈত্যপূজার অভিনব ইস্লামী রূপ দেখা দিল—পীরের দর্গা রূপে। ইস্লামের জন্মভূমি আরবদেশে অনুরূপ জিনিস নাই—যদিও ইস্লামের মধ্যে 'জাহিলিয়া' অর্থাৎ মোহম্মদের পূর্বেকার 'অজ্ঞতা'র

যুগের অনেক ধর্মাচার ও অনুষ্ঠান ইস্‌লামের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ কোরাণী বা মোহাম্মদী ইস্‌লামের পক্ষপাতী, তাঁহারা দর্‌গাকে আশ্রয় করিয়া ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করেন না, অনেকে এ সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং এইরূপ রীতিকে 'পীর-পরস্তী' অর্থাৎ 'স্থবির-পূজা' এবং 'গোর-পরস্তী' অর্থাৎ 'সমাধি-পূজা' বলিয়া অবজ্ঞা করেন ; কিন্তু সারা বাঙ্গালা, সারা ভারত ও পূর্ব ঈরান জুড়িয়া পীরের দর্‌গায় এবং মজারে মুসলমান (এবং মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দু) ভক্তবৃন্দ শীরণী দিয়া জোরের সঙ্গে পূজা করিতেছে ; এই জিনিস বন্ধ করিতে যাওয়া মুসলমান সমাজে ধর্মীয় অন্যবিধ নেতারা নিরাপদ মনে করেন না।

এইভাবে দেখা যায়, আমাদের বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি কতটা প্রাচীনের রূপান্তর মাত্র। ভৌতিক বা জাগতিক সভ্যতা যাহা সংস্কৃতির ভিত্তি—তাহা ভৌগোলিক এবং তদধীন অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালা দেশ হইতেছে সর্বতোভাবে কৃষির দেশ ; কৃষি ও মৎস্যশিকার এবং অল্পস্বল্প গোচারণ—এইগুলির উপরে বেশির ভাগ বঙ্গবাসীর আজীবিকা নির্ভর করে। বাঙ্গালা দেশ স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্যকেন্দ্র নহে—যেভাবে দক্ষিণ আরবদেশ এবং ফিনিশীয় প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার কতকগুলি অঞ্চল ও কার্থেজ নগরী প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন স্থান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার বণিকেরা জাহাজে করিয়া সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ ব্রহ্ম, কটাহ্ বা মালয়দেশ (আধুনিক Kedah), সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চীনদেশ প্রভৃতিতে যাইত, সিংহলে খুবই যাইত, এবং পশ্চিমে গোয়া অঞ্চলে ও এমনকি পারস্যদেশেও যাইত ; কিন্তু বাঙ্গালাদেশ পৃথিবীর বাণিজ্যপথের বাহিরে এক প্রান্তে পড়িয়া থাকায়, বাঙ্গালীরা পৃথিবীর অন্যতম বণিক জাতি হইয়া উঠিতে পারে নাই, বেশীর ভাগ বাঙ্গালী বরাবরই কৃষিজীবী ছিল। এইজন্য বাঙ্গালা দেশে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে কৃষিমূলক গ্রামীণ সভ্যতা ; তাহা গুজরাট-রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারতের কোনও-কোন অঞ্চলের মতো, মধ্যযুগের ইতালির জেনোয়া ও ভেনিস প্রভৃতি বন্দরের মতো, পরিবর্তীকালে হলাণ্ড ও ইংলাণ্ডের মতো বাণিজ্যমূলক এবং সমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতা নহে। বাঙ্গালা দেশে তেমন বড় নগর গড়িয়া উঠে নাই—তক্ষশীলা, মথুরা, দিল্লী, কান্যকুব্জ, কাশী, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, কাঞ্চীপুর, উরগপুর (তমিলে 'উরৈয়ূর') বা মাদুরা মদুরৈ (=সংস্কৃত 'মথুরা', 'মধুরা'), লাহোর বা পুণার মতো শহর বাঙ্গালার মাটিতে দেখা দেয় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে অস্ট্রিক জাতির গ্রামীণ সভ্যতার ধারা-ই যে বলবৎ রহিয়াছে, তাহা-ই বলিতে হয়। পশ্চিম ও উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির নাগরিক সভ্যতা, যে সভ্যতার শিকড় গিয়া পঁহুছায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা, ছান্‌হু-দড়ো প্রভৃতি বিরাট্ নগরগুলিতে—সেই নাগরিক সভ্যতা বাঙ্গালা দেশে প্রকাশ পায় নাই।

বাঙ্গালী জাতির সৃজনের কালে বাঙ্গালা দেশের অর্থনৈতিক সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিষয় লক্ষণীয়, এবং এ বিষয়ে আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষিত করেন আমার সহকর্মী ও সুহৃদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়। বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন অর্থাৎ এখন হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী-বিজয় পর্যন্ত যে সমস্ত ভূমিদানের দলিলস্বরূপ তাম্রপট্ট পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গুপ্ত রাজাদের আমলে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাম্রলিপিগুলিতে যে-সমস্ত প্রধান রাজকর্মচারী ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ থাকিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই বণিক-ও ব্যবসায়ী-শ্রেণীর ব্যক্তি হইতেন—যথা, 'নগরশ্রেষ্ঠী' বা নগরের প্রধান শেঠ বা বণিক, 'প্রথম সার্থবাহ' অর্থাৎ বণিক-সমাজের প্রতিনিধি, 'প্রথম কুলিক' অর্থাৎ উৎপাদক শিল্পীদের প্রতিনিধি, এবং 'প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ' অর্থাৎ রাষ্ট্রের দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা। দেখা যাইতেছে যে, প্রথম প্রথম, গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে, বণিক ও শেঠ অর্থাৎ 'ব্যাঙ্কার' এবং শাসকবর্গেরই প্রাধান্য বেশি ছিল ; প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে, কৃষিজীবীদের পক্ষ হইতে, প্রতিনিধিরূপে তেমন লোক নেওয়া হইত না বা ডাকা হইত না। কিন্তু পরবর্তীকালের পাল ও সেন রাজাদের আমলের তাম্রপট্টে দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামের কৃষিজীবী-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও একটা স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহার কারণ এই যে, গুপ্ত সম্রাটদের আমলে বাঙ্গালা দেশের কৃষিজীবী প্রজারা বেশির ভাগই ছিল অনার্য্যভাষী এবং বিজিত পর্য্যায়ের, কিন্তু বণিক ও সার্থবাহেরা ছিল পশ্চিম হইতে আগত আর্য্যভাষী ; অনার্য্য প্রজার দেশে এই কারণে আর্য্যভাষী রাজকর্মচারীদের ন্যায়ই তাহাদের মর্য্যাদা ও উচ্চ স্থান ছিল। পরে আর্য্যভাষার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে যখন পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরাও আর্য্যভাষী হইয়া দাঁড়াইল তখন রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় ব্যাপারে তাহাদেরও অন্ততঃ বাহিরেও কিছুটা সম্মান দেখানো অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল।

পাল এবং সেন-বংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালী জনগণ ও তাহাদের ভাষাও অন্যতম মুখ্য বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইল। নূতন ভাষা বাঙ্গালার রূপ গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতি এই ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের কার্য্যে লাগিয়া গেল—আনুমানিক দশম শতক হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ চর্যাপদকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাস আরম্ভ হইল। কিন্তু অনুমান হয়, প্রথমটা নিরক্ষর জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়াই বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য্যগণ ও নাথপন্থী সাধকগণ দেশভাষা বাঙ্গালাতে (অথবা গৌড়ীয় ভাষাতে) লিখিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষিত লোকে তখন নিখিল-ভারতীয় সংস্কৃতির ভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের মোহে পড়িয়াছিলেন—তাঁহাদের হাতে সংস্কৃত ছাড়া দেশভাষার চর্চা হইত না। অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষা একটা ক্রমোন্নতিশীল ও প্রৌঢ় সাহিত্যের ভাষারূপে দাঁড়াইয়া না যাওয়া

পর্য্যন্ত। বাঙ্গালা ভাষার প্রাথমিক যুগে, বাঙ্গালা দেশের উচ্চ-শিক্ষিত মনের পরিচয় পাই বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কবিদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে ও সংস্কৃত কবিতায় এবং কাব্যে। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'র মতো সংগ্রহ-গ্রন্থে আমরা শত-শত বাঙ্গালী কবির সংস্কৃত কবিতা দেখি, এবং যে-যুগে বাঙ্গালা ভাষা শিশুর মতো চলিতে শিখিতেছে মাত্র, সেই যুগে বঙ্গ-সরস্বতীর বীণাঝংকার-মার্জিত-রুচির বাঙ্গালী কবির কল্পনা ও ভাবুকতার পরিচয় আমরা এইরূপ সংস্কৃত কবিতাবলীর মধ্যেই পাই।

তুর্কী-বিজয়ের পরে বাঙ্গালী পণ্ডিতজন এবং বাঙ্গালী জনগণ পরস্পর-বিরোধী টানের মধ্যে পড়িল। বৌদ্ধ ধর্ম তখন পতনের দশায়—ইহার অন্তিমরূপ অনেকটা বজ্রযান ও সহজযানের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রেতন্ত্রে পর্যবসিত হয়, এবং আধ্যাত্মিক ও সামাজিক, উভয় ক্ষেত্রে ইহার পরাভব ঘটে ; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তখন একদিকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে ও অন্য দিকে তান্ত্রিক শক্তিপূজাকে অবলম্বন করিয়াও, জনসমাজের মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে সুযুক্তিময় ধর্মজীবনের প্রচার করিয়া, পুনরায় নবশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে ;—এমন সময়ে তুর্কী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষিত ইস্‌লাম ধর্ম আসিয়া দেশে নূতন ঝড় বহাইয়া দিল, লৌকিক বা গ্রামীণ ধর্ম উচ্চভাবের দর্শন ও চিন্তা হইতে বিচ্যুত থাকিয়া কেবল কতকগুলি নিরর্থক অনুষ্ঠানে অবনমিত হইল। এই কয় প্রকার বিভিন্ন আদর্শের বা বিভিন্ন অনুপ্রেরণার ভাবধারার পরস্পর সংঘাতের মধ্যে এক দিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যমনোভাব ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, দেশের জনগণের জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি রূপে দেখা দিল, অন্য দিকে তেমনি নূতন আগত ইস্‌লামের সহিত এই শক্তির সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হইল।

ইস্‌লাম ভারতবর্ষে দুইটি বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয় ; এক—শরিয়ৎ বা শাস্ত্রের অনুমোদিত গোঁড়া ইস্‌লাম, যাহার সহিত অন্য ধর্মমতের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা ব্রাহ্মণ্যকে 'কুফর' অর্থাৎ ইস্‌লাম-বিরোধী ধর্মমাত্র বলিয়া মনে করে ; আর দুই—সূফী মতের ইস্‌লাম, যাহার আদর্শ ছিল উদার ও সর্বজনীন, যাহার সহিত হিন্দু দর্শনের ও হিন্দুর উচ্চাঙ্গের ধর্মজীবনের একটা আপস সহজ ছিল। শরিয়তী বা গোঁড়া বা অনুদার ইস্‌লামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুর সমস্ত চেষ্টা আপনা হইতেই নিয়োজিত হইল। ভক্তিবাদ এবং রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের ভাষানুবাদ এই কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইল। হিন্দুর মনকে সূফী মতের ইস্‌লাম ভিতর হইতে বেশ একটু নাড়া দিল ; তাহার ফলে ভারতের ধর্মজীবনে ভক্তিবাদের উপরে বাহিরের অনুভূতির একটু রঙ চড়িল এবং কবীর প্রমুখ 'সন্ত' বা সাধুদের জীবনী ও বাণী প্রচারের ফলে সূফিয়ানা ঢঙের সাধন-মার্গ হিন্দুদের মধ্যে একটা স্থান করিয়া লইল। শরিয়তী ও সূফিয়ানা—এই দুই প্রকারের ইস্‌লামের মিলিত প্রভাব আসিয়া মুসলমান

রাজশক্তির সহিত যোগ দিল এবং বহু হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। বাঙ্গালীর জীবনে ইহার ফলে আর একটি নূতন ভাবধারা আসিয়া মিলিত হইল—ইস্‌লামী ভাবধারা, বিশেষ করিয়া সূফী মতের ভাবধারা ও আদর্শ।

শুনিয়াছি, কোথায় নাকি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব কীর্তন গানে। এই কথার বিরুদ্ধে আমার জনৈক উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিপূতচিত্তযুক্ত বন্ধুকে প্রতিবাদ করিতে শুনিয়াছি—তিনি বলেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির প্রকাশভূমি কীর্তনের গান নহে, বাঙ্গালার সংস্কৃত পণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞান ও চিন্তা বৈষ্ণব আখড়ায় নহে, পণ্ডিতের টোলে বাঙ্গালী প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের সমন্বয় এইভাবে করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান এবং ভক্তি, রসসাধনা এবং নিদিধ্যাসন, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে উভয়েরই স্থান আছে, সুতরাং একটিকে বড়ো করিতে গিয়া অন্যটিকে বাদ দিলে চলে না। এ বিষয়ে, আমরা কে কোন্‌টির দিকে ঝুঁকিব, সে বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও রুচি বা প্রবৃত্তিই বলবৎ হইয়া থাকে, কিন্তু একের জন্য অন্যটিকে বর্জন করা যথার্থ মানসিক সংস্কৃতির লক্ষণ নহে। আমার মনে হয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদান বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকার, সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে দুইয়েরই উপযুক্ত বিকাশ দেখা গিয়াছে; বাঙ্গালী জগৎকে রসের পূজারী কবি ও রূপকার দিয়াছে এবং জ্ঞানের পূজারী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও দিয়াছে।

ইস্‌লাম আসিয়া সাত শত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে অর্ধেকের অধিক বাঙ্গালীকে নিজ পতাকার তলে টানিয়া লইলেও, বাঙ্গালীর ভাবজগতে সেদিন পর্য্যন্ত ইস্‌লামের সাক্ষাৎ প্রভাব নিতান্তই অল্প ছিল। দুই পক্ষে গোঁড়া থাকিলেও বাঙ্গালাদেশের ইস্‌লাম ও বাঙ্গালার হিন্দুত্ব প্রথম হইতেই একটা আপস করিবার জন্য চেষ্টিত ছিল দেখা যায়। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলমান প্রচারককে ভূমি দান করিতেছেন; তুর্কী কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়ের প্রথম শত বৎসরের মধ্যে ত্রিবেণী-বিজয়ী ও প্রথম মুসলমান মাদ্রাসা বা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জফর খাঁ-ও দরাপ খাঁ নামে পরিচিত হইয়া হিন্দুর উপাসিত গঙ্গাদেবীর ভক্ত বনিয়া গিয়া সুমধুর ও ভক্তিপূর্ণ ভাষায় গঙ্গাস্তব রচনা করিতেছেন। ইংরেজ আমলে ইংরেজ রাজনীতির চালের ফলে এখন এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই মুসলমান বাঙ্গালীকে পাকা শরিয়তী মতের মুসলমান বানাইবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে; ইতিপূর্বে বাঙ্গালী মুসলমান নামে-মাত্র মুসলমান ছিল; মনোভাবে ও চিন্তায় সে ছিল বাঙ্গালী হিন্দুরই সহোদর; এবং তাহার ইসলাম ধর্ম আনুষ্ঠানিক দিকে পাকা কেতাব-মোতাবেক হইলেও, ভাবের দিক হইতে সে ছিল সূফী দর্শনের সাধক এবং দার্শনিক হিন্দুধর্মের সহিত সমন্বয়কারী।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বাঙ্গালী হিন্দুর একটা প্রধান অংশের সাংস্কৃতিক চেষ্টা (চৈতন্যদেবের শিক্ষার ফলে) এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল যে, কোন্ উপায়ে বৈষ্ণব মতবাদ অনুসারে সে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে নিজের সত্তাকে শ্রেয়ের অভিমুখী করিতে পারে। বাহিরের জগতের সহিত সংযোগের সুবিধা স্বাধীন তুর্কী ও পাঠান সুলতানদের রাজত্বকালে বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ো বেশি ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া ভারতব্যাপী শান্তিময় মোগল সাম্রাজ্যের প্রসাদে সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাঙ্গালার যোগের পথ খোলা হইয়াছিল ; কিন্তু বাঙ্গালী, কি হিন্দু কি মুসলমান, সে সুযোগ ততটা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্তও যে বাঙ্গালীর মনে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য, বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখিবার চেষ্টা ছিল, তাহা বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা কেদার রায় কর্তৃক গোয়ায় পোর্তুগীজদের দরবারে জাহাজযোগে বাণিজ্যের সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য দূত প্রেরণের কথা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু এইরূপ চেষ্টা বেশি দেখা দেয় নাই। বাঙ্গালী ঘরমুখো-ই রহিয়া গেল ; যে দেশে মাটি আঁচড়াইলেই দুই মুঠার সংস্থান হয়, সে দেশের লোকে বাহিরে যাইতে চাহিবে কী দুঃখে? অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালী একেবারে ঘোরতর গ্রামীণ হইয়া দাঁড়ায় ; সারা ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, সে ব্যাপকভাবে সারা বাঙ্গালার কথাও ভুলিতে আরম্ভ করে, সে তাহার গ্রাম্য জীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে খুশী হইয়াই থাকিত। তখন প্রকৃতিতে ও সংস্কৃতিতে, সভ্যতায় ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিকোণে বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে (মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর এবং আরবী-ফারসীতে পণ্ডিত আলেম শ্রেণী ব্যতীত) পার্থক্য কিছুই প্রায় ছিল না, বাঙ্গালী মুসলমান নামতঃ মুসলমান ছিল, কার্য্যতঃ মনেপ্রাণে সে বাঙ্গালীই রহিয়া গিয়াছিল।

এমন সময়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাহিরের এক অতি প্রবল সভ্যতা ও সংস্কৃতি আসিয়া বাঙ্গালীকে নাড়া দিল। ইংরেজ বাঙ্গালার রাজা হইয়া বসিল ; ইংরেজের বিশ্বগ্রাহী নাগরিক সভ্যতা আসিয়া বাঙ্গালীর গ্রামীণ সভ্যতার দ্বারে হানা দিল। এই সভ্যতার সহিত বোঝাপড়া করিবার ভার বাঙ্গালী হিন্দুর উপরই পড়িল। উনিশের শতকের প্রায় তিন ভাগ লাগিয়া গেল বাঙ্গালীর সংস্কৃতি এবং ইংরেজ কর্তৃক আনীত ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটা মিটমাট করিতে। বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর একটা বড়ো সৌভাগ্যের কথা এই যে, রামমোহন রায়ের মতো মনীষীর উদ্ভব হইল এই বোঝাপড়ার ভার গ্রহণ করিবার জন্য। বাঙ্গালায় গ্রামীণ সংস্কৃতি একা হইলে ইংরেজের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সমক্ষে ইহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। আধুনিক বাঙ্গালা তথা ভারতকে শক্তি দিবার জন্য

সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ সাহিত্যে প্রকাশিত প্রাচীন ভারতের নিখিল-ভারতীয় সংস্কৃতির আবাহন নূতন করিয়া করা হইল। সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ সংস্কৃতি, পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ রিক্থের ন্যায় দুর্দিনে বাঙ্গালা ও ভারতকে রক্ষা করিল নিজ ভারতীয় প্রতিষ্ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে সহায়তা করিল, ইউরোপীয় সভ্যতার বন্যায় বাঙ্গালা ও ভারত বহিয়া গেল না। ইয়ং বেঙ্গলের অবস্থা বাঙ্গালী কাটাইয়া উঠিল ; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেখা দিলেন ; ইঁহারা ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে যাহা শাশ্বত এবং সর্বজনীন, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি আত্মসাৎ করিবার উপদেশ দিলেন ; ইঁহারা নিজ নিজ লেখনী দ্বারা বাঙ্গালার ও ভারতের জনগণকে এইরূপে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিলেন। আধুনিক কালে ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে এই যুগোপযোগী নূতন পন্থা গ্রহণ করিল।

কিন্তু বাঙ্গালার ও ভারতের জনসমূহের মধ্যে একটি প্রধান অংশ এই সমন্বয়ের এবং এই সাংস্কৃতিক মিলনের প্রচেষ্টার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল—সেটি হইতেছে মুসলমান সমাজ। ইংরেজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান জনসাধারণের যে-সকল বিশেষ সুবিধা ছিল, সেগুলির সংকোচ ঘটিল ; ইংরেজ শাসনকে এইজন্য তাহারা মানিয়া লইতে চাহিল না, ইংরেজের ভাষা শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি তাহাদের নিকট পরিত্যক্ত হইল। মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির হ্রাস এবং ইংরেজ রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার মুসলমান সাম্রাজ্যের অস্তমিত বা অস্তায়মান গৌরবকে স্মরণ করিয়া উত্তর ভারতের মুসলমান শাসকদের বংশধরেরা উর্দু কবিতার নবরচিত বাগিচার আশ্রয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভের জন্য চেষ্টিত হইল। ধর্মকে আশ্রয় করিয়া মুসলমানদের মধ্যে আবার সংহতি-শক্তি এবং গৌরবের পুনরুদ্ধারের আকাঙক্ষা জাগিয়া উঠিল, ওয়াহাবী আন্দোলন দেখা দিল, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের রক্তের প্রভাবে মোগল রাজপাট চিরতরে ভাসিয়া গেল। হিন্দুর মধ্যে সহযোগিতা দেখিয়া ইংরেজও তাহার প্রতি বেশি করিয়া অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিল। এইভাবে ইংরেজ রাজশক্তিকে অটুট রাখিবার এক অব্যর্থ কৌশল ইংরেজ ভালো করিয়া আবিষ্কার করিল এবং ইহাকে কার্যকর করিবার জন্য ইহার প্রয়োগে লাগিয়া গেল—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিকে ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বাড়াইয়া তোলা। ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট হিন্দু যখন তাহার দেশের দিকে তাকাইল, তাহার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল এবং ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তখন ইংরেজ মুসলমানের দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভারতের ইতিহাসে ইহার ফলে আধুনিক কালের জটিলতম সমস্যা রূপ গ্রহণ করিল—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

বাঙ্গালীর সমাজে এই সমস্যা যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে যে-সংস্কৃতি—ইহা মুখ্যতঃ হিন্দু-ভাবে অনুপ্রাণিত—হিন্দু বাঙ্গালীর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্থানে এখনই নূতন কিছু আসুক বা না আসুক, তাহার সমূহ সংকোচন বা হানির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমান এখন বাঙ্গালাদেশে হিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় অধিক ; বাঙ্গালী মুসলমান নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এখন অখণ্ড ইস্‌লামী জাতির স্বপ্ন দেখিতেছেন, হিন্দু সংস্কৃতির তল্পীদার বা অনুচর রূপে তাঁহারা মুসলমানকে আর দেখিতে চাহেন না। বাঙ্গালার হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আত্মীয়তাবোধ পোষণ করা তাঁহাদের অনেকে ইস্‌লামের পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেছেন। বাঙ্গালী মুসলমানকে এখন তাঁহারা পুরাপুরি মুসলমান করিতে চাহিতেছেন, তাহার দৃষ্টি বাঙ্গালার গৃহকোণ ছাড়িয়া বাঙ্গালার ও ভারতের বাহিরের দিকে ফিরাইয়া দিবার প্রয়াস তাঁহারা করিতেছেন। নিজের জাতীয়তা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে তাহার আর সন্তোষ নাই—অথচ বাহিরের ইস্‌লামধর্মাবলম্বী জাতিদের ঐতিহ্যকে মনেপ্রাণে আপনার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি থাকিলেও শক্তি নাই এবং তৎসম্বন্ধে মনের গোপন কোণে একটু সন্দেহও আছে। এই কারণে তাহার মানসিক অবস্থা এখন ব্যর্থতার ও অকৃতকারিতার ছায়ায় অন্ধকারময়। কিন্তু তথাপি উৎসাহী দুই-দশজন ইস্‌লাম এবং পাকিস্তানের আদর্শকে বাঙ্গালী মুসলমানের মানসোদ্যানে নূতন ধরণের সংস্কৃতি-লতারূপে রোপণ করিয়া তাহাকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এইরূপে এক নূতন যুগসন্ধি দেখা দিয়াছে। বিংশ শতকের এই প্রথমার্ধে মুখ্যতঃ ইংরেজের রাজনীতির চালের প্রভাবে বাঙ্গালী মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান বানাইবার চেষ্টায় ও আশায়, নূতনভাবে ভারতীয় ইস্‌লামী সংস্কৃতির অর্থাৎ আরব ও পারস্যের ইস্‌লামী সংস্কৃতির উত্তর ভারতীয় বা উর্দু অনুকরণের আবাহন, বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালা ভাষায় দেখা দিয়াছে। এই বস্তুর জীবনীশক্তি কতটা তাহার উপরেই বাঙ্গালার সংস্কৃতিকে এই ভারতীয় ইস্‌লামী বা উর্দু রঙে রাঙানোর চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

এই জিনিস বাঙ্গালী হিন্দুর ভালো লাগিতে পারে না—কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তিকে দরদের সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিৎ। পুরাতন হিন্দু বাঙ্গালী সংস্কৃতি এবং অনাগত বা অপ্রকটিত কিন্তু সাগ্রহে প্রার্থিত মুসলমান বাঙ্গালী সংস্কৃতি—দ্বিতীয়টি কিভাবে দেখা দিবে এবং তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ কিভাবে হইবে, তাহার কথা ভাবিয়া কেহ আতঙ্কিত, কেহ পুলকিত ; কিন্তু তাহার স্বরূপ কেহই জানে না, অনুমানও কেহ করিতে পারিতেছে না। সে জিনিস আসিলে, তাহার সহিত বাঙ্গালী হিন্দু সংস্কৃতির একটা আপস অবশ্যম্ভাবী হইবে ; কারণ, একই দেশের মধ্যে, রক্তে ও ভাষায় ও ইতিহাসে এক, এমন জাতির দুই ধর্মসম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন ও

প্রতিস্পর্ধী রাষ্ট্ররূপে থাকিতে পারে না। এই আপস বা সমন্বয়ের স্বরূপ কী দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার কোনও সার্থকতা নাই ; কারণ উপস্থিত বাতাবরণ এমন-ই সন্দেহবিষ দ্বারা দূষিত যে, নিরপেক্ষ বিচার কঠিন এবং নিরপেক্ষ মত গ্রহণ করা আরও কঠিন। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে যদি বাঙ্গালা ভাষাকেও আমরা হিন্দীর মতো দুইটি ধর্মের ভাষা করিয়া তুলিয়া দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষাতে রূপান্তরিত করিতে না চাই—যেমন একই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকে মুসলমানী-হিন্দী বা উর্দুতে এবং হিন্দু-হিন্দী বা সাধু-হিন্দীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে—তাহা হইলে লিপি এক রাখিয়া যথেষ্ট পরিমাণে Laissez-faire অর্থাৎ 'রুচি অনুসারে চল' এই নীতি পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ মুসলমান লেখক আবশ্যক মনে করিলে আরবী-ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করিবেন, এবং বিশেষ করিয়া ইস্‌লামীয় ধর্ম-ও সংস্কৃতি-বিষয়ক এই প্রকার শব্দ হিন্দুদেরও শিখিয়া লইতে হইবে। কিছু আরবী-ফারসী শব্দ যদি এইভাবে ভাষায় আসিয়া যায়, তাহার জন্য চিন্তিত হইবার বিশেষ কিছু নাই ; শব্দগুলি আসিবে প্রথম দিকে বিকল্পে ব্যবহার্য্য প্রতিশব্দরূপে (প্রচলিত বাঙ্গালা-সংস্কৃত ও প্রাকৃতজ শব্দ হিন্দু ও অন্য লেখকেরা ব্যবহার করিতে থাকিবেন) ; শক্তিশালী মুসলমান লেখক সেইরূপ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া সাহিত্যে সত্যকার রস সৃষ্টি করিতে পারিলে সেই শব্দগুলি সকলেই মানিয়া লইবে।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। জাতি শিক্ষায় যত উন্নত হয়, তাহার মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য তত কমিয়া যায়, ভাষা তত এক হইয়া যায়। বাঙ্গালাদেশে যদি সেই প্রার্থনীয় অবস্থা না আসে, যদি এইভাবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া দুটি বিভিন্ন রচনাশৈলী পাশাপাশি অবস্থান করে, যতদিন না সুবুদ্ধির উদয় হয় ও আমাদের এই খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে বিরোধের দিক্‌কে উপেক্ষা করিয়া সাম্যের ও মিলনের দিকেই সাধনা দ্বারা যতদিন না আমরা এক সংস্কৃতি ও এক রাষ্ট্রীয় আদর্শের অচ্ছেদ্য পাশে মিলাইয়া লইতে পারি, ততদিন এই অবস্থাকে পরাধীনতার আর একটি নিগড় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

তবে আমার মনে হয়, এই অবস্থা চিরকাল ধরিয়া চলিবে না। Blood is thicker than water. যে মনোভাবের ফলে অনাবশ্যক আরবী-ফারসী শব্দের দিকে কোনও-কোনও বাঙ্গালী মুসলমান লেখকের ঝোঁক দেখা যাইতেছে, তাহার কিছুটা পরিবর্তন হইবেই। আধুনিক তুর্কীস্থান ও ঈরানের ভাষাগত সংস্কার পর্য্যালোচনা করিলে এরূপই আশার সঞ্চার হয়। ইস্‌লামী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে বাঙ্গালী হিন্দুও কিঞ্চিৎ পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিল ; রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইঁহাদের কথা স্মরণ করিতে হইবে ; গিরিশচন্দ্র সেনের কোরানের অনুবাদ ও তাপসমালা অর্থাৎ 'তজ্‌কিরাৎ-অল্‌-ঔলিয়া'-র মতো গ্রন্থের ভাবানুবাদের কথা ভুলিলে চলিবে না। আরবী ও ফারসী জগতের সংস্কৃতির হাওয়া যদি বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে

হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর মনে বহাইতে পারা যায়, তাহতে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই লাভবান হইবে।

বঙ্গবাসীদের দিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হয়, আজ বাঙ্গালী জনগণ বড়োই বিপন্ন। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সব দিকেই সে বিষম সংকটে পড়িয়াছে। আদর্শ-বিপর্য্যয় এবং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত অর্থনৈতিক বিভীষিকা (যাহার ফলে এবং রক্তশোষক বণিক এবং অকর্মণ্য ও উচ্চ আদর্শহীন শাসক-সম্প্রদায়ের হৃদয়হীনতা-হেতু দেশের মধ্য দিয়া এক বড়ো মারাত্মক একটা দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেল ও চলিতেছে)—এই দুই প্রধান কারণে বাঙ্গালীর—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর—সমাজের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত ক্রমাগত আসিতেছে, তাহাতে তাহার সংস্কৃতির কথা দূরে থাক, সে নিজে টিকিবে কি না এবং টিকিলে কিভাবে টিকিবে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিতেছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রচারিত স্বর্গরাজ্য যুদ্ধোত্তর জগতে দেখা দিবে কি না এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা দিলে ভারতবর্ষে তাহার অবতরণ হইবে কি না, শক্তিমান্ রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক চালবাজি দেখিয়া সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

দুই হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে উত্তর-ভারত ও বিহার হইতে বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী জনগণের সমভাষিতামূলক এক জাতীয়তার সূত্রপাত হয় ; দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে মুখ্য প্রকাশভূমিরূপে পাইয়া বাঙ্গালীর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহার অব্যাহত গতি চলিয়া আসিয়াছে। বিগত ক্রান্তিকারী মহাযুদ্ধের স্পর্শ বাঙ্গালীর জীবনে ও সংস্কৃতিতে বড়ো একটা ধাক্কা দিলেও তাহাকে ততটা বিপন্ন করিতে পারে নাই। কিন্তু বিগত বৎসরের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ একটা অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ব্যাপার ; ইহার দ্বারা বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীর—মধ্যবিত্ত-কৃষক শিল্পী ও শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহার ফলে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

কিন্তু আমাদের তাহাতে দমিলে চলিবে না। যতদিন ভাষা ও সাহিত্য আছে, ততদিন জাতির বা জনগণের প্রাণ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো কোনও রকমে টিকিয়া থাকিবে। সেই ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা জাতিকে আবার জীয়াইয়া তোলা, তাহার জন্মগত প্রকৃতি, তাহার ইতিহাস, তাহার আভ্যন্তর আত্মা এবং যাহা তাহার প্রকৃত সংস্কৃতি, তাহা বুঝিয়া তদনুসারে পথ দেখাইয়া তাহাকে আবার যাহাতে মানুষের মতো খাড়া করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা ;—ইহা-ই হওয়া উচিত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের প্রধান ও প্রথম এবং পবিত্র কর্তব্য।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

বাঙালীর রুচি

(প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

'রুচি' জিনিসটার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, তবে কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা ইহা চিহ্নিত। একটা জাতির দীর্ঘ সৌন্দর্যচর্চা ও জীবনচর্চার ফলে উহার জনসাধারণের মধ্যে যে একটি সহজ সৌন্দর্যবোধ ও আচরণ-সুষমা উদ্ভুত হয় তাহাকেই রুচি নামে অভিহিত করা হয়। জীবনের ছোট-বড় নানা ক্ষেত্রে এই রুচির পরিচয় পরিস্ফুট। কাব্য-সাহিত্য, চারুশিল্প, স্থাপত্য, ব্যাপক জীবন-নীতি প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারেও যেমন, তেমনি আহার-বিহার, আমোদ-উৎসব, গৃহসজ্জা, হস্তশিল্প, অঙ্গাভরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ছোট-খাটো বিষয়েও জাতীয় রুচির ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যে সুদূর অতীতে বাঙালী সর্বভারতীয় পটভূমিকা হইতে নিজ মানসবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, তখন হইতেই তাহার এই রুচি-স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন প্যাওয়া যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ উহার ভক্তিরসের আতিশয্য ও সৌন্দর্যপ্লাবনের অজস্রতা লইয়া বাঙালীর ভাবাবেগ-সম্পৃক্ত রুচিবোধের প্রথম ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। কালিদাসের আদিরস-সিক্ত সৌন্দর্যবোধের প্রভাব ইহাতে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ইহার দুকূলপ্লাবী স্রোতোবেগ, ইহার বাঁধ-ভাঙ্গা তরঙ্গচাঞ্চল্য বাঙালী মনের নিগূঢ় উৎস-প্রসূত ও তাহার সদ্যোজাত মানসরুচি-নিয়ন্ত্রিত। হরিকথার ভক্তি-সরস আলোচনা ও বিলাসকলা-কৌতূহলের পরিতৃপ্তি—এই দুই বিভিন্ন কুলজাত প্রবণতা বাঙালীর রুচি-দৌত্যে এক অচ্ছেদ্য উদ্বাহ-বন্ধনে মিলিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ভক্তিরসের কতটা চর্চা হইত জানি না, কিন্তু আদি-রসের আবিল জোয়ার যে বহিয়া যাইত তাহা কিংবদন্তীর সাক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শুধু রাজসভায় যাহার জন্ম ও সংস্কৃত ভাষায় যাহার বর্ণনা, তাহা যে নিজ একক প্রভাবে জনসাধারণের চিত্তে রসহিল্লোলের সৃষ্টি করিবে ইহা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। জয়দেব রাজসভা-প্রতিবেশ হইতে হয়তো কিছুটা ভাব-সমর্থন ও কারুকার্যদক্ষতার শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বাঙালীর অন্তর-গভীরে নিমজ্জিত রসধারার সহিত তাঁহার কাব্য-নলকূপের সংযোগ ঘটাইয়াই যে তিনি এই অবিরল মাধুর্যপ্রবাহ উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। বাঙালী শৃঙ্গাররস-

আস্বাদন-উন্মুখ না হইলে জয়দেব কখনও শৃঙ্গাররসকে ভক্তিতে রূপান্তরিত ও মাধুর্য্যে উদ্বর্তিত করিতে পারিতেন না। কবিকল্পনার পিছনে জনরুচিই সক্রিয় থাকিয়া ইহাকে একটা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল।

তেমনি মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালী সমাজ-রুচির আর একটা অপেক্ষাকৃত স্থূল ও বাস্তব দিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহার অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর, বিশেষত অনার্য্য গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে ভক্তিসাধনার ভিতরেও একটা ইতর, অমার্জিত হাস্যরসের সংমিশ্রণ দেখা যায়। জয়দেবের কাব্যের মধুররস-প্রবাহের সবটাই বৈষ্ণব পদাবলীর খাতে বহিয়া গিয়াছে; মঙ্গলকাব্যে কেবল ইহার নীচেকার পঙ্কস্তরই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালী রুচির দিব্য, রমণীয় সৌকুমার্য, আর মঙ্গলকাব্যে ইহার মৃত্তিকাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের অপূর্ণতা-অসঙ্গতি-জাত স্থূল কৌতুকপ্রিয়তা দেখা যায়। বাঙালী এক দিকে ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতিতে তন্ময় হইয়াছে, আর এক দিকে তুচ্ছ সাংসারিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা-নির্যাসও উপভোগ করিতে শিখিয়াছে। সে মধুর রসের বিশুদ্ধ মধু পান করিয়াছে, আবার মধুর তলানি গাদও তাহার রসনায় অরুচিকর ঠেকে নাই। বৈষ্ণব কবিতায় বাস্তবজীবনের ইঙ্গিত অলৌকিক বিভায় ভাস্বর ; নায়কের প্রসাধন ও নায়িকার আভরণ সমাজ-প্রচলিত সৌন্দর্যকলার অনুগত হইলেও, মণিকার-বিপণিতে ইহাদের লেন-দেন চলিলেও, ইহাদের দিব্যায়ন ঘটিয়াছে কবি-কল্পনার আদর্শ শিল্পাগারে। তথাপি এই বর্ণনা হইতেও সমসাময়িক রুচিবোধ ও শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে ইহার বিপরীত দিকটা প্রতিবিম্বিত—সেখানে পারিবারিক জীবনের মর্ত্য কুশ্রীতা, পাড়াপড়শীর ইতর কোন্দল, গৃহস্থ নারীর পতিনিন্দা, সতীনের রেষারেষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের নৌকা-বোঝাই পণ্যদ্রব্যের বস্তু-সঞ্চয় ও উহার ভিতরকার ছল-চাতুরী-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি রুচিবিকারের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত। অবশ্য ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক-আদর্শানুযায়ী প্রাসাদ-নির্মাণ ও বস্ত্র-ও-কাঁচুলি-তৈয়ারির সূক্ষ্ম বয়নশিল্প কিছুটা উন্নততর রুচির চিহ্ন বহন করে। চৈতন্য-জীবনীকারগণ ভক্তিরসের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনা প্রসঙ্গে রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যের সুবিস্তৃত তালিকা সংকলন করিতে কার্পণ্য করেন নাই। এই তালিকা হইতে তৎকালীন বাঙালীর আহার্য-বিষয়ে রুচির উৎকর্ষ অনুমিত হইতে পারে।

(২)

ইতিমধ্যে পারিবারিক ও সমাজ-সংস্থার দৃঢ়ীকরণ ও পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে বাঙালীর জীবনদর্শন ও জীবনযাপন-পদ্ধতি একটা সুশৃঙ্খল

ও সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিল। অবশ্য কিছু কিছু বিদ্রোহাত্মক ব্যতিক্রম—যথা সহজিয়া, তান্ত্রিক, বীরাচারী, আলি-বালি-মুরশিদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়সমূহ—সমাজের বাহিরেই রহিয়া গেল ও সমাজ-ব্যবস্থার মসৃণতার উপর একটা এলোমেলো, আবড়া-খাবড়া ভাঁজ সৃষ্টি করিল। তথাপি বলা যাইতে পারে যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাঙালী জীবনে একটা সমন্বয়ের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমাজের এই ছন্দোময়, মিলন-সঙ্গতিপূর্ণ রূপটিই পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্যক্তিগত বা দলগত উৎকেন্দ্রিকতার আল্‌গা সূতা যথাসম্ভব একটি পরিচ্ছন্ন বিন্যাস-কৌশলে বাঁধা পড়িল। সু-মিত রুচি সুবিন্যস্ত সমাজ সংস্থারই ফল। বাঙালীর ধর্মভাব, ভক্তিপরায়ণতা, শাক্ত, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে সমন্বয়, আচার-নিষ্ঠা, দেবমন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপে পবিত্রভাবপূর্ণ পরিচ্ছন্নতার আদর্শ, ঘর-বাড়ির শ্রী, আহার-বিহারে সাত্ত্বিকতা, প্রসন্ন চিত্তের প্রাণখোলা হাসি ও প্রাকৃত মনের উদ্ভট, অথচ সরল, অশালীন আমোদ, আল্‌পনা-পট-মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে সহজ শিল্পদক্ষতা ও বস্ত্রবয়ন-শিল্পে বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের অসাধারণত্ব—এই সব মিলিয়া বাঙালীর মানসরুচি সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিল। এখনও ধর্মের মৃদু ও সহৃদয় নিয়ন্ত্রণ কুসংস্কারের লৌহবন্ধনে পরিণত হয় নাই ও উহার সহিত স্বাভাবিক চিত্তস্ফূর্তি ও সৌন্দর্যপ্রীতির কোন আপোষহীন বিরোধ জাগে নাই। সামান্য মতবিরোধ উৎকট স্বার্থপরতা-দুষ্ট দলাদলিতে আবিল হইয়া উঠে নাই, যদিও ধনপতি সদাগরের পারিবারিক ব্যাপারে তাহার জ্ঞাতিবৃন্দের হস্তক্ষেপ ও ভাঁড়ু দত্তের কৌলীন্যাভিমানে এই কুখ্যাত পরিণতির অঙ্কুর উন্মেষিত হইয়াছে মনে হয়। চৈতন্যদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিকর-গোষ্ঠীর প্রেমধর্ম-প্রচার ও সমাজসংগঠন-প্রতিভা বাঙালীর মনে এক অপূর্ব পুলকরস ও জীবনে আশাবাদ ও আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করিয়াছে। পদাবলী-কীর্তনের মধুর সুরহিল্লোলে বাঙালার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ ; পদাবলী-রচনার শ্রেষ্ঠ যুগ অবসিত হইয়াছে, কিন্তু উহার পরিবেশন ভক্ত ও সাধক-গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ মণ্ডল অতিক্রম করিয়া সর্বসাধারণের মনের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সব দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাই প্রাক্-আধুনিক বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগেই বাঙালীর রুচিবোধ তাহার সমগ্র জীবনাদর্শের পরিণত ফলরূপে অপূর্ব সুষমায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহার জীবনবৃক্ষের মাঝে-মধ্যে দুই একটা শুষ্ক ডাল ও বিবর্ণ পীতায়মান পত্র দেখা দিলেও, এখন প্রাণরসপূর্ণ সবুজের সমারোহ।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এই পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহে ভাঁটা পড়িতে লাগিল ও রুচিবিকার-চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল। এই যুগে মুসলমানী বিলাস-ব্যসন, আদব-কায়দা ও ইন্দ্রিয়ভোগ-লোলুপতা বাঙালী জীবনে বদ্ধমূল হইল। কাব্যে ভক্তির ক্ষীণ আবরণের মধ্যে কামকলাবিলাস প্রধান হইয়া দেখা দিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ স্রোতহীন

হইয়া কতকগুলি কুৎসিত, সমাজবিরোধী আচরণের বদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়ে পর্যবসিত হইল। শাক্তধর্মে মাতৃপূজার নূতন আবেগ স্ফুরিত হইলেও ইহা ইন্দ্রিয়াসক্ত সমাজের মানস প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেশীদিন জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না। যে রামপ্রসাদ এই মাতৃমন্ত্রের প্রধান উদ্গাতা তিনিই আবার বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ আখ্যানধারার অন্যতম বাহক। যখন কোন বিরাট ভাবধারা বা অধ্যাত্ম-কল্পনা প্রাণহীন ও প্রথাসর্বস্ব হইয়া পড়ে তখনই ইহার আনুষঙ্গিক দেহবাদের স্তরটি রূপকের আবরণ ভেদ করিয়া নিজ স্বভাব-বীভৎসতায় প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্ব ও তান্ত্রিকের পঞ্চ'ম'কার-সাধনা এই ধর্মাদর্শ-শোধিত কাম-গরলের পুনরুপচিত বিষক্রিয়ার নিদর্শন। এ যেন সাপ-খেলানো বেদের সাপের কামড়েই প্রাণ হারাইবার মত ব্যাপার। তা ছাড়া, বাংলা কাব্য ও জীবনে এই প্রথম নাগরিকতার কৃত্রিম-দুষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটিল। কৃষ্ণনগর রাজসভায় কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অনুপম শব্দ-ইন্দ্রজাল, ছন্দ-লালিত্য ও প্রকাশ-পরিপাট্যের সাহায্যে, চটুল হাব-ভাব-ভঙ্গীতে, বঙ্কিম কটাক্ষে, প্রবৃত্তি-উদ্রেককারী ইঙ্গিত-সঙ্কেতের সুষ্ঠু সমাবেশে এই বিলাসকলাচাতুর্যকে সারস্বত মন্দির-বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতচন্দ্র নিজে যে এই দুষ্ট রুচির প্রবর্তক, অথবা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে ইহার আদি প্ররোচক এ কথা ভাবিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচারই করা হয়। সমাজমনে যে সদ্যোধর্মশাসনমুক্ত আদিরসের প্লাবন বহিতেছিল, নবাব-দরবার হইতে উদ্ভূত কলুষিত জীবন নীতির যে আপাত-সুরভি বায়ুপ্রবাহ সমস্ত স্বৈরাচারী, ভোগবাসনাসক্ত ভূস্বামীর রাজসভায় জনচিত্তকে মোহবিবশ করিয়া তুলিতেছিল, ভারতচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সেই সার্বভৌম মানসপ্রবণতারই দুইটি উৎসার-বিন্দু। রাজসভার সম্ভ্রান্ত পরিবেশে প্রতিভাবান কবির কণ্ঠে যে চিত্তবিভ্রমকারী, মোহময় সুর ধ্বনিত হইতেছিল তাহারই নানা বিকৃত রূপ, নানা বীভৎস অতিরঞ্জন, নানা রুচিহীন, শালীনতাহীন অনুকরণ হাটে-মাঠে, দেশব্যাপী গ্রাম্য আসরে প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল। বাঙালীর রুচি-বিপর্যয়ের বোধ হয় ইহাই নিম্নতম পতনসীমা।

(৩)

আমরা এই বার ইংরাজী আমলের প্রারম্ভিক প্রান্তসীমায় পৌঁছিলাম। ইহার প্রথম ফল হইয়াছিল রুচিবিভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত করা। যখন পুরাতন আদর্শ ও সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া কামায়নের বন্যা দেশকে প্লাবিত করিতে চলিয়াছে, তখন সম্পূর্ণ নূতন এক বেগবান স্রোতোধারা উহার সহিত মিশিয়া আমাদের রুচি ও শালীনতাবোধকে যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিবে ইহাই স্বাভাবিক। যখন আমরা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত

কামরসায়ন-সেবনে নেশাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, তখন তাহার উপর উগ্র বিলাতী মদিরা-পান যে আমাদের ভারসাম্য ও সঙ্গতিবোধকে আরও বিচলিত করিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দাম ভোগলালসা প্রাচীন সমাজে রূপকের আশ্রয়ে ও ধর্মসাধনার ছদ্মবেশে নিজ কুণ্ঠিত প্রকাশের উপায় খুঁজিতেছিল, তাহা ইংরেজী শিক্ষার উত্তেজনায়, তথাকথিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দাম্ভিকতায় আরও নগ্ন, বেপরোয়াভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। যে দুর্নীতি আভ্যন্তরীণ শোষণ-ক্রিয়ার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল তাহা বিদেশীয় বাণিজ্যের দেশব্যাপী প্রসারের আনুকূল্যে, ইংরেজ বণিকের রাজশক্তি-সমর্থিত ব্যবসায়ের অবাধ অবসরে আকাশস্পর্শী বিষবৃক্ষের ন্যায় সমস্ত জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করিল। ইংরেজ-বাঙালীর এই বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রথম ফল দেশী মুৎসুদ্দি ও বেনিয়া-দালাল ; খানিকটা সময়ের ব্যবধানে ও কিছু ইংরেজী শিক্ষার হাওয়া গায়ে লাগাইবার পর, ইহার দ্বিতীয় ফল দাঁড়াইল 'বাবু'-সম্প্রদায়। কলিকাতার অনেক অভিজাত পরিবারে প্রথম পুরুষের বাণিজ্য-সহায়ক দালাল দ্বিতীয় পুরুষে সংস্কৃতি-ধ্বংসী আলালের ঘরের দুলালে পরিণত হইল। এই বেনিয়া-বাবুর প্রাসাদের বৈঠকখানায় কবিগান, তর্জা-খেউর, আখড়াই—হাফ্-আখড়াই, বিদ্যাসুন্দর-জাতীয় যাত্রা-গান, পোষা বিড়ালের বিবাহ ও বুলবুলির লড়াই, সুরা-সঙ্গীতের স্রোত, নর্তকীর নূপুর-নিক্কণ ও মদমত্তকণ্ঠোত্থিত চীৎকার-কোলাহলের স্থায়ী আসর প্রতিষ্ঠিত হইল। হয়তো এই আসরে কিছু ভাল জিনিসেরও বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু আগাছার জঙ্গলে এই শুভসূচনার অঙ্কুরটি আবিষ্কার করাও সে যুগে দুঃসাধ্য ছিল। বর্ষার প্রথম জলে অকর্ষিত ক্ষেত্রে জঙ্গলের মত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ সংসর্গের প্রথম স্পর্শে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রুচিবিভ্রম ও অশিষ্টাচার উদ্দাম হইয়া উঠিল। ইহার বিপরীত দিকও একটা ছিল, কিন্তু ইহার প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল ; ঘোলা জল থিতাইতে অন্তত অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী ফিল্টার-ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

রুচিবিভ্রমের স্থূল হস্তাবলেপ যুগের সাহিত্যে ও সমাজ-চিত্রে সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত আছে। কবিগানের বড় বড় কলঙ্ক-চিহ্নগুলি কালের শ্বেতচূর্ণ-প্রক্ষেপে প্রায় বিলীন হইয়াছে। কুরুচিকীটদষ্ট জীর্ণ পাতাগুলি আপনা-আপনি খসিয়া পড়িয়াছে ; তথাপি সমসাময়িক সাক্ষ্য ও জনস্মৃতি হইতে আমরা কলঙ্কচিহ্নের গভীরতা সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করতে পারি। ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার কলেজীয় শিষ্যগোষ্ঠীর রচনা, আলালের ঘরের দুলাল, হুতুম প্যাঁচার নকশা দীনবন্ধুর নাটক প্রভৃতির মধ্যে এই রুচিহীনতার কাল দাগ রেখা টানিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সংস্কার-প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সংস্কার করিতে গিয়াই ইঁহারা কাদা ঘুলাইয়া তুলিয়াছেন ; রুচিহীন আক্রমণের দ্বারা কুরুচিপূর্ণ প্রথাগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন।

অবশ্য এই যুগেই সুরুচির নূতন আদর্শ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নীতিবোধপূর্ণ রচনা ও জনকল্যাণমূলক সমাজ-চেতনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই রুচিবোধ দৃঢ়তর হইল ও রবীন্দ্রনাথে আসিয়া ইহা এক আদর্শলোকের শ্রী ও সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিল। তথাপি মনে হয় যে, এই সমস্ত প্রতিভাবান লেখক সাহিত্য-কৃতির উপর যতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের রুচির উপর ততটা পারেন নাই। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকে পূজা করিয়াছি, কিন্তু উপভোগ করিয়াছি সাময়িক-আবেদনযুক্ত ব্যঙ্গরসিক-গোষ্ঠীকে। পঞ্চানন্দ, অমৃতলাল বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিসারদ, সুরেশ সমাজপতি—ইঁহাদেরই অমার্জিত রসিকতা ও তীক্ষ্ণ আঘাত-নৈপুণ্যই সাধারণ বাঙালীর রুচিনিয়ামক হইয়াছে। আমরা সাধারণ কথাবার্তায় বা বিতর্কমূলক আলোচনায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সমুন্নত, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন আদর্শের অনুসরণ করি না, মাঝারি স্তরের শ্লেষ-রচনার তীব্র ঝাঁঝযুক্ত, রসনারোচক বাগ্‌ভঙ্গী ও মেজাজেরই অনুবর্তী হই। ঋষি ও কবি আমাদের মাথায় থাকেন, কিন্তু পালোয়ান-লাঠিয়াল-জাতীয় লেখকেরাই আমাদের মানস সমর্থনের অর্ঘ্য আদায় করেন। ব্রাহ্মসমাজের নীতিবায়ুগ্রস্ত অতিসতর্ক-শুচি রুচিকে হয় আমরা দূর হইতে নমস্কার জানাই, না হয় বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করি। উত্তানপাদ রাজার দুই মহিষীর মত সুনীতি ও সুরুচির মধ্যে প্রায়ই সপত্নী-সম্পর্কই দেখা যায়—নীতিকে সুয়োরাণী করিলে রুচিকে দুয়োরাণীর পর্য্যায়ে থাকিতে হয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমাদের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত ও আদর্শ-স্বপ্নকে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি যতটা অন্তরঙ্গ অনুরাগ থাকিলে উহাকে আমার জীবন ও রুচির নিয়ামকত্বের মর্যাদা দিতে পারি, ঠিক ততটা অনুরাগ বোধ হয় আমাদের নাই। তাই হয়তো সাহিত্যে এককে কেন্দ্র করিয়া একটা গোষ্ঠী-গড়িয়া উঠে, প্রতিভার এক দীপ হইতে অন্য সমধর্মী দীপে আলোক সংক্রামিত হয়, কিন্তু সংযোগসূত্রহীন সাধারণ মানুষের মনে, দীপহীন প্রত্যন্ত-প্রদেশের অন্ধকারে কোন আলোকরশ্মির বিকিরণ অনুভূত হয় না।

দুই বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে আমাদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহাতে যে সুস্থ ও সামগ্রিক জীবনবোধ রুচির স্থির প্রতিষ্ঠাভূমি তাহাতেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এখন বিরাট সমস্যার সম্মুখীন মানবজীবনে রুচির প্রশ্ন খুব গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে হিংস্র প্রতিযোগিতা ও নির্মম আত্মপ্রতিষ্ঠা জীবনসংগ্রামে টিকিবার একমাত্র উপায়, যেখানে নীতিবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠাও অনাবশ্যক বোঝারূপে জীবনের অগ্রগতিকে ভারাক্রান্ত করে বলিয়া মনে হয়, সেই পরিস্থিতিতে রুচি জীবনযাত্রার উপরকার পালিশ ছাড়া আর কোন গভীরতর তাৎপর্য-দ্যোতক মর্যাদা পায় না। এখন সাহিত্য জীবনে কোন নূতন আদর্শের সন্ধান দেয় না, বাস্তব জীবনের বিভ্রান্তি, নৈরাশ্যবোধ ও করুণ অসহায়ত্ব প্রতিফলিত করে মাত্র। এই সাহিত্য

হইতে কোন অভিনব ছন্দবোধ-প্রসূত রুচি-সুষমা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। এই যুগে যে কয়টি নূতন ভাবাদর্শ আমাদের মনকে ঈষৎ আবেগাতুর করিয়া তুলিতেছে—যথা বিশ্বমানবতাবাদ, শান্তির জন্য আকূতি, বিড়ম্বনাময় জীবনের জন্য ক্ষুব্ধ অনুযোগ ও সুন্দরতর জীবনের জন্য এক প্রকারের ধোঁয়া ধোঁয়া স্বপ্নাকুলতা—তাহারা কল্পনাবিহার হইতে মর্ত্যজীবনের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে অবতরণ করে নাই। তাহারা আমাদের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে নাই, কাজেই তাহারা আপাতত কোন নূতন রুচিবোধের ভিত্তিভূমি রচনা করিতেও অসমর্থ। চন্দ্রলোকে রকেট পৌঁছিয়াছে, রক্তপতাকাও প্রোথিত হইয়াছে, কিন্তু নিবিড় মায়া-মমতা-ঘেরা গৃহ-নীড় এখনও রচিত হয় নাই।

(৪)

সুতরাং রুচি এখন বহিরঙ্গমূলক পারিপাট্যবোধের নিদর্শন, অন্তরের নির্মল শুচিস্নিগ্ধতার নহে। সাহিত্যে শব্দঘটিত অশ্লীলতা নাই সত্য, কিন্তু নারীরূপের মোহ ও যৌনচেতনা প্রায় সর্বত্র সঞ্চারী। ইহার উপর একটা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার আবরণ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ ও আবেগহীন দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা নারী-পুরুষের স্বৈরাচারী প্রবৃত্তিচরিতার্থতা ও দাম্পত্যবন্ধনচ্ছেদী প্রেমবিলাসের যুক্তি ও হৃদয় দিয়া সমর্থনই বেশী প্রকট হইয়াছে। আজকাল যে ছায়াচিত্রে আমাদের জীবনের স্বপ্নস্বর্গ প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাতেই আমাদের সৌষ্ঠবের রুচি—দাবির শূন্যগর্ভতা প্রমাণিত। সমাজ-জীবনে বাহ্য সৌজন্য ও শিষ্টাচার যেটুকু দেখা যায়, তাহার মধ্যে আন্তরিকতার পরিমাণ খুব বেশী নহে। পরিবার-জীবনের ভাঙ্গনের মধ্যে, যৌথ সংসারের বিলোপের মধ্যে, আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ পরিধিতে রুচি বাহির ছাড়িয়া অন্তরে প্রসারিত হইবার সুযোগ পায় না। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা আর যাহা শিক্ষা দিই, মার্জিত রুচি তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। এমন কি আমাদের পবিত্রতম অনুষ্ঠান পূজা উপলক্ষ্যেও আমরা প্রতিমার সাজ-সজ্জা ও পূজামণ্ডপের মণ্ডনবিধান ছাড়া আর কোন উন্নততর রুচিআদর্শের পরিচয় দিতে পারি না। কোন সাংস্কৃতিক উৎসবের সুন্দর, সু-মিত ও উপলক্ষ্যের সহিত প্রাণ-সংযোগময় আয়োজন ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। আমাদের বেশ-ভূষা, ঘর-সাজানো, গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনাতে অবশ্য সৌন্দর্যনিষ্ঠার পরিচয় মিলে, কিন্তু এগুলি অনেকটা বিদেশী রীতির অনুকরণ, আমাদের ব্যক্তিগত মৌলিক সৌন্দর্যবোধ হইতে ইহাদের উদ্ভব হয় নাই।

নন্দনতত্ত্ব-সম্মত, চারুকলার মর্মগ্রাহী যে রুচি ও রসবোধ সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষবিধানের প্রধান সহায় তাহা এক সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞ-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ,

শিক্ষিত সমাজে তাহার ব্যাপক প্রসারও দুর্নিরীক্ষ্য। কাব্য-সাহিত্যে সংযত আবেগ ও অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস, মণ্ডলকলার পরিমিতি ও মাত্রাধিক্য, সূক্ষ্ম অন্তঃসঙ্গতি ও কৃত্রিমভাবে আরোপিত সৌন্দর্যবিন্যাস এবং চিত্রকলায় গাঢ় বর্ণপ্রলেপ ও রং ও রেখার সুমিত প্রয়োগে অন্তরাত্মার প্রকাশ, চোখভুলানো চমক ও মনের গভীরে আবেদনবাহী সরলতা—ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আমাদের অসম্পূর্ণ-অনুশীলিত রুচি-সংস্কারের নিকট সহজে ধরা পড়ে না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ও কলাসৃষ্টির সঙ্গে যে সুগভীর, অন্তরঙ্গ পরিচয় রুচির বিশুদ্ধি-সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের শানে বারে বারে ঘষিয়া না লইলে নির্বিচার ব্যবহারে ভোঁতা-হইয়া-পড়া রুচি ধারাল ও উজ্জ্বল হয় না। সঙ্গীতবোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব সত্ত্বেও আমাদের অনুভব যথেষ্ট সংবেদনশীল হয় নাই—যে কোন সস্তা সুরে গাওয়া আধুনিক সঙ্গীতকে গলাধঃকরণ করিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। সুরের অভিজাত কৌলীন্য ও তরল, অলঙ্কার-বাহুল্যে বর্বর, মর্যাদাহীন সুর—ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টিই সমধিক জনপ্রিয় ও আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকতর দাক্ষিণ্যে অভিনন্দিত। শ্রেষ্ঠ-মাঝারি, ভাল-মন্দর মধ্যে পার্থক্য যে পর্যন্ত আমাদের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিভাত না হইতেছে, সে পর্যন্ত আমরা রুচিবিষয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারি না।

মোট কথা, আমরা এখন এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আধ্যাত্মিকতা ও ঐহিকতা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এই উভয়বিধ আদর্শের বিপরীত আকর্ষণে আমাদের জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ অস্থিরভাবে আন্দোলিত হইতেছে। ছন্নছাড়া, উৎকেন্দ্রিক, ক্ষণিকআবেগতাড়িত জীবনে রুচিও দাঁড়াইয়াছে মুহূর্তের উত্তেজনার পেয়ালায় চুমুক দেওয়া, হঠাৎ-আঁকড়াইয়া-ধরা রঙ্গীন আবেশের স্বপ্নাতুরতা, সব-ভুলাইয়া-দেওয়া বিচিত্র অনুভূতির লোলুপ রস-আস্বাদন। আমরা অতীতের অনেক কুসংস্কার ও রুচি-বৈকল্য বর্জন করিয়াছি, কিন্তু অখণ্ড জীবনবোধ হইতে উদ্ভূত কোন নূতন রুচিসংশ্লেষ বা প্রতীতি-সংস্কার গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। এই নৈরাজ্যের যুগের যে শীঘ্র অবসান হইবে এমন সম্ভাবনাও সুদূর মনে হয়। কেননা আমরা আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার ও অনুশীলন করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহি। সব জাতীয় নদী আন্তর্জাতিকতার মহাসমুদ্রে মিশিবে বলিয়া আমরা পূর্ব হইতেই মন স্থির করিয়াছি। সুতরাং সেই মহাসমুদ্রের বর্ণচিহ্নহীন মোহনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রুচি-নির্ণয়ের দায়িত্ব সেই অনিশ্চিত-ভবিষ্যতের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছি। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী—সব লাল হো যাগা—আমাদের জীবনে পূর্ণ হইলে তাহাতে আমাদের ও সমগ্র মানবজাতির সত্য সত্যই কল্যাণ হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশে—বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র পাঠানো হয় বছরে বছরে। এরা বিদেশে যায় মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার বিবিধ শাখায় জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু প্রায়ই এটা লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষানবিসদের সেই প্রাথমিক শিক্ষার অভাব রয়েছে যা থাকলে পরে তাদের পক্ষে সম্ভব হত আধুনিক কর্মপদ্ধতি দ্রুত আয়ত্ত করা। সম্প্রতি আমেরিকা প্রত্যাগত একজন বিশিষ্ট ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ জানিয়েছেন যে, আধুনিক ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি চালাতে বললে আমাদের ছেলেরা অনেক সময় খুবই ত্রস্ত বোধ করে প্রস্তুতির অভাবে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বিশ্লেষণে বিপুল অনুপাতে ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে প্রতিটি পরীক্ষায়। কি বিপুল অপচয় আমাদের জাতীয় প্রয়াসের। অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, এই সব ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য আসলে আমরা ছাত্র-সমাজের যে উপাদান নিয়ে কাজ করি তার উৎকর্ষের নিজস্ব অভাবই দায়ী নয়। বরঞ্চ যথাযথ পরিচালনা ও সুযোগ লাভ করলে ভারতীয় ছাত্র সত্যই কৃতিত্ব অর্জন করে এবং সব দিকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা দেখায়। আমার বোধ হয় সময় ও প্রয়াসের এই অপচয় এড়ানো সম্ভব, একমাত্র যদি আমরা আমাদের শিক্ষণ-পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে তা অপসারণের কাজে দৃঢ়ভাবে ব্রতী হই। কিছুদিন আগে এই প্রস্তাব আমি এনেছিলাম যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরেই শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষা ব্যবহারের সময় এসে গেছে। শত শত ছাত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে এমন একজন শিক্ষক হিসাবে আমার স্থির অভিমত এই যে, যথেষ্ট সময় বাঁচানো ও ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি গাঁথা সম্ভব, যদি প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও ছাত্রেরা সহযোগিতা করেন, তাঁদের সমস্যার খোলাখুলি আলোচনা ও তার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিদেশী ভাষা এসে দাঁড়ালে মস্ত অসুবিধা দেখা দেবেই। কথাবার্তা ও শিক্ষার বাহন হিসাবে সর্বদাই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করতে হলে অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অনেক সময়েই ঠিকমত মনের কথা বলতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না যে,

ছাত্রকে যা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সে তার সবটাই বুঝতে পেরেছে কি-না। বর্তমান পদ্ধতি যে মুখস্থ করতে প্ররোচনা যোগায়, এতে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায় না—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ করা সত্ত্বেও আমার এই মত দেশের সর্বত্র বাদানুবাদের উদ্রেক করেছে এবং অনেকেই আছেন যাঁরা মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজীকে বাদ দেওয়া দেশের প্রকৃত স্বার্থের অনুকূল নয়। একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহলে তার ফলে 'বিদ্যায়তনিক চলাচল' (academic mobility) ব্যাহত হবে এবং তার দরুণ উগ্র প্রাদেশিকতার একমাত্র প্রতিষেধক চিন্তা ও আদর্শের অবাধ লেনদেনও বাধাপ্রাপ্ত হবে। অনেকেই এখন সাহসে ভর করে বলছেন যে, আমাদের দাসত্বশৃঙ্খল স্খলিত হলেও তা ইংরেজী ভাষার স্বর্ণসূত্রটিকে পিছনে রেখে গেছে, যা নাকি আমাদের সংহতির স্বপক্ষেই কাজ করেছে ও সহায়তা করেছে আমাদের আত্মার পুনরাবিষ্কারে। এই সব লোক এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় আদর্শেই বিশ্বাসী। তাঁদের মতে সম-সাময়িকতার বাস্তব চাহিদাকে অযথা বিরাট করে দেখা ঠিক নয় এবং তার চাপে আমরা যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও আমাদের পাঠ্যবিষয়াদি পরিবর্তন করতে বাধ্য না হই। তাঁরা মনে করেন যে আমাদের উচিত, শাশ্বত সত্যকে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে দর্শনের অধিকারী ছিলেন—তাকেই শ্রেয়জ্ঞান করে চলা। আমাদের সব ছাত্রদের পক্ষেই জ্ঞানার্জনের সাধারণ পৃষ্টপট রচনার প্রধান উপাদান হিসাবে তাঁরা নির্ভর করে চলেছেন ক্লাসিকস্ চর্চা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, হিউম্যানিটিজ, ভাষা ও আইন শিক্ষার উপরেই। বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব নির্দিষ্ট সীমার চাইতে বেশী মনে করা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের উপযোগিতা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীকে তাঁরা দেখেন সন্দেহের চোখে। তাঁরা বিশ্বাস করেন পুরানো আদর্শের স্থান নিতে পারে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এমন কিছুই নেই। কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী কার্যকর হাতিয়ার তৈরীর ব্যাপারে হয়ত তাঁরা কাজে লাগেন তবুও তাঁরা মনে করেন যে, ওই রাষ্ট্রে সংস্কৃতি ও উদ্দেশ্যমুখীন জীবন সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব প্রাচীন দর্শনের ভিত্তিতেই—অনেকেরই মতে সে দর্শন হল প্রধানতঃ অহিংসা।

গণতান্ত্রিক দেশে ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত পোষণের এবং নিজস্ব ভঙ্গীতে তার পাঠ ও ব্যাখ্যার স্বাধীনতা থাকে। অতএব ভারতীয় সভ্যতার অবনতির কারণ সম্বন্ধে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে।

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে যে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত—যা ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির

মেরুদণ্ডস্বরূপ—তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু-দিনের পান্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর এই উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে। এ ধরণের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষের আমরা যতই তারিফ করি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, এ জগৎ দু-দিনের পান্থশালা, ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে।

বহু শতাব্দীর শিক্ষা থেকে আধুনিক কালের ভারতীয়কে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেওয়ার পাঠ গ্রহণ করা উচিত। হয়ত জীবনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখাই ভালো। ব্যক্তিগত সুখদুঃখকেই দর্শনের প্রধান বিষয় করা ঠিক নয়। বরং সাধারণ ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত দেশবিদেশের মানুষকে মনে করা যেতে পারে যেন এক 'রিলে দৌড়ের' প্রতিযোগী, যেখানে ব্যক্তিগত দৌড়বাজের ভাগ্যের চাইতে দেশের উন্নতি, জাতীয় পতাকার অগ্রগতি ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষপরম্পরা ধরে যদিও মানুষ পরিশ্রম করে যায় আর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য, রোগ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে করতেই তার জীবনাবসান হয়, তবু এই সব প্রয়াস দেশের ও জগতের কতটা কল্যাণ করতে পেরেছে এইটেই হচ্ছে আসল কথা। বলা যেতে পারে যে, এই ভিন্ন ধরণের দৃষ্টিটিও ভারতীয়, যদিও এতে হয়ত ব্যক্তির আত্মাকে পরমার্থ জ্ঞান করতে অস্বীকার করা হয় এবং প্রচারিত হয় কর্মের সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথাই। বস্তুবাদী দার্শনিক এও বলতে পারেন যে, এই পারলৌকিকতা আসলে জড়ত্ব, স্বার্থপরতা ও লোভেরই প্রকৃষ্ট জন্মভূমি। মানুষের উদ্বেগ যখন তার নিজস্ব মোক্ষলাভের জন্যেই তখন সে লোকালয় ছেড়ে আশ্রয় খোঁজে গুহা কন্দরে। এরই মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পায়, আর যারা পিছনে পড়ে থেকে সংসারের অশুভ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সমাজ ও দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করে তাদের ছেড়ে দেয় শয়তানের কবলে।

আমাদের এই দর্শনের আধিপত্য যখন কায়েম ছিল তখন আমাদের প্রথম সারির চিন্তাবিদেরা জীবনের গুরুত্ব স্বীকার করতে অবহেলা করতেন। এরই দরুণ দ্বিতীয় সারির সেই সব ক্ষুদে মানুষেরাই প্রাধান্য পায়—যারা মৌখিক আনুগত্য জানাত দর্শনের প্রতি, অথচ কার্যত মাতামাতি করত—হিংসা, ঝগড়াঝাঁটি ও আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদ নিয়েই। ফলে এল বিদেশী হানাদারের দল—অনেক ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত হয়েই এল—আর ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করল শতাব্দীর পর শতাব্দী জোড়া দাসত্ব। তবু আমাদের যে ঘুম ভাঙ্গছে এটা একটা সুলক্ষণ। সমাধান ভিন্ন ধরণের হওয়া

সম্ভব, সম্ভব পারলৌকিকতার সঙ্গে পার্থিব দায়িত্ব পালনের সুসংগতি। আমাদের দেশে সম্প্রতি মহান স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। তিনি মোক্ষেরও উপরে স্থান দিয়েছিলেন দুর্গত মানবের সেবাকে।

সম্প্রতি আমার সুযোগ ঘটেছিল জাপান যাত্রার। সেখানেও প্রায় ভারতবর্ষের কাছাকাছি সময়েই পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। জাপান এখন একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত, তার অগ্রগতি সারা পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার বস্তু। আমি তাই সাগ্রহে এ সুযোগ গ্রহণ করি এবং টৌকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান-বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগ দিতে যাই।

সেখানে গণিতবিদ, পদার্থবিদ, জীববিদ ও দার্শনিক এবং বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। এঁদের অধিকাংশই জাপানী, কিছু ছিলেন বিদেশী, যেমন আমেরিকার এক দার্শনিক ও যুগোস্লাভিয়ার এক গণিতবিদ। আমি ভেবেছিলাম এ ধরণের আলোচনা সভায় আমরা কোন বিদেশী ভাষারই শরণাপন্ন হব। কিন্তু পৌঁছানোর পর আমাকে বলা হল যে, অধিকাংশ জাপানী বিজ্ঞানীরা ইংরেজী, হয়ত বা তার উপরেও আরও কয়েকটা ভাষা বুঝতে পারলেও, (অনেক সময়েই তাঁদের সব ভাষার বই পড়তে হয়) সারা দেশ জুড়ে শিক্ষা চলে জাপানী ভাষার ভিত্তিতে এবং আমাকে তৈরী থাকতে হবে আলোচনা সভায় প্রধানত জাপানী শোনার জন্যই। আমি অবশ্য একজন দোভাষীর সাহায্য পাব, যাঁর কাজ হবে আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা যা বলবেন তার ভাষান্তর করে দেওয়া এবং আমার পালা যখন আসবে, তখন জাপানী ভাষায় আমার বক্তব্য সহযোগী সদস্যদের কাছে উপস্থিত করা। স্পষ্টতই এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ এবং আমি অবাক হলাম দেখে যে আধুনিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে এক বিশেষ জটিল ও বিমূর্ত আলোচনা অনায়াসেই চালানো হল জাপানী ভাষায়, আর আমরা বিদেশীরা যখন বললাম তখন তাঁরা বেশ ভালোভাবেই আমাদের চিন্তাসূত্রটি ধরতে পারলেন ও আমাদের নিবন্ধ সম্পর্কে তাঁদের অনুমোদন বা প্রতিবাদজ্ঞাপক সমালোচনা উপস্থিত করলেন বেশ ধারালোভাবেই।

জাপানে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গেও দেখা হল। গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেখানে পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম দিকগুলিও পড়ানো হচ্ছে জাপানী ভাষায় আর তারই পাশাপাশি জাপানী ছাত্রেরা চালাচ্ছেন বহু দুঃসাহসী ও অভিনব গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকেরা নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা করেন মাতৃভাষায়।

নিশ্চয়ই তাঁরা বহু ধার-করা শব্দ (loan words) ব্যবহার করেন কিন্তু তার জন্য তাঁরা মোটেই কুণ্ঠিত নন। খবর পেলাম যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কে দু-জন ভারতীয় বিজ্ঞানীর ইংরেজীতে লেখা একটি বইয়ের জাপানী তর্জমা

হয়েছে। আমায় জানানো হল ওই বইটি বেশ ভালোই বিক্রী হয়েছে ছয় মাসে, প্রায় তিন হাজারের মত। শুধু জাপানী ভাষাই পড়তে পারেন এমন সাধারণ জাপানীরা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল জানবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং হয়ত তাঁরা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভারতীয় মতামতকেই বেশী বিশ্বাস করেন অন্যদের চাইতে। তবু আমাদের দেশে ওই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতেই লিখে চলেছেন ও তার ফলে তাঁদের দেশবাসীর শতকরা ৮০ ভাগকেই অজ্ঞ রেখেছেন পারমাণবিক ভস্মপাতের বিপদ সম্পর্কে।

অনেক সময়ে বলা হয় যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব বাধা সৃষ্টি করতে পারে বিজ্ঞানচর্চার। আমি বিশুদ্ধবাদী নই ; তাই ইংরেজী টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের ছেলেরা যদি ওই শব্দ সহজেই বোঝে তবে ধার-করা শব্দ হিসাবেই তা টিকে থাকবে ও সমৃদ্ধ করবে আমাদের জাতীয় শব্দভাণ্ডার। গোড়ায় বিদেশী উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এমন বহু শব্দ এখন সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই চালু রয়েছে এবং সেগুলি সহজেই বোধগম্য আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও। আশা করি বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শব্দ এমনিভাবে কাজে লাগানো হবে এবং আমাদের দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাদের রূপান্তর ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

অনেক সময়েই বৈজ্ঞানিক শব্দের তর্জমা পণ্ডশ্রমমাত্র হয়ে দাঁড়াবে—রেলওয়ে, রেস্তোরাঁ, কিলোগ্রাম, সেন্টিমিটার, হুইল, লেদ, থার্মোমিটার, বয়লার, কাটার, ইলেকট্রন, অ্যাটম, ব্যাক্‌টেরিয়া, ফাঙ্গাস, ডিফারেনসিয়াল কোইফিসিয়াণ্ট, ইন্টিগ্রেশন,—এ প্রায় সকলেই বোঝেন। পেপার, চেয়ার, টেবিল তো এখন প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিষ। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর দরকার নেই। আশা করি শিক্ষক এবং ছাত্ররা কোন বিষয় আলোচনার সময় এ ব্যাপারে অনায়াসেই একটা বোঝাপড়া করে নেবেন আর শিক্ষকের দায়িত্ব হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের কাজে ভাষা প্রয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হালের অবস্থান্তর সম্পর্কে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে অনেক সময়ে বিজ্ঞানীকে বাধ্য হয়ে বিতর্কে নামতে হয়—লড়াই চালাতে হয় শব্দের হাতিয়ারযোগে। কিন্তু তিনি খুশী হন যখন তাঁর পক্ষে এমন যথাযথ পরীক্ষা চালনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যার ফলাফল তাঁর অভিমতের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারে।

আমাদের দেশে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার পরীক্ষা খুবই বাঞ্ছনীয় যার বিশেষ ঝোঁক থাকবে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের উপরে এবং যেটি চালানো হবে কোন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে।

আমার বিশেষ আশা যে, একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সভাপতিত্বে মঞ্জুরী কমিশন এই প্রস্তাবটির প্রতি সদয় হবেন ও একে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন।

আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশমর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক।

আমি আশা করি, আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি দীর্ঘকালস্থায়ী এমন যজ্ঞক্ষেত্র হবে যেখানে শিক্ষক ঋষিরা এবং ছাত্র ঋত্বিকগণ মিলিত হয়ে প্রচার করবেন, সবার উপরে মানুষ সত্য এবং তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন আমাদের কবিগুরুর অন্তরের প্রার্থনা :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

... ...

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

মার্ক্‌স্‌বাদ ও মনুষ্যধর্ম

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মার্ক্‌স্‌বাদের বিপক্ষে একটা বড় ও সাধারণ আপত্তি এই যে, তাতে ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। অনেকেই এই আপত্তির জবাব দিয়েছেন। জবাবের মধ্যে দু'টি কথা সকলেই অবশ্য মানতে বাধ্য : (১) ধনতন্ত্রের দাপটে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ব্যক্তিত্ব খুইয়েছে, অতএব ধনতন্ত্র না গেলে ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের অবকাশই মিলবে না ; এবং (২) এই সমাজে মাত্র যে জনকয়েকের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের সুবিধা ঘটেছে, তাদের জীবনেও সেই সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। প্রমাণস্বরূপ প্রত্যেক শ্রমিক ও 'ব্যাবিট্'-শ্রেণীর অপরিণত জীবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া, অন্য স্তরের লোকেরাও প্রাণ ধারণে এত ব্যস্ত, আর্থিক শোষণে এতই ক্লান্ত যে ব্যক্তিত্ব তাদের পক্ষে গল্প মাত্র, ফুটিয়ে তোলা তো দূরের কথা। শিক্ষক-সম্প্রদায়, আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীরই আজ এই দশা। তবু এই ধরণের উত্তর নঙর্থক, কারণ ধনতন্ত্রে মানুষ ছোট হচ্ছে মানলেই মার্ক্‌স্‌-পছন্দ সমাজে মনুষ্যত্ব ফুটবেই ফুটবে বলা যায় না। এইখানেই রাশিয়ার ঝগড়া ওঠে। কেউ বলছেন সেখানে মানুষ যাঁতা কলে পিষে মরছে, আবার কেউ বলছেন সেখানে মানুষ সব অতিমানুষ হয়ে উঠেছে। ওদেশে যখন যাইনি তখন মাত্র এইটুকু মানবো যে সেখানকার মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরাও আত্মবিশ্বাসী। দু'টোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, তবে মনে হয় যে তার ইঙ্গিত পূর্বোক্ত মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর স্বপক্ষে জাবাবদিহির মধ্যে নেই।

অন্য উত্তর চাই। ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখলে মন্দ হয় না। মানুষের সভ্যতায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে বহুবার তার সঙ্গে প্রকৃতির ও সমষ্টির বিবাদ বেধেছে। আদিম তথাকথিত অসভ্য জাতির মধ্যে সর্বদা দেখি বিশ্বতত্ত্ব বা cosmology-র পাশে একটা নৃতত্ত্ব বা anthropology রয়েছে। দৃশ্য ও অদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির সঙ্গে আদিম মানুষ প্রশ্ন করছে তার নিজের উৎপত্তি কি ও কোথায়? প্রথমে দেখি ভুতুড়ে ব্যাখ্যা আসছে, পরে মাইথলজি (mythology) সৃষ্টি হচ্ছে। তাই থেকে ধর্ম উঠল ; এবং ধর্ম পুরাণকে নষ্ট না করে তাকে পুষতে লাগল। ফলে যেটা ছিল মাত্র জানবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এখন সেটা হল 'মানুষ কী'—সেই জ্ঞানেরই কর্তব্যবোধ। এই মন ঘুরে যাবার পর থেকেই মানুষ সমগ্র প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন ঐক্য, অর্থাৎ সমষ্টি

থেকে বিচ্যুত হল। এতদিন প্রকৃতি ছিল নৈর্ব্যক্তিক সমগ্র ও সুনিশ্চিত, মানুষের পৃথক সত্তাই ছিল না ; কিন্তু আত্মজ্ঞানের তাগিদে বহির্জগতের সূত্র গেল ছিঁড়ে, আর বেড়ে চলল প্রশ্ন আর সন্দেহ। বর্তমান সভ্যতার কত গোড়ায় এই আত্মজ্ঞান ও সন্দেহ শুরু হয়েছে দেখলে আশ্চর্য লাগে। এই থেকেই 'মনুষ্যধর্মের' আরম্ভ। দর্শনের ইতিহাসে দেখি—"Scepticism has very often been simply the counterpart of a *resolute humanism.* By the denial and destruction of the objective certainty of the external world the sceptic hopes to throw all the thoughts of man upon his own being."—(Cassirer—*What is Man?)* এই scepticism—সন্দেহবাদের সঙ্গে মার্ক্‌সীয় তত্ত্ববিচারের সম্বন্ধ আছে, যদিও মার্ক্‌স্‌বাদের অন্যান্য প্রত্যয়ে সেটা ঢাকা পড়ে। সন্দেহবাদ ও আত্মজ্ঞানের পর্ব অনেকদিন চলে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জুডা, ইস্‌লাম ধর্ম সে-পর্বের এক একটি অধ্যায়। লাভ হয়েছিল এই যে, মানুষ যে বিশ্বের কেন্দ্র একথা সে ভুলতে পারেনি। কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল বিস্তর ; নিজের উপর অতটা আস্থা থাকার দরুণ বাইরের অস্তিত্বটাই লোপ পেতে বসেছিল। অর্থাৎ, প্রকৃতি-সমষ্টি পরিণত হয়ে গেল ব্যক্তি-বিন্দুতে। প্রতিক্রিয়া এল কোপার্নিকান ও কার্টেসিয়ান চিন্তা-পদ্ধতিতে। অনন্ত বিশ্বের প্রেক্ষিতে মানুষ আবার পেল ভয়। মানুষ গেল কুঁকড়ে, ছোট হয়ে। রিনেসাঁ যুগের এই দিকটা ঐতিহাসিকরা বড় বেশী দেখাননি, তাঁরা হ্যামলেটের মানব-অর্চনা উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত। মনটেন লিখছেন : "Can anything be imagined so ridiculous, that this miserable and wretched creature, who is not so much as master of himself, but subject to the injuries of all things, should call himself master and emperor of the world, of which he has not power to know the least part, much less to command the whole ?" (এটা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ; তখন ভারতবর্ষে সাধুসন্তের কৃপায় মানবধর্মের জোয়ার বইছে। আমাদের চিন্তা ও কর্মে কোপার্নিকান কিংবা কার্টেসিয়ান সিস্‌টেমের মতন অবিশেষ প্রকৃতি-ধর্মের প্রচার হয়নি। তার ফল বিচারের স্থান অন্যত্র।)

এইবার প্রশ্ন উঠল—প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মানুষ কি করে মুক্ত হবে ; যদি মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মাবলী থেকে মানুষের নিয়মাবলী, অর্থাৎ সমাজ, ইতিহাস, রাষ্ট্রের, পরিশীলন, আচার-ব্যবহারের নিয়মকানুন কি ভাবে ও কতটা বিভিন্ন ? কোপার্নিকাস, ডেকার্ট-এর চিন্তাধারায় মানুষ গণিতশাস্ত্রে শাসিত, কারণ প্রকৃতির মর্ম সংখ্যার হাতে। কিন্তু এই গণিতশাস্ত্রই মানুষকে তার পূর্বতন স্থানে ফিরিয়ে আনলে। অসীম বা infinite-এর বিচারে দেখা গেল যে মানুষ তার বিদ্যাবুদ্ধির জোরে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং সে প্রকৃতির প্রতিবেশ এই পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রহনক্ষত্র আকাশ প্রসারী। অতএব, অঙ্গশাস্ত্র ও তার

অধীনস্থ সর্বপ্রকার বিদ্যার সাহায্যে মানুষ আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সুযোগ পেল। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চলেছিল মানব-সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাকে অঙ্কশাস্ত্রে পরিণত করতে—বাক্‌ল, ফেক্‌নার থেকে সলভে, এজ্‌ওয়ার্থ-এর দৃষ্টান্ত সকলেরই মনে পড়বে।

কিন্তু গণিতবিদ্যার সাধারণত্ব ও অবরোহী-পদ্ধতির বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াল জীববিদ্যা—biology। ডারুইনের কৃপায় আরোহী যুক্তি-পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ প্রসারিত হল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে থেকেই রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। জীবতত্ত্বের প্রচারে মানুষ প্রথমেই অবশ্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি ; বরঞ্চ মানুষ আরো পরাধীন হয়ে পড়েছিল, যেমন কোঁৎ, হার্বট স্পেন্‌সার, শাফ্‌ল প্রভৃতির সমাজতত্ত্বে। টেন এক জায়গায় লিখছেন, ফরাসী বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের ইতিহাস তিনি লিখবেন 'metamorphosis of an insect' হিসেবে। তবুও ফল বিপরীত হল দু' দিক থেকে : (১) জীবতত্ত্বের বিচারে একটা জীবনস্রোতের সন্ধান মিলল, যার জোরে মানুষ ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় প্রতিবেশ বদলে অন্য জীবের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হয়েছে মনে হল কিংবা দেখা গেল। এবং (২) এই উন্নতির ইতিহাস একটি অদৃশ্য উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে বলে ধারণা জন্মাল। ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন থেকে আজ পর্যন্ত যতটা উন্নতিবাদের চলন হয়েছে তার মূলে ছিল ঐ উদ্দেশ্যবাদ, ঐ মানুষের প্রতি আস্থা, তার বর্তমানে গৌরব ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস। উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদই হল আমাদের পরিচিত মানব-ধর্মের প্রাণবস্তু। গণিতের কবলে থাকলে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারতো না। (ক্যাসিরার এই উন্নতিবাদের ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। এর খবর ক্রিস্‌টোফার ডসন দিয়েছেন চমৎকার।) একবার পথ যেই খুলল, অমনই মানুষ-সংক্রান্ত যত প্রকার বিদ্যা আছে সব এগিয়ে চলল। মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, কেউ পড়ে রইল না।

কিন্তু নতুন বিপদ এল। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই দু' নৌকোয় পা ; কিছুদূর অগ্রসর হলেই প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের গহ্বরে, আবার না এগুলে কেবল বর্ণনার জঞ্জাল জড়ো করা। সেই পুরাতন তর্ক, সাধারণ বড় না বিশেষ বড়? সাধারণকে মানলে মানুষের ইতিহাস হয় অঙ্কের অধীন, না হয় 'ন্যাচারাল হিস্‌ট্রি' ; আবার বিশেষকে স্বীকার করলে কোনো নিয়মই খাড়া করা যায় না, কোনো কাজই সম্ভব হয় না, কোনো কিছু বোঝাই যায় না। জনকয়েক ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস বিজ্ঞানের মতন করেই লিখতে হবে ; যেমন র‍্যাঙ্কে ; আবার কেউ বলেন, ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ, যেমন কার্লাইল। অবশ্য লেখবার বেলা কেউই নিজের মতানুসারে চললেন না। আর একটি বিপদ ঘটল এই যে, প্রত্যেক মানুষ-সংক্রান্ত বিদ্যাই নিজের নিজের নিয়ম তৈরি করে দাবি জানালে যে সেইটাই একমাত্র নিয়ম, অন্য কোনো নিয়ম

মানুষের বেলা খাটে না। এই বিভিন্ন দাবির উৎপাতে সেই পুরাতন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গড়া মূল পত্তন গেল ভেঙে। আজও সেজন্য হা হুতাশ শুনতে পাই, যেমন ক্যাসিরার—*An Essay on Man*, পৃঃ ২১, ২২।

কিন্তু আমার মতে দুঃখের অতটা কারণ নেই। মার্ক্স্‌বাদে এই দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই মতে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ ; অথচ প্রকৃতি থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ বুদ্ধি, বিচার ও কর্মের দ্বারা সে কেবল মানবপ্রকৃতিই নয় জড়-প্রকৃতিরও নিয়ম বুঝতে, সমালোচনা করতে, এবং নিজের মত ভেঙে-গড়ে নিতে পারে। কোপার্নিকান-কার্টেসিয়ান পদ্ধতির বাঁধাধরা নিয়ম এতে নেই, তবে সমগ্র ধারার গতিপ্রবাহ এতে আছে। অনেকে একে এনভিরনমেন্টালিজ্‌ম্‌-এর (environmentalism) পর্যায়ে ফেলতে চান ; কিন্তু যদি এই ধরণের মন্তব্য করতেই হয় তবে হুম্যান জিয়োগ্রাফীর সঙ্গে একে যুক্ত করাই যুক্তিসাপেক্ষ। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এ অন্ধনিয়তির স্থান নেই, আবার আকস্মিকতারও স্থান নেই। অসীমের বিচারে যেমন মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পেয়েছিল তেমনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রত্যয়ে মার্ক্স্‌বাদী আপনার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর যুক্তিপন্থা প্রধানতঃ আরোহী। বিশেষ ক্ষেত্রে অবরোহী। এর মূলকথা জীবতত্ত্বের পরিচিত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সাধারণীকরণ, শ্রেণীবিভাগ ও অবিশেষ-চর্চা ; এবং সেই অবিশেষ সংজ্ঞা ও প্রত্যয় থেকে কর্মক্ষেত্রের বিশেষত্বে প্রত্যাবর্তন। মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এ বিশেষ ও সাধারণের বিবাদ খানিকটা মিটেছে। কেবল তাই নয়, সেই জন্যে মার্ক্স্‌বাদী ইতিহাস ন্যাচারেল হিস্‌ট্রি থেকে পৃথক হতেও পেরেছে। তার উন্নতিবাদ গড্‌উইন, কন্ডর্স-এর অজানিত উদ্দেশ্যচালিত উন্নতিবাদ নয়। মানুষের চেষ্টার উপর গ্রথিত বলে সেটা এত পাকা, এতটা সুনিশ্চিত হয়েও অনিশ্চিত। মোদ্দা কথা এই ; মার্ক্স্‌বাদ সেই বহু পুরাতন মনুষ্যধর্মের আধুনিক সংস্করণ। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে স্টোয়িক মানবতার (stoic humanism) আত্মকেন্দ্রিকতার মিল নেই ; ভারতীয় মানবতার আত্মচর্চার সঙ্গেও তার মিল কম ; য়ুরোপীয় রিনেসাঁ যুগের শেষভাগের মানবতার খাপছাড়া, মুনফালোভী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও বিপরীত ধর্মী ; এবং আজকালকার বৈজ্ঞানিক মানবতার (scientific humanism) সঙ্গেও পার্থক্য তার অনেকখানি।

তা হলে দাঁড়াল এই : মার্ক্স্‌বাদের কেন্দ্র মানুষ। কিন্তু মানুষ আর ব্যক্তি কি এক বস্তু? যদি বলা যায় যে, মাত্র ব্যক্তিই সত্য, কারণ তারই মন ও দেহ আছে, তবে সকলেই মানতে বাধ্য যে মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে এই ব্যক্তি-সত্তার সম্বন্ধ সাক্ষাতের বা সোজাসুজি নয়, একটা কোনো মানব-গোষ্ঠীর মারফত ; অর্থাৎ সেই গোষ্ঠী প্রথমে স্বাধীন হলে তবে 'ব্যক্তি' হবে মুক্ত। আর যদি কেউ বলেন যে, ব্যক্তি বলে কোনো বস্তু নেই, একটা কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র, এবং সমষ্টিটাই সত্য, কারণ ব্যক্তি সমষ্টির

দ্বারাই প্রভাবিত, প্রচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তবে মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে মানব -সমষ্টির সম্বন্ধ নিতান্ত প্রত্যক্ষ। আমার নিজের বিশ্বাস, অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ব্যক্তি পদার্থটি একটি প্রকাণ্ড abstraction বা বিমূর্তভাব, যার উৎপত্তি ইংলণ্ডে ধনিকতন্ত্রের যুগে এবং যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার ও ভারতীয় সমাজের ও ঘটনার কোনো যোগ নেই। ভারতীয় চিন্তায় আছে পুরুষ ; ও আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত এমন খুব বেশী 'ব্যক্তি' জন্মাননি যাঁদের চরিত-কথার প্রেরণায় ধন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যায়। (তবে তাঁরা অবতীর্ণ হচ্ছেন)। ব্যক্তিত্ববাদের মূল কথা আর্থিক উন্নতির সাধনা। পুরুষবাদের তত্ত্বকথা বর্ণাশ্রম, অর্থাৎ সমাজের ভেতরে বিকশিত হবার পর গুটিপোকার মতন কেটে বেরোনো। মার্ক্‌স্‌বাদ আর হিন্দুত্ব এক বস্তু বলছি না ; আমার বক্তব্য এই যে, ব্যক্তিত্বের নামে মার্ক্‌স্‌বাদের বিচার করা ভারতবাসীর মুখে মানায় না। মানায় ভারতীয় ধনিকদের এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তাঁরা কি ভারতবাসী? মার্ক্‌স্‌বাদের অন্য গলদ থাকতে পারে ; তবে ব্যক্তিত্ব নামক কল্পিত বস্তুর বিশেষ রকমের উন্নতিবিধানের স্থান, কিংবা জল্পনা কল্পনা মার্ক্‌স্‌বাদে নেই বলে তার সমালোচনা চলে না ; কারণ, তা হলে সমগ্র মানব প্রচেষ্টার গতির বিপক্ষে যেতে হয় ; জ্ঞানের ইতিহাসকে অপমান করা হয়। মার্ক্‌স্‌বাদের সঙ্গে মানবধর্মের সম্বন্ধ পুরুষতত্ত্বের (personalism) ভেতর দিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মারফৎ নয়।

দেশের জাগরণ

কাজী আবদুল ওদুদ

মুসলমানের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতার ইতিহাস। তাই ওহাবী-প্রতিক্রিয়া যে বর্তমানে তার প্রধান পরিচয়-স্থল হবে সে-কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু একালের হিন্দুর ইতিহাস তার জাগরণ-চেষ্টার ইতিহাস, তাই হিন্দুর সত্যকার পরিচয়, অর্থাৎ তার শক্তি ও দুর্বলতা, সেই জাগরণ-চেষ্টার ভিতরেই খুঁজতে হবে। আর—হিন্দুর এই জাগরণ-চেষ্টা শুধু হিন্দুতে সীমাবদ্ধ থাকে নি, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়েও সংক্রামিত হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জাগ্রত হবার চেষ্টা করেছে বলা যায়। দেশ যে বিরোধ ব্যাধিতে ভুগছে তা থেকে উদ্ধার পাবার মতো জীবনী-শক্তি দেশের লোকদের-মধ্যে আছে কিনা তারও সন্ধান পাওয়া সম্ভব দেশের এই বিচিত্র জাগরণ-চেষ্টার মধ্যেই।

দেশের একালের জাগরণ প্রধানত তিনটি কেন্দ্রে হয়েছে—বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র ও উত্তর ভারত। এই তিনের আদি ও প্রধান কেন্দ্র বঙ্গদেশ। মহারাষ্ট্রের ও উত্তর ভারতের জাগরণ-চেষ্টা তার সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত।

বাংলায় ইংরেজের কুঠির পত্তন হয় আড়াইশ বছর আগে। সেই সময় থেকেই বাণিজ্য-ব্যাপারে হিন্দু বাঙালীদের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ইংরেজের নির্মিত শহর অনেকখানি নিরাপদ জ্ঞান করে প্রায় সেই সময় থেকেই সেসব শহরে হিন্দুদের বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলে আসছে। সেইজন্য বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে-জাগরণের সূচনা হোলো তাকে ইয়োরোপীয় সংস্রবের ফল বলে' দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৮৭৬ সালের সুরেন্দ্রনাথের Indian association স্থাপনা পর্যন্ত, অথবা ১৮৮৫ সালের ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপনা পর্যন্ত, অথবা একাল পর্যন্ত, এই জাগরণ নানা ধারায় নানা ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে বা করে আস্ছে। কাজেই ইয়োরোপীয় সংস্রবের পরিচয় যে এর মধ্যে কখনো কখনো সুস্পষ্ট না হয়েছে তা নয়। তবু সেই সংস্রবই এর প্রধান পরিচয় কিনা সেটি বিচার্য।

এই জাগরণের আদিপুরুষ রামমোহনের যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে সেসবের মধ্যে তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন-ই বোধ হয় প্রাচীনতম। এর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায়

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন—রামমোহনের ধর্মজীবনের সূচনা এখানে, এর পরে তাঁর সে-জীবনের পূর্ণাঙ্গতা লাভের পরিচয় আছে ব্রাহ্মসমাজের Trust deed-এ। কিন্তু তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এর সঙ্গে রামমোহনের পরে পরের রচনা তুলনা করলে এইই দেখা যায় যে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তন পরে তাঁর ভিতরে দেখা দেয় নি, শুধু তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এ অবতার পয়গম্বর ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা তিনি যে অস্বীকার করেছিলেন পরে আর সেসব তেমন ভাবে অস্বীকার করেন নি বরং স্বীকার করেছেন। আমি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে যেভাবে তিনি পরে মধ্যবর্তী পয়গম্বরাদি স্বীকার করেছেন তা প্রকারান্তরে অস্বীকার করা অর্থাৎ সাধারণত তাঁদের যেভাবে পরিত্রাতা বা পরিত্রাণের ভারপ্রাপ্ত বলে' স্বীকার করা হয় তা তিনি মানেন নি*। তবে তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীনে ও পরে পরের গ্রন্থসমূহে—যেমন হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা ও খৃস্টান শাস্ত্রের আলোচনা—বড় পার্থক্য এই দেখা দিয়েছে যে তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এ রামমোহন সংস্কারক ঠিক নন কিন্তু পরে তিনি সংস্কারক। তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এ তিনি মনীষী সত্য তন্ন তন্ন করে সন্ধান করছেন ও তা যোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। এখানে তাঁর যে প্রখর যুক্তিবাদ প্রকাশ পেয়েছে তাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখেছেন। তা সত্য হলেও সে-যুক্তিবাদের সঙ্গে রামমোহনের যুক্তিবাদের বড় পার্থক্য এই যে রামমোহন একই সঙ্গে প্রখর যুক্তিবাদী ও ঈশ্বরে-সমর্পিত-চিত্ত তাঁর অবলম্বিত যুক্তিপদ্ধতি মুস্‌লিম নৈয়ায়িকদের একথা তুহ্‌ফাতুল্ মুওহ্‌হিদীন-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদক মাওলানা ওবেদুল্লাহ্ স্বীকার করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের যুক্তিপদ্ধতিও তিনি ব্যবহার করেছেন। সেই দার্শনিকদের মধ্যে স্পেনীয় দার্শনিকরা নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসও তাঁদের অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁদের প্রভাবে রামমোহনের মানস-জীবন গঠিত হয়েছিল একথা স্বীকার করার পথে কোনো বাধা নেই অথচ একথা স্বীকার করলে তাঁর প্রতিভার স্বরূপ-নির্দেশ কিছু সহজসাধ্য নয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে মুস্‌লিম দর্শন শেষ পর্যন্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য হয় নি ; রামমোহনের যুক্তিবাদের সঙ্গেও ঈশ্বর নিত্যযুক্ত। রামমোহনের প্রতিভার বেশ স্পষ্ট দুইটি ধারা—একদিকে তিনি মনীষী, বিচারকুশল ; অন্যদিকে তিনি মানবপ্রেমিক সমস্ত জ্ঞান ও বিচারের সামাজিক মূল্য বড় করে দেখছেন। তার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এই শেষোক্ত লক্ষণ তাঁর প্রতিভার বড় লক্ষণ হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে রামমোহন সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে তার বড় পার্থক্য এই যে তাঁদের মতো তিনি ভক্ত ও কবি নন, তিনি ভক্ত ও মানবহিতাকাঙ্ক্ষী—সে-হিতাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য মানুষের দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধন। মধ্যযুগের সাধকদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর আধুনিকতা

* দ্রঃ রামমোহন রায়।

এইভাবে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই আধুনিকতারও স্বরূপ বোঝা যাবে তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় মনীষী গ্যেটের সঙ্গে তুলনায়। ফাউস্ট্-এ গ্যেটের যে কথা যে ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সেই ভুলের ভিতর দিয়ে তার কল্যাণাভিসারী পথ সে-কথা হয়ত রামমোহনেরও ; তাঁর "ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের" কথাটির এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভিল্‌হেল্‌ম্ মেইস্‌টার-এ গ্যেটে যে একটি আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন তাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ পরিত্যক্ত হয়েছে, মানুষ শক্তিমান হয়ে প্রকৃতির উপরে ও নিজের উপরে অধিস্বামিত্ব লাভ করবে মানুষের এই রূপই গ্যেটে যেন সেখানে দেখেছেন ভক্তিবাদকে তিনি যেন অবিশ্বাস করেছেন—এতে রামমোহন রাজি হতেন কি না তাইই ভাববার কথা। বাস্তবিক, প্রখরযুক্তিবাদী, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষাবকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, রামমোহন যে অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ঈশ্বরানুরাগের উপরে, শুধু অন্তরে নয় সমাজ-জীবনেও তার প্রকাশ কাম্য জ্ঞান করেছিলেন, এই থেকেই বাংলার (অথবা ভারতের) ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে। আমরা বলতে চাই, বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ মোটের উপর একটি ধর্মান্দোলন ; কর্মান্দোলনও তার সঙ্গে হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে অতি-নিন্দিত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে অথবা ইয়োরোপের কোনো প্রধান দেশে যা হয়েছে তার সঙ্গে তার তেমন তুলনা হয় না। আর রামমোহনের পরে সেই কর্মের প্রবাহ তো যথেষ্ট অল্পপরিসর।

রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ (সামাজিক কর্মী হিসাবে) যে মুখ্যত ভগবৎ-উপলব্ধি-কামী, অন্তত, প্রধানত সেই কামনার জন্য তাঁদের জীবনকে তাঁরা ধন্য মনে করেছেন, সে-কথার প্রমাণ দেবার দরকার করে না। কেবল ডিরোজিও ও বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয়। কিন্তু বিচারপন্থী হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যয়শীলতা যে ডিরোজিওর অন্তরপ্রকৃতির বড় ধর্ম ছিল তা বোঝা যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কবিতা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝাই শক্ত। তাঁর প্রতিভায় বড় গুণের ও বড় দোষের এমন একত্রসমাবেশ ঘটেছে যে তাঁর কোন্ রূপ সত্যরূপ তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাঁকে বলা হয়েছে স্বদেশপ্রেমের পুরোহিত। কিন্তু তাঁর স্বদেশপ্রেমে সৃষ্টিধর্মের চাইতে প্রলয়ধর্ম বলবত্তর। তাঁর ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক রচনাগুলোর বেশী মূল্য দেবার উপায় নেই, কেননা, তিনি নিজে সেসবের বেশী মূল্য দেন নি—সেসবে বাদ-প্রতিবাদের ঝাঁজ মরে নি। হয়ত শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যিক অর্থাৎ রস-স্রষ্টা হিসাবেই দেখ্‌তে হবে। সে-হিসাবে মধুসূদনের মতো তাঁকেও যদি দেখা হয় এই ধর্মান্দোলন-যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' তাতে যুগের প্রকৃত রূপ আচ্ছন্ন হয় না।* বিদ্যাসাগরকেও এযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে'

* বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দেখা দরকার, কেননা, তাঁর বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন শাস্ত্র-সমর্থিত হলেও তিনি নিজে একে জানতেন কাণ্ডজ্ঞানানুমোদিত সামাজিক ব্যাপার বলে, এই মনে হয়।

রামমোহনের আবির্ভাব থেকে সুরেন্দ্রনাথের Indian Association স্থাপনা পর্যন্ত মোটামুটিভাবে এই ধর্মান্দোলন যুগের স্থিতিকাল বলা যায়, কেননা সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজনীতির প্রবর্তক। নিজেকে তিনি অবশ্য জান্‌তেন ধর্মপ্রাণ ম্যাট্‌সিনির শিষ্য বলে'; কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই পরিচালক, শিক্ষিত ভারতবাসী কেমন করে' ইংরেজ শাসকদের মতো সুযোগ সুবিধা লাভ করে' সম্মানিত জীবন যাপন করবে এই ছিল তাঁর লক্ষ্য, একথা বল্লে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয় না। Indian Association-এর দশ বৎসর পরে ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়, আর কংগ্রেস রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করে' দেখ্‌তে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও আনন্দমোহন প্রমুখ কর্মীর সেবা দেশের লাভ হয়েছিল যাঁরা রাজনীতিকে জীবনের অন্যান্য প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখেন নি, বরং জীবনের সমস্ত প্রয়াস এক বড় আদর্শের অঙ্গীভূত করে' দেখেছিলেন। কংগ্রেসের পূর্বে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন তেমন প্রবলপ্রতাপ হয়নি এই বিবেচনা থেকে কংগ্রেসস্থাপনার পূর্ব পর্যন্ত ধর্মান্দোলনের স্থিতিকাল বল্লে বেশী সঙ্গত হতেও পারে। এর পরে যে সব ধর্মপ্রাণ কর্মীর আবির্ভাব দেশে হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীকুমার—তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্র থেকে নিজেদের দূরেই রেখেছিলেন বেশী। সেইজন্য ভিন্ন কালে জন্মেও ধর্মান্দোলন-কালের সঙ্গে তাঁরা নিবিড়ভাবে যুক্ত।

এই ধর্মান্দোলন-যুগ শুধু যে বাংলার গৌরব তা নয় সমগ্র ভারতের গৌরব। পৃথিবীর বড় বড় ধর্মান্দোলন-যুগের সঙ্গে এর তুলনা করলে এর ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে—চারপাশের দুর্বলতার সঙ্গে এর সংগ্রাম তেমন প্রবল হয়নি। তবু এই যুগের সাধকরা মাঝে মাঝে এমন দুই-একটি কাজ করেছেন, দুই-একটি কথা বলেছেন, যাতে ধূলিলুণ্ঠিত চতুষ্পার্শ্বের জীবনকে যেন মুহূর্তের জন্য এক সুউচ্চ গ্রামের শোভা-সৌন্দর্য দেখবার শক্তি দান করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—রামমোহনের শিক্ষা সম্বন্ধে পত্র ও ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীড, ডিরোজিওর ভারত-বন্দনা, দেবেন্দ্রনাথের দুর্বহ পিতৃঋণ সর্বান্তঃকরণে স্বীকার, কেশবচন্দ্রের "The term Brahmo is not included in the term Hindu", রামকৃষ্ণের সমস্ত ধর্মের সাধন-চেষ্টা, বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর", রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" এরকম আরো কীর্তি ও বাণী ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের আছে যার ভিতর দিয়ে মানুষের সৃজনী প্রতিভার পরম মনোজ্ঞ রূপ উৎসারিত হয়েছে। এ যুগের অনেক কাজে ও কথায় অভিনবত্বের ছটা অবশ্য কম। কিন্তু তাতে সেসবের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না। ফুল পুরাতন, কিন্তু প্রতিদিন বাগানে বাগানে নতুন হয়ে ফুট্‌ছে।

এ যুগ আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের যে একটি শ্রেষ্ঠ যুগ সে-সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা দিন দিনই বেশী সচেতন হচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত-সাধারণের সঙ্গে একালের বাংলার এই স্রষ্টাদের কি সম্পর্ক সে-কথাটি ভাল করে' বুঝে দেখবার প্রয়োজন আছে। এ-প্রশ্ন আমাদের শিক্ষিতদের মনে তেমন ওঠে না, তাঁরা মনে করেন, দেশের মানস জীবনের সহজ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা পোষণ করবার কারণ উপস্থিত হয় নি। দুশ্চিন্তা অবশ্য অসার্থক ; কিন্তু দেশের মানসজীবনের ক্রমবিকাশ যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং দেশের একালের স্রষ্টাদের সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের সম্পর্ক যে সাধনা ও সাধনার উত্তরাধিকারের সম্পর্ক নয় কৃতী পিতার ভদ্রাসন ও প্রতিপত্তির সঙ্গে পুত্রের যে সাধারণ সম্পর্ক সেই সম্পর্ক, এ কথা আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি।* কেন এমন হয়েছে সে-কথাটি সংক্ষেপে বলা যায় এই ভাবে ঃ—

রামমোহন থেকে দেশে যে নব চেতনা এলো তার বড় প্রকাশ হলো দুই ক্ষেত্রে—হিন্দু কলেজে ও ব্রাহ্মসমাজে। এ দুটিই হলো হিন্দু-সমাজের জন্য সংস্কার-আন্দোলন—অবশ্য সংস্কারের চাইতে আন্দোলন বেশী। এই সময়েই হিন্দু-সভ্যতার লাভ হলো বৈদেশিক পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা। ফলে এই অনেকখানি দুর্বল সংস্কারকদের সংস্কার-চেষ্টাকে দাম্ভিকতা বলে' ভাববার সাহস হিন্দু-সমাজের ভিতরে জাগ্‌লো। প্রেম ও সৃষ্টি-ধর্মী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে তাঁদের দলে পেয়ে তাঁদের অভ্রান্ততা-বোধ বিশেষভাবে বর্ধিত হলো। মুসলমানের চিন্তার ইতিহাসে ইমাম গাজ্জালীর প্রভাব যে-ফল ফলিয়েছিল একালের হিন্দুর চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবও সেই ফল ফলালো ; অর্থাৎ, সর্বসাধারণের কাছে সংস্কার-চেষ্টা একশ্রেণীর দুর্বলতা মনে হলো, আর প্রাচীন সুপরিচিত ধারা নূতন মহিমায় মণ্ডিত হলো।

কিন্তু দেশের একালের এই সংস্কার-চেষ্টা বা নবজীবন লাভের চেষ্টা এর চাইতেও বড় আঘাত পেল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তরফ থেকে। রাজনীতি অবশ্য মানুষের সমাজজীবনের খুব বড় ব্যাপার। কেউ যদি একে মানুষের জীবনের সব চাইতে বড় ব্যাপার জ্ঞান করেন তাঁর সঙ্গে তর্ক না করলেও চলে। কিন্তু আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের রাজনীতি নামে ও ধরণধারণে রাজনীতি হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু পদমর্যাদা-বৃদ্ধির জন্য আন্দোলনমাত্র—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আবেদন নিবেদনের থালা বহন। শুধু এই ব্যাপারটি দেশের মানস-জীবনের জন্য মারাত্মক হতো না ; এটি মারাত্মক হলো এই বিশেষ কারণে যে এই সামান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এর তরফ থেকে এমন ঢক্কা-নিনাদ

* 'বাংলার জাগরণ' ও 'রামমোহন রায়' দ্রষ্টব্য।

দেশের দিকে দিকে বিঘোষিত হলো যে আত্ম-অন্বেষণের কঠোর প্রয়াস সহজেই দেশের লোকদের কাছে স্বাদহীন মনে হলো পর-চর্চার স্বাদুতার সাম্‌নে। —কেউ কেউ হয়ত বলবেন, এক সময়ের এই সৌখীন রাজনীতি চিরদিন সৌখীন থাকে নি—স্বদেশী আন্দোলন, একালের রাজনৈতিক আন্দোলন, নানাজনের নানা ধরণের আত্ম-দান তার প্রমাণ। যাঁরা এমন কথা বলেন তাঁদের মধ্যে অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি আছেন। তাই পরম বিনয়ে এই কথাটি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জীবনের সার্থকতার পথ ক্ষুরধার, যা প্রচণ্ড বা মোহকর তার গতি সেই পথে অবাধ যে হবেই এমন কথা নেই ; আর জীবনে যা অসার্থক তাকে সৌখীন না বলে' উপায় কি। আত্মদান অবশ্য অশ্রদ্ধার সামগ্রী নয় কখনো, কিন্তু নবতর অন্ধতার জন্মও যে তার থেকে সম্ভবপর সে-সম্বন্ধে চেতনার অভাব মারাত্মক।

আমাদের দেশের রাজনীতি-চর্চা একটি ক্ষুদ্র দলে আবদ্ধ বলে' যে তাকে আমরা অসার্থক বলতে সাহসী হয়েছি তা নয়। একটি দল কেন একজনের মধ্যেও রূপ লাভ করতে পারে সমগ্র দেশের কল্যাণ-সম্ভাবনা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক অসার্থকতার মূলে আমাদের শিক্ষিতদের শোচনীয় আত্মসর্বস্বতা ও অপ্রেম। যদি বলা যায় যে দেশের রাজনৈতিক চেতনার প্রারম্ভে তাঁরা পূজারি হয়েছিলেন পরিতোষ-দেবতার আর আজ পূজারি হয়েছেন অসন্তোষ-দেবতার তবে অপ্রিয় কথা বলা হয় সত্য কিন্তু অসত্যকথা হয়ত নয়। দেশ বল্‌তে যে বহু শ্রেণীর বহু মানসিক স্তরের লোক বোঝায়, আর দেশ-সেবা বল্‌তে যে সেই সব মানুষের উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত সাধনা বোঝায়, এসব কথা বলবার মতো লোক আমাদের দেশে কম জন্মাননি ; কিন্তু যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মী দেশের এই সমস্যার গুরুত্ব তাঁদের বোঝানো সম্ভবপর হয়নি। তার চাইতে তাঁরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন তাঁরা যে সংখ্যায় যথেষ্ট অতএব গণনীয় এই কথাটা বিদেশী শাসকদের বোঝাতে। তাঁরা যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেকথা মানতে হবে ; কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যের সম্মুখীন তাঁরা হচ্ছেন না যে সব জয় জয় নয়, অনেক জয় পরাজয়েরই অন্য নাম, এইখানেই কর্মী হিসাবে তাঁদের শোচনীয় দুর্বলতা। ভাঙ্‌বার ক্ষমতার সঙ্গেই যুক্ত থাকে গড়্‌বার তাগিদ, এ সুচিন্তা নয়—মোহ ; এর বিপরীতটি অবশ্য সত্য—গড়্‌বার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকে ভাঙ্‌বার তাগিদ। যাঁর গড়্‌বার ক্ষমতা ভাঙ্‌বার তাগিদের পূর্ববর্তী হয় নি তাকে অনায়াসে বলা যায় কুকর্ম। কর্ম ও জ্ঞান-এর কোনো ক্ষেত্রে আমাদের দেশের রাজনীতি যে সৃষ্টিপ্রবণ হয় নি যারা সৃষ্টিপ্রবণ হয়েছেন তাদের প্রভাব সে ক্ষেত্রে নগণ্য হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় আছে মনে হয় না। অথচ, এই রাজনীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছে দেশের সমস্ত মন!

দেশের দ্বিতীয় জাগরণ-কেন্দ্র মহারাষ্ট্র। বাংলার জাগরণের সঙ্গে তার যোগ নিবিড়। তবে মহারাষ্ট্রও স্বকীয়তা-বিবর্জিত নয়।

মহারাষ্ট্রের জাগরণের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। রামমোহনের সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার সেকালে তাঁরই লাভ হয়েছিল মনে হয়। রামমোহনের মতোই তিনি স্বদেশ-প্রেমিক আর তাঁর স্বদেশ-প্রেমও নিরভিমান। দুর্লভ মনীষারও তিনি অধিকারী ; তাঁর A theist's confession of faith সহজেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তার গৌরব-স্বরূপ। বাংলায় তাঁর চাইতে সূক্ষ্মতর চিন্তার বিকাশ হয়েছে কিন্তু তাঁর মতো স্থিতধী প্রতিভা বাংলায় দুর্লভ।

এই রাণাডে জননায়করূপে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন সেটি বেশ বুঝে দেখবার মতো। তাঁর মনীষাকে তিনি আবৃত করেননি, ধর্মে ও সমাজে হিন্দুর যে-সব আচার ও চিন্তা তিনি উন্নত জীবনের পরিপন্থী মনে করেছিলেন সে-সব সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত তাঁর মতামত। তবু কর্মক্ষেত্রে তিনি বড় জ্ঞান করেছিলেন মতবাদের পরিচ্ছন্নতা তত নয় যত তাঁর চারপাশের লোকদের সঙ্গে নিবিড় যোগ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষের জন্য অতন্দ্রিত কিন্তু অনুৎকট প্রয়াস। এতে চিন্তার বিচিত্র প্রকাশ তাঁর অঞ্চলে হয়ত আজো তেমন হয় নি ; কিন্তু পশ্চিম ভারতের লোকদের অর্থনৈতিক বোধ যে বাঙালীর চাইতে উন্নততর তার সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ করে', দেশের সৃষ্টিধর্মী রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্য গোপালকৃষ্ণ গোখেল যেরূপ কৃতী হয়ে গেছেন তাতে পরিচয় রয়েছে তাঁর সাধনার মাহাত্ম্যের। আশ্চর্য এই যে ইতিহাসে মারাঠাজাতির পরিচয় নির্মম লুণ্ঠনকারীরূপে অথচ সেই জাতির ভিতরে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন মানবপ্রেমিক মনীষী। এ বিষয়ে রাণাডে নিজেও হয়তো সজাগ ছিলেন—তিনি নিজেকে উত্তরাধিকারী জ্ঞান করেছেন মারাঠা জাতির সাধুসন্তদের ও সেই সঙ্গে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে ভারতের যুগ-যুগান্তরের ঋষি ও প্রেমিকদের।

মারাঠা জাতির সত্যকার নেতা রাণাডেই, অন্তত দূর থেকে তাইই আমাদের মনে হয়। কিন্তু এই মারাঠা দেশে আর একজন শক্তিমান্ ব্যক্তিরও জন্ম হয়েছিল বৃহত্তর দেশের রাজনীতির উপরে তাঁর প্রভাব অসামান্য ; তিনি বালগঙ্গাধর তিলক। দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছে দুঃসাহসী নেতা জ্ঞানে। কিন্তু তাঁর শক্তি হয়ত বাংলার বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রলয়ঙ্কর শক্তি—দুর্যোগরাত্রির বিদ্যুৎঝলক তাতে, পথের নির্দেশ তার কাছে কেউ আশা করে না।

কিন্তু ভাবুক বাঙালী ও কাণ্ডজ্ঞানপ্রিয় মারাঠা দুয়েরই কাছে এই জাগরণ নাম পেল হিন্দু-জাগরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ে সূচিত হলো এই জাগরণ, তাতে উৎফুল্ল হয়ে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দু এর এই নামকরণ করলেন তা নয়। দেশের এই নবচেতনা যাঁদের দ্বারা সূচিত হলো সেই বরেণ্য স্রষ্টাদেরও অনেকের কাছে এই নাম সমর্থন

পেল। এই হিন্দুজাগরণ কথাটা দেশের জীবনধারায় এত বড় জায়গা দখল করেছে যে এ'কে ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজন আছে।

এই হিন্দু-জাগরণ কথাটার ভিতরে মোটামুটি ভাবে তিনটি চিন্তাধারা রয়েছে। প্রথমত, হিন্দু-জাগরণ বলতে বোঝা হয়েছে পতিত হিন্দু-সমাজের সহজ ও সবল মনুষ্যত্বের স্তরে উত্থান। অন্যান্য উন্নত সমাজের মানুষ যেমন জগতে সম্মানিত জীবন যাপন করে যাচ্ছে হিন্দু দীর্ঘকাল তা থেকে বঞ্চিত থাকলেও আবার তার সুদিনের উদয় হয়েছে, এই এ-মতের চিন্তাশীলেরা বলেন। এঁরা বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী মনে করেন, আর সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে জাতিতে জাতিতে অথবা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিতীয়ত, হিন্দু-জাগরণ বলতে বোঝা হয়েছে হিন্দু-সভ্যতার অন্তর্নিহিত 'অনন্যসাধারণ' শক্তির জাগরণ। হিন্দু-সমাজ অতি পুরাতন—বর্তমান সভ্য জগতে প্রাচীনতম ; তার সমবয়সী সব সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও কেবল সে-ই আজো ধ্বংসমুখে পতিত হয় নি ; অতএব সিদ্ধান্ত এই যে তার গঠনের মূলে অতি আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রয়েছে, তার এমন দীর্ঘ পরমায়ুর কারণ সেই বৈজ্ঞানিকতাই। এই মতের চিন্তাশীলদের ধারণা হিন্দু-সভ্যতা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা, হিন্দু-জাগরণের অর্থ সেই আশ্চর্য শক্তির জাগরণ—জগতের কল্যাণের জন্য। তৃতীয়ত, হিন্দু জাগরণ বলতে বোঝা হয়েছে ভারতের সর্বব্যাপী এক বিশেষ প্রভাবের জাগরণ। এই মতের চিন্তাশীলেরা বলতে চান ভারতে আর্য অনার্য দ্রাবিড় শক হুন প্রভৃতি বিচিত্র জাতির মিলনে মুসলমানের আগমনের পূর্বে একটি বিশেষ মনোভাবের জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই মিশ্রিত জাতির সাধারণ নাম হিন্দু। মুসলমানেরা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে খুবই চেষ্টা করেছিল। তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নি ; কিন্তু তাদেরও অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, নানা আচারে, হিন্দু-প্রভাব অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রভাব পড়েছিল। সে-প্রভাব দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। সেই ভারতীয়ত্ব কিছুদিন নিষ্প্রভ হয়েছিল, আবার তার শক্তি বোঝা যাচ্ছে। হিন্দু-জাগরণের অর্থ—এই ভারতীয়ত্বের জাগরণ। এদেশের সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত এটি, কেননা এই-ই জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের সকলের সার্থকতা-লাভের পথ। কোনো সমাজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেওয়া এর স্বভাব নয়, তবে দেশের সব রকমের স্বাতন্ত্র্য যেন হয় এই মূল ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সুসঙ্গত।

হিন্দু-জাগরণের এই তিন অর্থের কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে, আপাতত দেখবার দরকার হিন্দুর প্রধান সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানের চিন্তা ও কর্মের উপরে এর প্রভাব। সে-ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে এই হিন্দু-জাগরণের প্রথম অর্থটি শিক্ষিত মুসলমানের অশ্রদ্ধেয় নয়। তৃতীয় অর্থটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করবার লোকও মুসলমান সমাজে আছে। কিন্তু এর দ্বিতীয় অর্থটি তাদের একান্ত অপ্রিয়।

হিন্দু-জাগরণের এই অপ্রিয় অর্থটি দিন দিন মুসলমানের চোখে কেমন স্পষ্টতর হচ্ছে তার পরিচয় রয়েছে ভারতীয় মুসলিম-জাগরণের নেতা স্যর সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণকারীদের প্রচেষ্টায়।

স্যর সৈয়দ বাল্যে মোগল সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন। বোধ হয় সেইজন্যই স্বধর্ম ও স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্বেও ওহাবী অসহিষ্ণুতার কবলে তিনি কখনো পতিত হন নি। মোগল সংস্কৃতির সেই সৌজন্যই তাঁকে হয়ত শক্তি দিয়েছিল দেশের সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে। ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্য সত্বেও শুধু একদেশবাসী হিসাবে মানুষে মানুষে যে আর্থিক ও রাজনৈতিক যোগ আছে সে-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। একটি বক্তৃতায় তিনি নিজেকে জাতিহিসাবে বলেছিলেন হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অধিবাসী। উন্নতিপ্রবণতার জন্য বাঙালীজাতির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল ; কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক একজন বাঙালী হিন্দু নিযুক্ত হয়েছিলেন দেখে ভারতবাসী হিসাবে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তবু শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। মৌলানা মোহম্মদ আলি কোকনদ কংগ্রেসে তাঁর অভিভাষণে স্যর সৈয়দের রাজনৈতিক মনোভাব বিশেষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের সব ক্ষেত্রে মুসলমানেরা বড় বেশী পেছনে পড়ে গিয়েছিল এই জন্যই স্যর সৈয়দ মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাঁর কথা মিথ্যা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের অপরিসীম দুঃখে পতিত হতে হয়েছিল, তার জন্য দেশের রাজনৈতিক জাগরণ, অর্থাৎ শাসকদের সঙ্গে যোঝাযুঝি, স্যর সৈয়দ যে মুসলমানদের জন্য অবাঞ্ছিত মনে করবেন, এ বোঝা যায়। কিন্তু এ ভিন্ন অন্য একটি উদ্দেশ্যও যে তাঁর ছিল তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়। তিনি ইসলামকে বলেছিলেন "এক লাজওয়ার নূর" (তুলনাহীন জ্যোতিঃ)—যা চিরউজ্জ্বল চিরপূর্ণাঙ্গ। হিন্দু-জাগরণ বল্‌তে যাঁরা বোঝেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার জাগরণ তাঁদের সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর এই ইসলাম-ব্যাখ্যার মিল রয়েছে। এই দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্য স্যর সৈয়দ চেয়েছিলেন শুধু যে মুসলমানের দুর্বলতার জন্য তা হয়ত সত্য নয়। মুসলিম সভ্যতার খ্যাতি জগৎ-জোড়া, সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী ভারতীয় মুসলমান আপাতত হতশ্রী হলেও কেন চেষ্টা করে' দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মতো সম্মানের পাত্র হবে না, তাদের চাইতে বেশী শ্রদ্ধার্হ হওয়াও তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়—এই ধরণের চিন্তায় অনুপ্রাণিত হওয়া সেদিনে তাঁর পক্ষে কত স্বাভাবিক ছিল তা বোঝা যায় এই কথা ভাবলে যে সে-যুগে রাণাডের মতো মনীষী ও স্বদেশবৎসল ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠ্‌তে চেষ্টা করেও ভারতীয় জাতীয় জীবন বল্‌তে হিন্দু-

জীবনই বুঝেছিলেন বেশী। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৌহার্দ্য তখন ছিল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে উচ্চতম ধারণা। 'হিন্দু-জাগরণ' 'মুসলিম-জাগরণ' এ-সব 'দেশের জাগরণের' সঙ্গে কিভাবে সম্বন্ধ সে-ধারণা তখন দেশের শ্রেষ্ঠদের মনেও ছিল অস্পষ্ট। তবু পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা স্যার সৈয়দ্ ও তাঁর কোন কোন সহকর্মীর ছিল যেমন তাঁদের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ হিন্দুজাগরণকামীদের ছিল। 'যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়'—তাঁর এই ইসলাম-ব্যাখ্যা কল্যাণপ্রসূ হবে আশা করা যায়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তিনি যে জীবনের ব্রত করেছিলেন মনে হয় এরই ভিতরে রয়েছে তাঁর প্রতিভার সত্যকার মর্যাদা।

স্যার সৈয়দের পরে মুসলিম জাগরণের বড় বাহন সৈয়দ আমির আলি ও স্যার মোহম্মদ ইকবাল। আমির আলি অনেক বিষয়ে ছিলেন স্যার সৈয়দের যোগ্য পরবর্তী। স্যার সৈয়দ জ্ঞানী হলেও প্রধানত ছিলেন কর্মবীর, মুসলমানের দুর্দশা ঘুচিয়ে তাকে আধুনিক কালের লোকদের সঙ্গে সহজভাবে চলবার সামর্থ্য দেবার সাধনা ছিল তাঁর। আমির আলির চেষ্টা হয়েছিল—অনেকখানি স্যার সৈয়দেরই অনুবর্তিতায়—মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত নিষ্করুণ সমালোচনার সৌজন্যময় প্রতিবাদ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানের সুমহৎ সম্ভাবনা প্রদর্শন। এঁরা দুজনেই যুক্তিবাদী; আমির আলি নিজেকে বলেছিলেন মোতাজেলা-পন্থী। ইসলামতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড এতে ঘোর আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে এই নব ভারতীয় মোতাজেলা-বাদ ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের ছদ্মনাম মাত্র। তাঁর কথায় সত্য আছে, কিন্তু ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে মোতাজেলা-বাদের দূর-সম্পর্ক যখন আছে তখন তাঁর এত আপত্তি অশোভন। তাছাড়া আমির আলির দাবীর সত্যতা বোঝা যায় তাঁর স্বসম্প্রদায়ের শিক্ষিত-সাধারণের উপরে তাঁর প্রভাবের স্বরূপের কথা ভাব্‌লে। তাঁর প্রভাবে তাঁদের স্বধর্মানুরাগ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি অথচ সেই সঙ্গে জ্ঞান ও উদারতার প্রতি কিছু অনুরাগ তাঁদের মনে জেগেছে।

কিন্তু আমির আলির নেতৃত্ব তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোকদের জন্য স্যার সৈয়দের মতনও কল্যাণপ্রসূ হয় নি তাঁর নিজের একটি মারাত্মক দুর্বলতার জন্যে। যে-দেশে তাঁর জন্ম সে-দেশে ভিন্নধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের যত আন্দোলন চলেছিল সে-সবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে নেই তা নয়, কিন্তু বড় অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সে সম্পর্ক। সুরেন্দ্রনাথের Indian Association এর পরে ও কংগ্রেসের আবির্ভাবের পূর্বে তিনি Central Mohamedan Association-এর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার রাজনীতির প্রশংসা আমরা করতে পারি নি, কিন্তু সেই রাজনীতির সঙ্গে তুলনাও আমির আলির রাজনীতি অদ্ভুত বলে' মনে হয়। তাঁর Central Mohamedan

Association-এর প্রেরণায় বাংলার বহুস্থানে নানা শ্রেণীর 'আঞ্জুমান' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মনে হয় তাতে বলবার বিষয় মাত্র এই দাঁড়িয়েছিল যে মুসলমান হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র। স্যার সৈয়দের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্যর সৈয়দ স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও সৃষ্টিধর্মী, কিন্তু আমির আলি, অন্তত কর্মক্ষেত্রে, শুধু স্বাতন্ত্র্যবাদী। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের রাজনীতির যে আদিরূপ—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আপন পদমর্যাদার জন্য অন্তহীন উপরোধ—আমির আলি তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন মনে হয়। তবে আমির আলির ভিতরে রাজনীতির চাইতে জ্ঞানানুরাগ প্রবল, তাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যবাদ উৎকট আকার কখনো ধারণ করে নি।

স্যর ইকবাল সমসাময়িক ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ যখন দেশে উৎকট হয়েছে তখন তিনি দাঁড়িয়েছেন মুসলিম নেতৃত্বের দাবী নিয়ে। তাই তাঁকে বুঝবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষকে বোঝা দরকার। এই বিরুদ্ধ পক্ষ কে? ঠিক হিন্দু-সমাজ নয়, তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ হিন্দু-সমাজে হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটি মনোভাব। হিন্দুজাগরণ বলতে যাঁরা বোঝেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের জাগরণ, আর যাঁরা বোঝেন ভারতের প্রকৃতি হিন্দু-প্রকৃতি, এই উভয় মতের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে তাতে। হিন্দুত্বের এই যে রুদ্র মূর্তি এর সঙ্গে ইসলামের ওহাবী মতের আশ্চর্য মিল রয়েছে। দুয়ের উৎপত্তি-সূত্রও একই। মুসলমান জগতের শক্তিহীনতা থেকে ওহাবী প্রতিক্রিয়া জন্মলাভ করেছে, তেমনি হিন্দুর যুগযুগান্তের শক্তিহীনতা ও ব্যর্থতা বোধ থেকে জন্ম হয়েছে এই রুদ্র-হিন্দুত্বের। হিন্দুত্বের এই রূপ হিন্দুসমাজে যে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা নয় কিন্তু মুসলমানের চোখে সে শুধু মাত্রার ভেদ। মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুত্বের অতি বড় পরিচয়চিহ্ন বলে' একালের মুসলমানদের মনে হয়েছে।

ইকবাল সেই কথাই খুব বড় করে বলছেন এই ভাবে—হিন্দুর অবলম্বিত জাতীয়তাবাদ দেশে সর্বব্যাপী হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপনের ছদ্মনাম। তার সঙ্গে আরো তিনি বলছেন—মুসলমান তাতে রাজি হতে পারে না এই জন্য যে জগতের একটি বড় আদর্শের সে বাহন, তাহলে সেই আদর্শ তাকে বিসর্জন দিতে হয়। অথচ এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নব্য তুর্কীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ যদিও তিনি জানেন যে নব্যতুর্কী তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করে না। অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমের পরিচয়ও তাঁর কাব্যে আছে, তাঁর 'নয়া শিবালয়' কবিতায় স্বদেশ-দেবতার পূজাকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। অল্পদিন পূর্বের একটি অভিভাষণেও তিনি বলেছিলেন—ভারত যদি কবীর বা আকবরের মত গ্রহণ করতো তাহলে কথা ছিল না ; কিন্তু তা যে হয় নি সেজন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শ অম্লান রাখা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের একমাত্র কর্তব্য বলে' তিনি মনে করেন।*

* All-India Muslim League-এ অভিভাষণ, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০।

বোঝা যাচ্ছে ইকবাল পণ্ডিত হলেও দুর্বল চিন্তা-নেতা—সমসাময়িক বিপর্যস্ত ভারতীয় জীবনের দ্বারা বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তিনি কবি, যখন যা বলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে বলেন, তাতে তাঁর বাণীর প্রভাব কম হচ্ছে না। ভারতের মুসলমানকে সব বিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে এই বহুকালের অর্ধস্ফুট কথা আপাতত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানের বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

হিন্দুসমাজের কর্মীদের আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি—স্রষ্টা ও শিক্ষিত-সাধারণ। এই দুইয়ের ভিতরে সাধনার যোগ ঠিক নেই এই আমরা বলতে প্রয়াস পেয়েছি। মুসলমান-সমাজেও তেমনি স্যর সৈয়দকে ভাবা যায় স্রষ্টা আর তাঁর পরের কর্মীরা প্রায় সবাই শিক্ষিত মাত্র। সৃষ্টিধর্মী রাজনীতি নয় রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি উভয় সমাজের এই শিক্ষিত-সাধারণের প্রধান পরিচয়-চিহ্ন। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে একালের স্রষ্টাদের যে সহজ ও নিবিড় যোগ একালের এই শিক্ষিত-সাধারণ সেদিক দিয়ে দুর্ভাগ্য।

দেশের জাগরণ-চেষ্টার যে পরিণতি হলো তা বেদনাদায়ক। 'হিন্দু-জাগরণ' 'মুসলিম-জাগরণ'-কামীদের কাছে যে অর্থে ব্যক্ত হলো তা নাও হতে পারতো। হিন্দুসমাজে সূচিত এই জাগরণকে হিন্দু-জাগরণ বলে' পরিচিত করবার আগ্রহ হিন্দু-সমাজে এমন প্রবল না হলেও অস্বাভাবিক কিছু হতো না। রাজনীতি খেয়ালী না হয়ে সৃষ্টিধর্মীও হতে পারতো। কিন্তু অতীতের উপরে ফরমাস করা চলে না, তাই বর্তমানের প্রয়োজন—সংযতভাবে দেশের এই নিষ্ঠুর বিরোধের দিকে তাকিয়ে দেখা, আর এর হাত থেকে দেশের লোকদের অব্যাহতি লাভের কি উপায় আছে তারই সন্ধান করা। এই বিরোধ সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার প্রয়োজন আছে, আপাতত সংক্ষেপে এই কথাটা বলা যায় যে, একদিকে মুসলমানের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত শক্তি-দৈন্য যার জন্য নবজাগরণ সহজ হতে পারে নি তার ভিতরে অধিকন্তু সন্দেহশীলতা তাতে হয়েছে দৃঢ়মূল, অন্যদিকে হিন্দুর নবজীবন লাভের অকৃত্রিম প্রয়াস কিন্তু তারই সঙ্গে তার অদ্ভুত আত্মসম্পূর্ণতাবোধ যার জন্য নবজাগরণ সহজেই তার ভিতরে রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন ধরণের মানসিক সৌখীনতায়—এই যে দেশের দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের দ্বিবিধ দুঃখ এর কোনটিই যেন আমাদের সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা এড়িয়ে না যায়। এই দুই সমাজের দুঃখের স্বরূপ যদি দেশের লোকেরা বাস্তবিকই উপলব্ধি করতে পারে তবে সে-দুঃখ জয় করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

ইল্ ফাশিস্‌মো

সুশোভন সরকার

এক

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে-দুইটি মাত্র স্বাধীন রাজ্য এখনও আত্মরক্ষা করছে তার মধ্যে অন্যতম—ইথিওপিয়া অথবা আবিসীনিয়া আজ বিশেষ বিপন্ন। ফাশিস্ট্ ইটালির সাম্রাজ্যবিস্তারের জালে আবিসীনিয়া সম্প্রতি জড়িয়ে পড়েছে—পূর্ব আফ্রিকার এই কোণে খণ্ডযুদ্ধ বোধহয় এখন অনিবার্য, এবং ইটালির সামরিক সজ্জা ও শক্তি যে ইথিওপিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ তারও সন্দেহ নেই। অসহায় আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি নানা দিকে প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষত প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে এই মনোভাব নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। এই উপলক্ষে সম্প্রতি আমাদের দেশে মুসোলীনিপ্রীতি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বহুদেববাদ আমাদের মজ্জাগত—তাই একই নিশ্বাসে মুসোলীনি, হিটলার, লেনিন, স্টালিন, কামাল পাশা, রেজা খাঁ, সুন ইয়াৎ-সেন, মহাত্মা গান্ধী সকলকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে যে-বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবেই ব্যক্তি-বিশেষের স্থান প্রধানত নির্ধারিত হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি উদাসীন থাকি। আবিসীনিয়ার ব্যাপারে ইটালির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে ফাশিস্‌মো বা ফাশিজ্‌মের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও অঙ্গাঙ্গি যোগ বিদ্যমান রয়েছে একথা ফাশিস্ট্ চিন্তা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার পরিচয় আছে সে-ই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে।

ফাশিস্ট্ প্রভাব শুধু ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটেরও একটি প্রধান কারণ ফাশিস্ট্ রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি। যে-তিনটি মহাশক্তির আচরণে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা সম্প্রতি অনেক বেড়েছে, তার মধ্যে ইটালির ফাশিস্‌মোর জন্মভূমি, জার্মানির নাৎসি দলকে ফাশিস্ট্ পর্যায়েই গণ্য করা হয়, এমনকি জাপানের শাসকদেরও ফাশিস্ট্ ভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। অবশ্য এই তিনটি জাতিই নিজেদের বঞ্চিত মনে করে ; আধুনিক জগতে কর্তৃত্বের যে-ব্যবস্থা ও ঐশ্বর্য ভোগ-দখলের যে বন্দোবস্ত রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড কিংবা ফ্রান্সের তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। আবার জাপান, জার্মানি ও ইটালি তা নিয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যায় ব্যবস্থা কিংবা অসহ্য দুরবস্থা এই রাষ্ট্রত্রয়ের

আস্ফালনের আসল কারণ নয়। পৃথিবীতে বঞ্চিত জাতির অভাব নেই, তাদের অধিকাংশই শান্তভাবে জীবন যাপন করে। মহাশক্তিদের মধ্যেও মহাযুদ্ধের পর রাশিয়াকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল অথচ আভ্যন্তরিক সংগঠনে মনোনিবেশই সোভিয়েট রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বলে মেনে নিয়েছে। লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি জাপান, জার্মানি ও ইটালির রাজ্য বিস্তার-প্রচেষ্টার কারণ রূপে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু একদেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলে অন্যদেশবাসীদের তার ভার বহন করতে হবে এ যুক্তিও নিতান্ত ন্যায়সংগত বলা চলে না। প্রাক-ফাশিস্ট্ যুগের জার্মানি ভের্সাই-এর ব্যবস্থার শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সন্ধিভঙ্গ কিংবা যুদ্ধের আয়োজন করেনি। আসল কথা অস্ত্রশক্তির উপাসনা ফাশিস্‌মো গৌরবময় ও মঙ্গলজনক বলেই সর্বদা প্রচার করে এসেছে এবং বিশ্বরাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে ফাশিস্ট্ রাষ্ট্রগুলিই সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে।

উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা কিংবা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সামরিক মনোভাব কিন্তু ফাশিস্‌মোর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয় ; ফাশিজ্‌মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব থেকে ইতিহাসে এদের দেখা পাওয়া যায়। ফাশিস্ট্ মতবাদের আসল বিশেষত্ব খুঁজতে গেলে রাষ্ট্রের নূতন স্বরূপ কল্পনার এবং সমাজের আর্থিক সমস্যা সমাধানের নবপ্রচেষ্টার কথাই প্রথমে বিচার করা উচিত। ইয়োরোপে এমন কি সমস্ত জগতের আধুনিক ইতিহাস ফরাসী বিপ্লব ও পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতির বিশাল পরিবর্তনের সময় থেকে আরম্ভ করা হয়। গত দেড়শ বছরের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দুটি চিন্তাস্রোতের পরিচয় পাই। তার মধ্যে একটির আরম্ভ অষ্টাদশ শতকের উদারনীতিতে এবং তার পরিণতি বর্তমান গণতন্ত্রের আদর্শে। অন্যটিকে সোশালিজ্‌ম্ বা সমাজবাদ আখ্যা দেওয়া হয় ; তার মধ্যে অনেক শাখাপ্রশাখা আছে—সেগুলি সোশাল ডিমক্র্যাসি এবং সাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্ এই দুই পৃথক মতবাদে ভাগ করা চলে। উদারনীতি ও গণতন্ত্র, সোশাল ডিমক্র্যাসি ও সাম্যবাদ, আধুনিক ইতিহাসের এই বিশেষ চিন্তার ধারাগুলি আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত পুরাতন। এদের তুলনায় ফাশিস্‌মো অত্যাধুনিক—এর বয়স পনের বছরের বেশী নয়। ফাশিস্ট্‌দের প্রধান দাবি এই যে তাদের নূতন আন্দোলন ও নববিধান ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস, প্রটেস্টাণ্ট্ ধর্মসংস্কার ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদির সমতুল্য স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে ফাশিস্‌মোর আবির্ভাবকে দেখতে হবে—ফাশিস্ট্‌দের এই দৃঢ় বিশ্বাস। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে ইতিহাসের নূতন যুগ নাকি আরম্ভ হচ্ছে—বিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতকের পুরাতন ধারণাগুলিকে বর্জন করে নূতন আদর্শে গড়ে উঠবে, ফাশিস্ট্ প্রচারের এই হ'ল গোড়ার কথা।

থিওরি হিসাবে ফাসিস্‌মোর কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমেই একটু বিপদ আসে—গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যেমন সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত, ফাশিস্ট্

মতবাদে তার অনুরূপ শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। এর কারণ বলা হয় যে ফাশিজ্‌ম্ কর্মপ্রধান, সুসম্বদ্ধ থিওরিগঠন তার লক্ষ্য বা কাজ নয়। আর একটি কথাও স্মরণযোগ্য—জাতীয় ভাবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ফাশিস্ট্ আন্দোলন নির্ভর করে বলে তাদের পার্থক্য বেশি চোখে পড়ে ; ইটালির বেলা যে-কথা প্রযোজ্য জার্মানির সম্বন্ধে তার সমস্তটা না খাটতে পারে। তবুও ফাশিস্‌মোর সকল দেশেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং মতবাদ হিসাবে তার বর্ণনা অসম্ভব নয়। ইটালির দার্শনিক জেণ্টিলে ফাশিস্‌মোর বিবরণ দিয়েছেন, তিন বছর আগে মুসোলীনি পর্যন্ত ইটালির এক বিশ্বকোষে এর মূল ধারণাগুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মানিতে হিটলার তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভ্যান্‌ডেয়ার ব্রুক, স্টাপেল, রোজেন্‌বার্গ প্রমুখ নাৎসি প্রচারকদের লেখায় ফাশিস্‌মোর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে। অবান্তর নানা কথা বাদ দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

দুই

ঐতিহাসিক পরম্পরার দিক থেকে দেখতে গেলে ফাশিস্‌মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল সোশালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ। মুসোলীনি অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সোশালিস্ট্ হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন এবং ইটালির ফাশিস্টেরা পুনর্গঠিত শ্রমিকসংঘগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করবার পর রাষ্ট্রের নূতন ব্যবস্থাবিধিতে তাদের স্থান অস্বীকার করেনি। এ কথাও সত্য যে হিটলার নিজের দলকে ন্যাশনাল সোশালিস্ট্ নামে অভিহিত করেছেন এবং নাৎসিদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজ্‌মের শত্রু মনে করে। কিন্তু ফাশিজ্‌ম্ যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী এ বিশ্বাস বর্জন করবার কোন বৈধ কারণ নেই।

ইটালি ও জার্মানি উভয় দেশেই সোশালিজ্‌ম্ প্রচারের পথ রুদ্ধ করাই ফাশিস্ট্ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সে-কাজে অন্তত সাময়িক সাফল্য লাভই এখন পর্যন্ত ফাশিজ্‌মের প্রধান কৃতিত্ব বলে গণ্য হচ্ছে। দুই দেশেই সোশালিস্ট্‌দের সঙ্গে সংঘর্ষ ও তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদসাধন ফাশিস্ট্ ইতিহাসের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। জাপানে সোশালিজ্‌ম্ ও শ্রমিক আন্দোলনকে পদদলিত করাই ফাশিস্ট্ ভাবাপন্ন শাসকদের লক্ষ্য—জাতীয়তার মূলমন্ত্র জাপানে এজন্যই প্রচণ্ডভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যত্র যে যে দেশেই ফাশিস্ট্ আন্দোলন মাথা তুলেছে সর্বত্রই এই একই উদ্দেশ্য দলগঠনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্টুগাল, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সকল দেশের ফাশিস্ট্‌দের সমস্ত বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রধান মিল এইখানে।

শুধু আচরণেই এই সোশালিস্ট্‌-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এও নয়—বিশ্বাস ও মতগত পার্থক্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। মার্ক্সবাদের গোড়ার ধারণাগুলি ফাশিস্টেরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। মার্ক্সের মতে প্রলেটেরিয়াট বা মজুর শ্রেণীই ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের মূল উপাদান—সুতরাং সামাজিক প্রগতি এ যুগে সেই শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের উপরেই নির্ভর করবে। ফাশিস্‌মো এ বিশ্বাসকে পরিহার করেছে—ফাশিস্টেরা নীতিহিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকদের মঙ্গলসাধনের দাবি করে। মার্ক্সের প্রধান কথা ছিল এই যে, সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এ শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী ; এই সংঘাতের ফলে শ্রেণীভেদ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণীসংঘর্ষই ইতিহাসের মূলসূত্র হতে বাধ্য। ফাশিস্‌মোর বক্তব্য এর বিরোধী—জাতীয় ঐক্যই আদর্শ ও আসল সত্য, এই জাতিগত স্বার্থের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ লোপ পেয়ে সামঞ্জস্যের রূপ গ্রহণ করে। মার্ক্স ইতিহাসকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা বলা হয় ; এতে আর্থিক ব্যবস্থা ও যে শ্রেণীগত পার্থক্য তার উপর নির্ভর করছে তাই ইতিহাসের মূলসূত্র বলে কল্পিত হয়েছে। ইতিহাসের এই আর্থিক ভিত্তিকে ফাশিস্‌মো প্রমাদ বলে গণ্য করে। ফাশিস্ট্‌ মতে জাতিই (রেস বা নেশন) হচ্ছে ইতিহাসের প্রধান উপাদান। জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির স্থান আর্থিক বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার চেয়ে ঢের উঁচুতে এবং রাষ্ট্র বা স্টেট শ্রেণীবিশেষের আধিপত্যের যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের একটা নৈতিক স্বরূপ এবং বিশিষ্ট সত্তা আছে। বস্তুত মার্ক্সের সকল মতামতের ভিত্তি ডায়ালেক্‌টিক জড়বাদের মধ্যে। এই দার্শনিক মত ফাশিজ্‌ম্‌ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে—নানা-জাতীয় আদর্শবাদ বা ভাববাদই ফাশিস্‌মোর অবলম্বন।

এখানে অবশ্য কথা উঠতে পারে যে ফাশিস্টেরা নিশ্চয়ই মার্ক্সবাদের পরিপন্থী, কিন্তু সোশাল ডিমক্র্যাসির নিরীহতর মতামতের সঙ্গে তাদের বিরোধ কোথায়? ফাশিস্‌মোর সঙ্গে সোশাল ডিমক্র্যাসিরও মিলন কিন্তু সম্ভবপর নয়। মতবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাম্যপন্থার মতন সোশাল ডেমক্র্যাট্‌দেরও আদর্শ হচ্ছে উৎপাদন-পদ্ধতির সকল উপাদানেই সর্বসাধারণের স্বত্বাধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে কিন্তু ফাশিস্‌মোর অবিচলিত আস্থা আছে। তাই সমাজবাদের সকল শাখার যেখানে মূলগত ঐক্য, সমাজের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় সেই সাধারণ স্বত্বের আদর্শের বেলাতেই ফাশিস্‌মোর সঙ্গে এ সমস্ত মতামতের দুস্তর পার্থক্য। কর্মক্ষেত্রেও সোশাল ডিমক্র্যাসির ফাশিস্ট্‌ আমলে কোন স্থান নেই। স্বতন্ত্র শ্রমিকদল গঠন, স্বাধীন শ্রমিকসংঘগুলির অস্তিত্ব, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আদর্শ সম্বন্ধে প্রচারকার্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথাকে আক্রমণ, এর মধ্যে কোনটিই ফ্যাশিস্ট্‌দের মনোমত হতে পারে না। মার্ক্সপন্থীরাই ফাশিস্‌মোর ঘৃণিত শত্রু হলেও আদর্শনিষ্ঠ সোশাল ডেমক্র্যাট্‌দেরও

ফাশিস্ট্দের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। ফাশিজ্ম্ সকল প্রকার সোশালিজ্মেরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

তিন

ফাশিস্ট্ কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সাম্যবাদীদের আচরণে যে-সামান্য সাদৃশ্যটুকু লক্ষ্য করা যায় তা নিতান্ত বাহ্যিক। বিপ্লবে বিশ্বাস, নূতন ধরনের বিরাট দল সংগঠন, বিপ্লবের পর একনায়কত্ব স্থাপন, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে ফাশিস্মো ও সাম্যতন্ত্রের মিল দেখা যায় বটে কিন্তু সে-মিল মোটেই গভীর নয়। উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসের বেলায় এই দুই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরস্পরের বিশেষত্ব বজায় রেখে সোশালিস্ট্ ও ফাশিস্টের মধ্যে মিলন সম্ভব নয়।

কিন্তু গত দেড়শ বছরের ইতিবৃত্তে প্রধান স্থান নিয়েছে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের প্রসার ; আধুনিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে গেলে এদের তুলনায় সোশালিজ্মের প্রভাব এখনও সামান্য। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি ও ডিমক্র্যাসির প্রতিষ্ঠাই যুগধর্ম বলে গণ্য হয়েছে। ডেমক্র্যাটিক মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই সোশালিস্ট্ আদর্শকে গ্রহণ করেনি কিন্তু প্রায় সকল দেশেই বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও বোধহয় তার প্রভাব অন্য সকল মতবাদের থেকে প্রবলতর। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক মনোভাব অস্বীকার করা ফাশিস্মোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলেও এ বিশ্বাসে বিশেষ নূতনত্ব নেই।

গণতন্ত্রের আদর্শেরও প্রতিবাদ এবং উদারনীতি পরিহার ফাশিস্মোর দ্বিতীয় বিশেষত্ব। সেই বৈশিষ্ট্য প্রথমটির তুলনায় অপ্রধান হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের নূতন পরিকল্পনা হিসাবে এর একটা বিশেষ দাবি আছে। ফাশিস্টেরা যখন নবযুগ প্রবর্তনের কথা বলে তখন তারা গণতন্ত্রের অবসানের উপর খুব জোর দেয়। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবী যে-পথে চলেছে তার শেষ নাকি ভ্রান্তি ও ধ্বংসের বিভীষিকায় ; তার প্রকোপ থেকে ফাশিস্মো মানুষ উদ্ধার করবার ব্রত নিয়েছে। বিংশ শতকে সোশালিজ্ম্ এর মতন গণতন্ত্রও পরিত্যাজ্য এ কথা ঘোষণা করতে ফাশিস্ট্দের ক্লান্তি নেই।

গণতান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করবার উদাহরণ ফাশিস্ট্ আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমাগতই পাওয়া যায়। সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন এবং শাসনযন্ত্র অধিকারের পর বিরোধীদলের স্বাধীনতাহরণ ফাশিস্ট্ কর্মপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ, সুতরাং নিয়মতন্ত্রের শত্রু হিসাবেই ফাশিস্ট্দের গণ্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও

শুধু আচরণ নয়, মতবাদ ও বিশ্বাসেও ফাশিস্‌মো গণতন্ত্র ও উদারনীতির থেকে স্বতন্ত্র। অল্প বিশ্লেষণেই এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব।

সংখ্যাধিক্যের কর্তৃত্বের অধিকারই গণতন্ত্রের প্রধান কথা। জনসমষ্টির সাধারণ ইচ্ছাকে রুসো ন্যায্যত সমাজের শাসকশক্তি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, সেই সাধারণ ইচ্ছা নির্ধারণ করবার বৈধ উপায় অবশ্য সংখ্যাধিকের মত গ্রহণ। এই মূলসূত্র নির্ভর করছে এ বিশ্বাসের উপর যে সকল মানুষেরই রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যে সেই অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকার করাই প্রগতির পথ। এই ধারণাগুলিকে ফাশিম্‌মো যে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ফাশিস্ট্ মতানুসারে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রিক অধিকার এবং সংখ্যাধিক্যের মতে রাজ্যশাসন অন্যায় ও অমঙ্গলজনক, তাতে জাতি বা সমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর দেশের প্রকৃত ইষ্টসাধনের জায়গা নেয় নানাবিধ স্বার্থের অনুসন্ধান ও সংঘাত। এইভাবে শ্রেণী বা ব্যষ্টির বিরোধের ফলে সমষ্টির প্রভূত অমঙ্গলসাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব গণতন্ত্রের মূলসূত্রই ভ্রান্ত, তাকে বর্জন করাই উচিত।

জনমতের প্রতিনিধি হিসাবে কোনও পরিষদের শাসনব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এইজন্য ফাশিস্টেরা স্বীকার করে না। পার্লামেণ্ট-জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয় অক্ষম, নয় অনর্থের হেতু ; দেশের শাসনভার তার উপর ন্যস্ত করা মূর্খতার পরিচয় ভিন্ন কিছু নয়। অবশ্য মুসোলীনি ইটালির পার্লামেণ্টকে সংস্কার করলেও তার উচ্ছেদসাধন করেননি ; আর হিটলার মাঝে মাঝে জার্মান জনগণকে ভোটের মারফত তাঁর প্রতি আস্থা প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সংখ্যাধিক্যের প্রভুত্বের অধিকার কিংবা রাজ্যশাসনে প্রতিনিধি-সভার কর্তৃত্ব, এর কোনটিই ফাশিস্‌মোর অঙ্গ নয়। জনমতের প্রতিভূ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শাসকদের দায়িত্ব স্বীকার কিংবা জবাবদিহি দেবার কোন প্রয়োজনও ফাশিস্ট মত গ্রহণ করে না—অবশ্য যখন শাসকেরা ফাশিস্ট্ দলের অন্তর্গত তখনই এ অবাধ স্বাধীনতার দাবি ওঠে।

যে-উদারনীতি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গড়ে উঠেছে তার মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ। এই মতানুসারে সকল লোকেরই কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে—স্ব-মত প্রকাশের স্বাধীনতা এ-জাতীয় অধিকারের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারগুলিকে ফাশিস্‌মো কিন্তু স্বীকার করে না। ফাশিস্ট্ মতে সমাজকে সমষ্টিরূপে কল্পনা করা হয় ;—সমাজ ও সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের মঙ্গল তাই শুধু কথার কথা নয়, সেই মঙ্গলসাধনের অন্তরায় হলে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করাই উচিত। এইভাবে উদারনীতির মূল বিশ্বাসগুলিও ফাশিস্‌মো কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে।

ফাশিস্টেরা অনেক সময় বলে যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এক-জাতীয় বিশ্বাসেরই প্রকারান্তর। উভয়েই ব্যক্তিত্ববাদের প্রকাশ ; সমাজের নিজস্ব অস্তিত্ব ও প্রাণকে

অস্বীকার করে উভয় মতই সমাজকে শুধু ভিন্ন ভিন্ন লোকের একত্রে অবস্থান হিসাবে দেখেছে। এমন কি সাম্যবাদও নাকি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার স্বীকারেই পর্যবসিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের পরিকল্পনা ফাশিস্‌মো তাই নূতনভাবে করতে চেয়েছে। মুশকিল হয় শুধু এইখানে যে সংখ্যাধিক্যের মত এবং শ্রেণীস্বার্থের ধারণা ছেড়ে দিলে সমাজের মঙ্গল ও সমষ্টির কল্যাণ নির্ধারণের উপায় কি থাকে? এ-প্রশ্নের শুধু একমাত্র উত্তর ফাশিস্‌মোর পক্ষে সম্ভব—সে উত্তর, ফাশিস্ট্ ইচ্ছার কাছে সকলের আত্মসমর্পণ।

চার

উদারনীতি, গণতন্ত্র, সোশাল ডিমক্র্যাসি, সাম্যবাদ—এ সমস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ কি এই যে ফাশিস্‌মোর যন্ত্রযুগ ও ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থাতে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? গত দেড়শ বছরে যে-সমস্ত ধারণা ক্রমে ক্রমে জয়যুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো সকল সময়েই শোনা গেছে—ফাশিজ্‌ম্ কি শুধু সেই প্রাচীন প্রতিকূলতার পুনরাবৃত্তি? ফাশিস্টেরা এ কথা স্বীকার করে না—তাদের মতে এ আন্দোলন নূতন উদ্যম, এর মধ্যে নবজীবনের প্রেরণা রয়েছে। ফাশিস্‌মো পুরাতন ব্যবস্থায় পুনস্থাপনা নয়, প্রগতির পথে সময়োপযোগী নবযুগের সূত্রপাত নাকি এর লক্ষ্য।

ফাশিস্ট্ মতবাদ এইজন্য সযত্নে পুরাতন যুগের ধারণাগুলির থেকে নিজের পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসী বিপ্লবের আগে ইয়োরোপে প্রায় সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখনকার রাজারা ভগবৎদত্ত অধিকারে রাজ্যশাসন করবার দাবি করতেন। এ অধিকার ফাশিস্‌মো স্বীকার করে না, রাজতন্ত্রের দিকেও তার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। ইটালিতে রাজসিংহাসন রক্ষার কারণ রাজতন্ত্রে বিশ্বাস নয়—সাময়িক সুবিধা ও ইটালির বিশেষ অবস্থাই মুসোলীনির এ নির্ধারণের মূলে রয়েছে। অবস্থার বিপর্যয়ে নাৎসিরাও কাইজারবংশকে সিংহাসনে ফিরিয়ে আনতে পারে, কিন্তু সেকালের সে-রাজভক্তি ও রাজতন্ত্রে বিশ্বাস অন্তত হিটলারের অনুচরদের বিশেষত্ব নয়। রাজতন্ত্র ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য সেকালের সমাজে উল্লেখযোগ্য ছিল—উত্তরাধিকারসূত্রে আভিজাত্য-প্রথা দেশের শীর্ষস্থান তখন অধিকার করত। ফাশিস্ট্ মতবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী হলেও এ-জাতীয় পুরাতন আভিজাত্যে তার বিশেষ আস্থা নেই। অভিজাত শ্রেণীর পুরাতন মর্যাদা এবং সেকালের ফিউডাল বিধিব্যবস্থা ও দাবিগুলির সমর্থন ফাশিস্‌মোর মধ্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, মধ্যযুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির যে-আধিপত্য ছিল, ফাশিস্টেরা তার

পুনরুত্থানের বিরোধী। ফাশিস্‌মো ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য ফাশিস্ট্‌দের চিহ্ন নয়, কিন্তু চার্চের প্রভুত্ব ও স্বতন্ত্র প্রভাববিস্তার তাদের মনঃপূত হতে পারে না। ফাশিজ্‌মের প্রকৃত ধর্ম ফাশিস্ট্‌ স্টেটপূজা। রাষ্ট্রের একটা নৈতিক রূপ ও স্বতন্ত্র জীবন আছে, ধর্ম ও নীতিতে বিশ্বাস ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, জাতির জীবনে জাতির একটা বিশেষ ধর্ম ও তদুপযোগী ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন—ফাশিস্ট্‌ মতামত এ সব বিশ্বাসের সমর্থক। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান ফাশিস্ট্‌দের কাম্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। ইটালিতে ক্যাথলিক ধর্মকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবন থাকতে পারে না, কিন্তু ফাশিস্ট্‌, রাষ্ট্রশক্তি রোমান ক্যাথলিক চার্চের উপর বিশেষ আস্থাবান বা নির্ভরশীল নয়। জার্মানিতে নানাভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নাৎসি দলের করায়ত্ত করার চেষ্টা চলছে। ফাশিস্‌মোর থিওরি অনুসারে রাষ্ট্রই ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে বিরাজিত হবে—অতএব সেখানে পূর্বকালের চার্চ-প্রতিপত্তির স্থান কোথায়?

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে যে-রোমান্টিক, ভাবুক ও ধর্মনিষ্ঠ দার্শনিকদের উদয় হয়েছিল, তাঁদের মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণ এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-বিরোধের সঙ্গে ফাশিস্ট্‌ মতবাদের সুতরাং পার্থক্য আছে। উনবিংশ শতকের কোন কোন লেখককে ফাশিজ্‌মের অগ্রদূত বলে অভিনন্দন করা হয় বটে—কিন্তু ফাশিস্ট্‌ আন্দোলন বর্তমান যুগের বিশেষ অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তার আসল লক্ষ্য মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন নয়, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজেরই অস্তিত্বরক্ষা। ধনতন্ত্রের উদয় ও বিকাশের যুগে ডিমক্র্যাসিতে অশেষ সুবিধা ছিল—এখন সমাজতন্ত্রাভিমুখী বিপ্লবের হাত থেকে ধনিক কর্তৃত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাই অনেক দেশে ফাশিস্‌মো নামক বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি করেছে। একমাত্র জাপানের বর্তমান অবস্থার মধ্যে ফাশিস্‌মোর কয়েকটি বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগোপযোগী ধারণার অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়।

পাঁচ

ফাশিস্‌মোর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে—সকল প্রকার সোশালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ, গণতন্ত্র ও উদারনীতি বর্জন, এবং মধ্যযুগের ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের থেকে পার্থক্য। এই বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটি অন্য মতবাদের থেকে ফাশিজ্‌মের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে ফাশিস্ট্‌দের অন্য বিশিষ্ট বিশ্বাসের উল্লেখও প্রয়োজন।

প্রথমেই ফাশিস্টদের নেতৃত্বের ধারণার কথা মনে পড়ে। মানুষে সকলে সমান না, সকলের সমানাধিকার কিছু বাঞ্ছনীয় নয়, সংখ্যাধিক্যের আধিপত্য অমঙ্গলের আকর। জাতি ও দেশের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। নেতার আবির্ভাব হলে সকলের কর্তব্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্মে আত্মনিয়োগ। এই জন্য জার্মানিতে হিটলারের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত হয়েছে, এই জন্যই ইটালিতে উচ্চৈঃস্বরে বলা হচ্ছে যে মুসোলীনির ভুল কখনও হতে পারে না।

কিন্তু জাতির নেতা সম্পূর্ণ একক নন। তিনি বিশ্বাসীদের প্রতিভূ মাত্র, তাঁর পশ্চাতে সুসম্বদ্ধ পার্টি বা দল বিরাজ করছে। ফাশিস্‌মোর প্রধান অবলম্বন আসলে এই দল—নেতা শুধু এর মুখপাত্র ও অধ্যক্ষ। ফাশিস্টদের দলসংগঠন তাদের আধুনিকত্বের পরিচায়ক, এ ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি সাম্যবাদীদের অনুকরণ বলেই সন্দেহ হয়। আধুনিক কালের এ-জাতীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ গণতান্ত্রিক দেশের দলগুলি যে নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম সে-সম্বন্ধে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। মুসোলীনি কিংবা হিটলারের ব্যক্তিত্ব যে ইটালি বা জার্মানির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তত হিটলার যে অনেক সময় নেতা হয়েও ক্রীড়নক মাত্র তা মনে করা অযৌক্তিক নয়।

নেতা ও দলের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে একাধিপত্য স্থাপন ফাশিস্‌মোর উদ্দেশ্য। এই একনায়কত্ব জাতির ঐক্য ও মঙ্গলসাধনের জন্য। সাম্যবাদীদের অধিনায়কত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে ফাশিস্ট্ ব্যবস্থা সাময়িক নয়, এ প্রথা শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছবার সহায় না—এই ব্যবস্থাই চিরকালের আদর্শ ও সর্বোত্তম বিধি। ফাশিস্টেরা তাই ভবিষ্যৎ সামাজিক ব্যবস্থাকল্পনার মধ্যেও গণতন্ত্রের ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান নির্দেশ করে না। ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র totalitarian বা সমগ্রগ্রাসী—তার এই বিশেষত্ব শুধু সাময়িক নয়, ফাশিস্‌মোর আদর্শে এ চিহ্ন চিরকালের জন্য।

কিন্তু তাই বলে দেশের শাসনযন্ত্রে যে লোকমত প্রকাশের কোন উপায় একেবারেই থাকবে না তা নয়। জনসাধারণের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকার অস্বীকৃত হলেও তাদের সহযোগিতা আবশ্যক। বিশেষত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পদানত রাখা সম্ভব না। শ্রেণীগত পার্থক্য ও স্বার্থের সংঘাতও ফাশিস্ট্ মতবাদে একেবারে অগ্রাহ্য হয়নি। এই সব নানা কারণে ইটালিতে নূতন ভাবে, রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা চলছে। শ্রমিক ও ধনিকদের পৃথক পৃথক সংঘ গঠিত হচ্ছে—তাদের সহযোগিতায় দেশের সকল ব্যবসা পরিচালিত হবার কথা। তবে বিরোধ উপস্থিত হলে স্টেটের মধ্যস্থতা অবশ্যই মানতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি যে সে-ক্ষেত্রে কোন্ দিক নেবে তা অনুমান করা শক্ত নয় কিন্তু ফাশিস্টেরা বলে যে রাষ্ট্র ও তার কর্মচারীরা শ্রেণীস্বার্থের উপরে উঠতে পারে। দেশের শাসনযন্ত্রও সাক্ষাতভাবে এই সংঘগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর খানিকটা নির্ভর

করবে। এইরূপ নূতন ব্যবস্থাকে Corporative State আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে ধনিক কর্তৃত্ব খর্ব বা ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার হ্রাসের কোন সম্ভাবনাই নেই।

নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন আদর্শে দলগঠন, সমগ্রগ্রাসী একাধিপত্য এবং শাসনযন্ত্র সংস্কার—এ সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হ'ল জাতির ঐক্যবোধ বিস্তার ও মঙ্গলসাধন। দেশ বা জাতির মঙ্গল কিসে সে-কথা নির্ধারণের ভার অবশ্য ফাশিস্ট্ সম্প্রদায়ের উপর—তা নিয়ে বাদানুবাদের স্বাধীনতা এখানে নেই। জনসাধারণের মধ্যে এ বিশ্বাস সংক্রামিত করতে হবে যে নেতা ও দল এবং তাদের আজ্ঞানুবর্তী রাষ্ট্রশক্তি জাতির মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই করছে না। এ-বিশ্বাস প্রচারের উপায় ফাশিস্‌মোর প্রসার ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতীয়তাবোধকে এত প্রবল করতে হবে যে সে-ঐক্যের পরিপন্থী সমস্ত কিছুকেই বিনষ্ট করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। পরিপূর্ণ অকুণ্ঠ অন্ধ ন্যাশনালিজ্‌ম তাই ফাশিস্ট্‌দের কাম্য—এর প্রতাপ যত বেশী হবে ততই জনসাধারণের মধ্যে ফাশিস্ট্ কর্তৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেশী। জাতীয়ভাবের এই রূপ আজ জাপানে এত প্রকট বলেই জাপান ফাশিস্‌মোর এত নিকটে এসে পড়েছে।

জাতীয়তা-বোধের পুষ্টিসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য আবার আসলে আভ্যন্তরিক শ্রমিক অসন্তোষের হ্রাস। ফাশিস্ট্ মতে শ্রেণীবিদ্বেষ জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় মাত্র, অথচ শ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করাও সম্ভব নয়। এ-বিপদ থেকে উদ্ধারের দুটি উপায় আছে—এক, জাতীয় ঐক্যবোধকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাতে জনসাধারণ স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ ও অভাব বরণ করে নেবে। যুদ্ধের সময় এ মনোভাব সর্বত্র দেখা যায় ; প্রশ্ন শুধু এই যে, এ উচ্ছ্বাস ক্ষণিক উত্তেজনা থেকে চিরন্তনের পর্যায়ে তোলা যায় কিনা। দ্বিতীয় উপায়,—ধনতন্ত্রের কোন কোন দিকে অল্প সংশোধন, যার ফলে শ্রমিক ও নির্ধনদের আস্থা ও আশাভরসা ফিরিয়ে আনা যায়। এজন্যই ধনিকপ্রবরদের রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীনে আনা, কৃষকদের সাহায্য ও সন্তোষসাধন, ধ্বংসোন্মুখ নিম্নস্তরস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকানির্বাহের পথপ্রদর্শন ইত্যাদি প্রচেষ্টার উদ্ভব। দুঃখের কথা এই যে, ইটালি ও জার্মানিতে এখন পর্যন্ত এ সদিচ্ছা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে বলে জানা যায়নি। ইটালিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ গত বারো বছরে ঠিক অন্য দেশের মতনই চলেছে ; জার্মানিতেও ধনিক শ্রেণীর প্রতিপত্তি কিছু কমেছে বলে জানা যায় না।

ধনতন্ত্র বজায় রেখে জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করবার এক উপায় অবশ্য রাজ্যবিস্তার—এইজন্য উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্যজয়ের ইচ্ছা ফাশিস্‌মোর এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক ফাশিস্ট্ রাজ্যের অবশ্য প্রসারের বিশেষ লক্ষ্য ও দিক থাকে। কিন্তু বিভিন্ন উদ্যমগুলি এক ঝোঁকেরই অন্তর্গত। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে

ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এমন শক্তি আছে, এই দেশগুলির সম্বল ও সঞ্চয় এত বেশি যে এখানে রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজন নেই, ফ্যাশিজ্‌ম্‌ও এদের কাছে অনাবশ্যক। ইটালি, জার্মানি ও জাপানের কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থা এখন এমন যে সেখানে ফাশিজ্‌মের বিশেষ স্থান আছে এবং এ রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসের একটা প্রচণ্ড প্রলোভন রয়েছে। সেই ঝোঁককে মুসোলীনি সমর্থন করেন এই বলে যে, বর্তমান ব্যবস্থাতে কতকগুলি দেশ বঞ্চিত ও নিগৃহীত হচ্ছে—তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করবার একটা দাবি আছে। তাঁর যুক্তিতে অবশ্য বিপদ এই যে ন্যায় অন্যায় বিচার করবার উপায় আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দুর্লভ। যদি প্রতি জাতি নিজের দাবির নিজেই বিচার করে তাহলে মতভেদেরও অবসান হবে না, যুদ্ধবিগ্রহও চিরকাল মানুষের সাথী থেকে যাবে।

এ-প্রসঙ্গে ফাশিস্টেরা বলে থাকে যে যুদ্ধ সত্য সত্যই চিরন্তন, তাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় মানুষের নেই। শুধু তাই নয়, ফাশিস্ট্ মতানুসারে এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই—সংগ্রামস্পৃহা মঙ্গলজনক ও উন্নতির সহায়ক। যুদ্ধ ভিন্ন মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি কখনও স্ফূর্তি পায় না—দেশ ও জাতির জন্য প্রাণ-বিসর্জনে প্রবৃত্ত হওয়া মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। যুদ্ধের প্রতি বিরাগ ব্যক্তির পক্ষে কাপুরুষতা, জাতির পক্ষে বার্ধক্য ও অসুস্থতার চিহ্ন। জেনিভার রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে তাই ফাশিস্ট্‌দের অবজ্ঞার অন্ত নেই এবং সকল দেশেই এই অবজ্ঞা সাধারণত এখন ফাশিস্ট্ মনোভাবেরই পরিচায়ক। জাপান ও জার্মানি লীগ ত্যাগ করেছে, ইটালিও আজ তাদের অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত। মাঞ্চুকুয়োর বেলায় জাপান, ভের্সাই সন্ধি লঙ্ঘনের সময় জার্মানি রাষ্ট্রসংঘকে অবহেলা ও অমান্য করেছে। ইটালি কর্ফু দ্বীপের বহুদিন আগে ও সম্প্রতি আবিসীনিয়ার গোলযোগে সেই একই মনোভাব দেখিয়েছে। অবশ্য যুদ্ধের নৈতিক উপকারই যে শুধু ফাশিস্ট্‌দের মুগ্ধ করে তা নয়। 'বঞ্চিত' মহারাষ্ট্রগুলি নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে স্বভাবতই ইচ্ছুক ; আর যুদ্ধের সম্ভাবনা কিংবা যুদ্ধ এসে পড়লে জাতীয় ঐক্যের নামে আভ্যন্তরিক বিরোধ চেপে রাখা যে বেশি সহজ হয়ে আসে এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

ছয়

উগ্র জাতীয়তা-বোধ যখন ফাশিজ্‌মের একটি প্রধান অঙ্গ, তখন বিভিন্ন ফাশিস্ট্ দলের মধ্যে পার্থক্য, এমন কি তাদের স্বার্থের সংঘাত পর্যন্ত কিছু বিচিত্র নয়। তাই অস্ট্রিয়ার নাৎসি দলের সঙ্গে অন্য ফাশিস্ট্‌দের সংঘর্ষ হয়, আর ইটালি ও জার্মানি, কি ইটালি ও জাপান পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবও পোষণ করতে পারে। এই জন্যই

আবার ইটালির ফাশিস্ট্ ও জার্মানির নাৎসি ঠিক সব ব্যাপারে একমত না। এই দুই দেশের আন্দোলন দুইটির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আসলে এদের চিন্তার গভীর মিলই উল্লেখযোগ্য, পার্থক্যগুলি চমকপ্রদ হলেও তাদের ঐতিহাসিক মূল্য কম।

ইটালিয় ফাশিস্ট্দের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে প্রধান হ'ল রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্বের গৌরব। মুসোলীনির অনুবর্তী দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতিহাসে ইটালির জন্য নেতার আসন নির্দিষ্ট রয়েছে। পুরাকালে রোমান রাজ্য, মধ্যযুগে পোপে আধিপত্য, তারপরে রেনেসাঁস, উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনরুত্থানের পথপ্রদর্শন, বর্তমান শতকে ফাশিজ্মের সৃষ্টি—এ সকলই সভ্যতার ইতিহাসে ইটালির দান। সেকালের রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ তাই আজকে ইটালির বাঞ্ছিত পন্থা। সাম্রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা এতে আরো প্রবল হয়েছে। মুসোলীনির আস্ফালন ও সকল দেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এ মনোভাবেরই হাস্যাস্পদ ফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ফাশিস্মো নামটি পর্যন্ত প্রাচীন রোমের রাজশক্তির প্রতিভূ দণ্ডগুচ্ছ থেকে গৃহীত।

পক্ষান্তরে জার্মান নাৎসিদের বিশিষ্ট বিশ্বাস হচ্ছে নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। গত শতকে চেম্বারলিন নামক ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছিলেন যে, নর্ডিক টিউটনেরা নাকি বিধাতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই নর্ডিকেরাই আসল খাঁটি আর্য বলে এখন দাবি করা হচ্ছে। জার্মানেরা তাদের প্রধান বংশধর—এখন জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারলেই জার্মানি জগতের মুকুটমণিরূপে শোভা পাবে। রেস সম্বন্ধে এ-ধারণা নাৎসিরা এখন সোৎসাহে প্রচার করছে। এতে জার্মানির পুরাতন য়িহুদি-বিদ্বেষে ঘৃতাহুতি পড়েছে। য়িহুদিরা জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করে—তাদের নীতি, ব্যবহার, চরিত্র, চিন্তা, সমস্তই কলুষিত একথা হিটলার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন। তার উপর তারা বিজাতীয়, আর্থিক জগতে নাকি সব অত্যাচারের তারাই মূল, এমন কি মার্ক্সবাদ তাদেরই গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় মাত্র। য়িহুদি-বিদ্বেষ ছাড়া অন্য ব্যাপারেও নাৎসিদের জাতি সম্বন্ধে বিশেষ দম্ভ প্রকাশ পায়। সকল জার্মানকে এক রাষ্ট্রের মধ্যে আনতে হবে, অতএব হিটলারি আমলে সাগরপারে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বিস্তার লাভের ইচ্ছাই বেশি, কারণ তাতে বিদেশী জার্মানদের পিতৃভূমিতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ধর্মের বেলাও সেই জাতির বৈশিষ্ট্য মাথা তুলেছে ; ফলে জার্মান ক্রিশ্চান বলে খৃষ্টধর্মের এক নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে—তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোন কোন নাৎসি বিশুদ্ধ জার্মান দেবতা হিসাবে ওডিন, থর, ইত্যাদি সেকালের দেবদেবীর পূজা প্রবর্তন করতে উদ্যত হয়েছে।

সাত

জাতিগত বিভিন্নতার ফল সুবিস্তৃত হলেও তাদের বাদ দিয়ে ফাশিস্‌মোর মূলসূত্রের ব্যাখ্যাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। ফাশিজ্‌মের আবির্ভাবের কারণ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিতর্ক এখানে অবান্তর—তবু শেষ করবার আগে তার উল্লেখ করছি।

ফ্যাশিস্ট্‌দের অভ্যুদয়ের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রতি দেশে সে-ইতিবৃত্ত অনেকখানি বিভিন্ন। কিন্তু তার মধ্যে কোন ঐক্য খুঁজতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সে-আন্দোলনের মূল কারণ নানা স্থানে সোশালিস্ট্‌ আধিপত্য স্থাপনের আশু সম্ভাবনা। ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার প্রয়াস হিসাবেই ফাশিস্‌মোকে এখন ঐতিহাসিকেরা ব্যাখ্যা করছেন। তবে সব দেশে এর আন্দোলনের সাফল্য সমান সম্ভব নয়। যেখানে গণতন্ত্র বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, যেদেশে উদারনীতি জনমতের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে, সেখানে ফাশিস্‌মোর প্রতিপত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করে যে ফাশিস্ট মতবাদ ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মাত্র। সেই জন্যই নাকি ফাশিস্টেরা কৃষক ও নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি এত সদয়। অর্থাৎ অল্প লোকের হাতে আর্থিক ক্ষমতা এসে পড়ার যে-একটা ঝোঁক ধনতন্ত্রে আছে, ফাশিস্‌মো তাকে বিনাশ করে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়। এ কথা বিস্তর শোনা যায় অবশ্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইটালি ও জার্মানির আধুনিক অভিজ্ঞতায় এদিকে কোনও ফল পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না। অতীত অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য।

ফাশিস্‌মোর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক কতকগুলি অপরিহার্য বিপদ আছে, বিভিন্ন দেশের ফাশিস্ট্‌দের মধ্যে সংঘর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়ত, ফাশিস্ট্‌দের কর্মপদ্ধতি দুর্বল—বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত দূরীকরণ সহজ কাজ নয়। জনগণের উপর নির্ভর করে ফাশিস্ট্‌ দল গঠিত হয় বলে তাদের বহুকাল ধরে হাতে রাখা সুকঠিন, জনসাধারণকে ও শ্রমিকদের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব থেকে বরাবরের মতন বঞ্চিত রাখাও দুঃসাধ্য। যোগ্য নেতা সকল সময়ে পাওয়া যাবে কিংবা নানাবিধ লোকের সমষ্টিতে যে-দলের গঠন তার একপ্রাণতা যে নষ্ট হবে না একথা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। এইসব কারণেই মনে হয় যে ফাশিস্‌মো আধুনিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়, এমন কি সর্বত্রই যে এ প্রথা গণতন্ত্রের স্থান অধিকার করবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

কার্তিক ১৩৪২—(১৯৩৫)

রামকথার প্রাক্-ইতিহাস

সুকুমার সেন

বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীতে রামকথা

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রামকথা পাওয়া যায় সংস্কৃতে পালিতে ও প্রাকৃতে। ভারতবর্ষের বাইরেও আশেপাশে রামকথার প্রসার ঘটেছে। তার মধ্যে প্রাচীনত্বে ও মূল্যবত্তায় পালি ও খোটানী রামকথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিব্বতী ও সিয়ামী রামকথায়ও কিছু বিশেষত্ব আছে। দ্বীপময় ভারতের রামকথায়ও আছে।

পালিতে তিনটি জাতক-কাহিনী পাওয়া গেছে। পালিতে বলা ঠিক হল না। শুধু একটির মূল পালি পাঠ পাওয়া গেছে। (এটিকে আমি জাতক 'ক' বলে নির্দেশ করছি।) আর দুটির মূল পাঠ পাওয়া যায় নি, চীন ভাষায় অনুবাদ পাওয়া গেছে। প্রাচীনতর অনুবাদটিকে আমি জাতক 'খ' বলছি। অপরটিকে জাতক 'গ' বলছি।)

জাতক 'ক' দুটি পাঠে মিলেছে। একটি প্রাচীন পাঠ ; সেটি সুত্তপিটকের খুদ্দক-নিকায়ের অন্তর্গত, তেরটি শ্লোকের সমষ্টি। অপরটি গদ্যে-পদ্যে বিস্তারিত জাতকথবণ্ণনায় (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী) আছে। জাতকসংগ্রহে এই জাতকের সংখ্যা ৪৬১।

খুদ্দক-নিকায়ের পাঠে গল্পের আগা ও গোড়া নেই। দশরথের মৃত্যুর পরে ভরত লোকজন নিয়ে এসেছেন রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কুটীরে তখন রাম একা। সীতা ও লক্ষ্মণ ফলমূলের যোগাড়ে গেছেন। তাঁরা ফিরে এলেন। রাম তাঁদের যা বললেন তাই নিয়ে শুরু। সীতা ও লক্ষ্মণ আসতেই রাম বললেন, 'লক্ষ্মণ সীতা, তোমরা জলে নাম। এইমাত্র ভরত এসে বললে রাজা দশরথ মারা গেছেন।' (শুনে লক্ষ্মণ ও সীতা শোককাতর হল। কিন্তু রামের দেহে-মনে কোন বিকার হল না। তা দেখে ভরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে,) 'কিসের প্রভাবে রাম আপনার মনে শোক হচ্ছে না? পিতার মরণবার্তা শুনেও বিচলিত হচ্ছেন না কেন?' তখন নয়টি শ্লোকে রাম মানবজীবনের অনিত্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তত্ত্বকথা শুনিয়ে শেষে বললেন, 'যথাসময়ে আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে কর্তব্য সম্পন্ন করব।' শেষ শ্লোকটি এই

> দস বস্সসহস্সানি সট্‌ঠি বস্সসতানি চ।
> কম্বুগ্‌গীবো মহাবাহু রামো রজ্জম্ অকারয়ি ॥

'দশ হাজার ষাট শ বছর ধরে কম্বুগ্রীব মহাবাহু (অর্থাৎ সুপুরুষ বীর) রাম রাজ্য করেছিলেন।'

জাতকত্থবণ্ণনায় শ্লোকগুলিকে কেন্দ্র করে তার উপর গদ্যের আস্তরণ বিছিয়ে গল্পের সম্পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। এ আস্তরণের গাঁথুনি নবীন হলেও বস্তু প্রাচীন। গল্পটির অনুবাদ দিই। রামকথার ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্ উপাদান।

ক. অতীত কালে বারাণসীতে দশরথ মহারাজা সৎপথে থেকে ধর্ম অনুসারে রাজ্যশাসন করতেন। তাঁর যোল হাজার পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ অগ্রমহিষী দুই পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেছিলেন। বড় ছেলের নাম রাম পণ্ডিত, দ্বিতীয় ছেলের নাম লক্ষ্মণ পণ্ডিত আর মেয়ের নাম সীতা দেবী। পরে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হল। দীর্ঘকাল-শোকাহত রাজা অমাত্যদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে পত্নীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করে অন্য এক মহিষীকে অগ্রমহিষী নির্বাচন করলেন। সে ছিল তাঁর প্রিয় এবং মনের মতন। সেও পরে এক পুত্র প্রসব করলে, তার নাম রাখা হল ভরতকুমার। পুত্রস্নেহে রাজা তাকে বললেন, 'তোমাকে বর দিচ্ছি নাও।' সে তখন বর নিতে রাজি হয়ে তখনই বর না নিয়ে পরে পুত্রের ষষ্ঠ বর্ষ বয়স হলে রাজাকে বললে, 'দেব, তুমি আমাকে ছেলের জন্যে বর দিতে চেয়েছিলে, এখন তা দাও।' রাজা তুড়ি মেরে তর্জন করে বললেন, 'ভাগ্ ছোটলোক। আমার দুটি ছেলে আগুনের ঝাড়ের মতো জ্বলজ্বল করছে। তাদের দুজনকে মেরে তোর ছেলের জন্যে রাজ্য চাস্।' ভয় পেয়ে সে শয়নকক্ষে গিয়ে (রইল), তার পরে সে দিন-দিনই রাজার কাছে রাজ্য চাইতে লাগল। রাজা তাকে সে বর না দিয়ে ভাবলেন, স্ত্রীলোক নামেই অকৃতজ্ঞ, মিত্রদ্রোহী। এ আমার বিরুদ্ধে জাল চিঠি দিয়ে অথবা ঘুষ খাইয়ে ছেলে দুটিকে হত্যা করতে পারে। তিনি ছেলে দুটিকে ডাকিয়ে এনে ব্যাপার বুঝিয়ে বললেন, 'বাবা, এখানে থাকলে তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে। তোমরা কোন সামন্তরাজ্যে অথবা বনে গিয়ে (থাকো গে), আমার অন্ত্যেষ্টিকালে এসে পৈতৃক রাজ্য দখল করো।' এই বলে আবার গণককে ডাকিয়ে নিজের আয়ু-শেষ-কাল জানতে চেয়ে, 'আরও বারো বছর কাটবে' এই কথা শুনে, বললেন, 'বাবা, আজ থেকে বারো বছর কাটলে পরে এসে ছাতা ধরিয়ো।' 'বেশ' বলে তারা পিতাকে বন্দনা করে কাঁদতে কাঁদতে প্রাসাদ থেকে অবতরণ করলে। 'আমিও ভাইয়েদের সঙ্গে যাব', বলে সীতা দেবী পিতাকে বন্দনা করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। তারা তিনজন, জনতা-পরিবৃত, নিষ্ক্রান্ত হয়ে জনতাকে ফিরিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে হিমালয়ে প্রবেশ করে ভালো জল ভালো ফলমূল[1] আছে এমন অঞ্চলে আশ্রম নির্মাণ করে ফলমূল খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। 'তুমি

১। মূলে আছে 'ফলাফল', অর্থাৎ ফল এবং যা ফল নয়—মূল হতে পারে জন্তুর মাংসও হতে পারে।

আমাদের পিতার মতো হয়েছ। সুতরাং আশ্রমেই থাকো। আমরা ফলমূল জোগাড় করে তোমাকে পোষণ করবো'—এই বলে লক্ষ্মণ পণ্ডিত আর সীতা রামের কাছে কথা নিলে। তারপর থেকে রাম পণ্ডিত আশ্রমেই থাকেন। আর দুজনে ফলমূল আহরণ করে তাঁর পরিচর্যা করে।

এই রকমে তাঁরা ফলমূল খেয়ে বাস করছেন। পুত্রশোকে দশরথ মহারাজা নবম বৎসরে মারা গেলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টি হয়ে গেলে পর দেবী আপনার পুত্র ভরতকুমারকে বললেন, 'ছাতা ধরাও।'

'আমার ভাই রাম পণ্ডিতকে অরণ্য থেকে আনিয়ে ছাতা ধরাব।'

(এই কথা বলে) পঞ্চ রাজরত্ন—চামর, উষ্ণীষ, খড়্গ, ছত্র ও পাদুকা—নিয়ে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তাঁর বাসস্থানে পৌঁছে একটু দূরে শিবির স্থাপন করে কয়েকজন অমাত্য সঙ্গে নিয়ে, লক্ষ্মণ পণ্ডিত ও সীতা দেবী যখন বনমধ্যে গিয়েছিল সেই সময়ে, আশ্রম স্থানে প্রবেশ করে আশ্রম স্থানের দ্বারদেশে ভালো করে গড়া সোনা-রূপার প্রতিমার মতো নিরাতঙ্ক সুখাসীন রাম পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বন্দনা করে এক পাশে বসে রাজার খবর জানিয়ে অমাত্যদের সঙ্গে পায়ে পড়ে ভরতকুমার কাঁদতে লাগল। রাম পণ্ডিত শোক প্রকাশ করলেন না, কাঁদলেন না। একটুও ইন্দ্রিয়বিকার তাঁর হল না।

ভরত বসে বসে কাঁদছে এমন সময়ে সন্ধ্যাবেলায় অপর দুজন ফলমূল নিয়ে এল। রাম পণ্ডিত ভাবলেন, 'ওরা ছেলে-মানুষ আমার মতো সহ্য করবার শক্তি ওদের নেই, হঠাৎ যদি বলা হয়, তোমাদের বাবা আর নেই, শোক সহ্য করতে না পেরে ওদের বুক ফেটে যেতে পারে। ছল করে ওদের জলে নামিয়ে খবর শোনাব।' তখন ওদের সামনে এক জলাশয় দেখিয়ে, 'তোমরা অনেক দেরি করে ফিরেছ, এই তোমাদের শাস্তি হোক,—ওই জলে নেমে থাকো গে।' এই (ভাব জানিয়ে) শ্লোকার্ধ বললেন। তারা জলে নেমে রইল। তখন তিনি শ্লোকের অপরার্ধ বললেন। (পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনে লক্ষ্মণ ও সীতা অত্যন্ত শোককাতর হল, অমাত্যেরা তাদের পরিচর্যা করে সুস্থ করলে। রামের উদাসীনতা দেখে ভরত বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাম তার উত্তর দিলেন।—এই কথা প্রাচীন শ্লোকে আছে)।

সমবেত সকলে রাম পণ্ডিতের সংসারের অনিত্যতা-প্রকাশক ধর্ম-উপদেশ শুনে নিঃশোক হল। তারপর ভরতকুমার রাম পণ্ডিতকে বন্দনা করে, বললে, 'বারাণসী রাজ্য গ্রহণ করুন।'

'ভাই, লক্ষ্মণ আর সীতা দেবীকে নিয়ে রাজ্য পালন করো গে।'

'দেব, আপনি তাহলে কী (করবেন)?'

'ভাই, আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, বারো বছর কেটে গেলে ফিরে এসে তুমি রাজ্য করো। আমি যদি এখনই যাই তবে তাঁর কথামত কাজ করব না। তাই আরো তিন বছর কাটিয়ে আমি ফিরবো।'

'এতকাল কে রাজ্য করবে?'

'তুমি কর।'

'না আমরা করব না।'

'তাহলে আমার না আসা পর্যন্ত এই পাদুকা করবে।'

নিজের ঘাসের চটি (পা থেকে) খুলে দিলেন রাম। তারা তিনজন পাদুকা নিয়ে পণ্ডিতকে বন্দনা করে লোকজন পরিবৃত হয়ে রাজধানীতে এল।

তিন বছর ধরে পাদুকা রাজ্য করলে। তৃণ-পাদুকা রাজ-সিংহাসনে রেখে অমাত্যেরা বিচারকার্য চালায়। যদি অবিচার হয় তবে পাদুকা দুপাটিতে পরস্পর ঠোকাঠুকি হয়। সেই ইঙ্গিত বুঝে পুনর্বিচার ঘটে। বিচার ঠিক মতো হলে পাদুকা দুটি নিঃশব্দে থাকে।

পুরো তিন বছর কেটে গেলে পর রাম পণ্ডিত অরণ্য পরিত্যাগ করে বারাণসীতে এসে এক উদ্যানে প্রবেশ করলেন। তিনি এসেছেন জেনে ভরতকুমার দুজন অমাত্য-পরিবৃত হয়ে উদ্যানে গিয়ে সীতাকে অগ্রমহিষী করে দুজনকেই অভিষিক্ত করলে। এই ভাবে অভিষেক পেয়ে মহাসত্ত্ব (রাম) সাজানো রথে চড়ে অনেক লোকজন নিয়ে নগরে প্রবেশ ও (নগর) প্রদক্ষিণ করে শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ সুচন্দ্রকের সব চেয়ে উঁচু তলায়[১] উঠে তখন থেকে ষোল হাজার বছর ধরে ধর্ম অনুসারে রাজ্য করে শেষে স্বর্গে স্থান পূর্ণ করেছিলেন।

গল্পটি ভালো। সীতা আগেই চলে এসেছিলেন সুতরাং তাঁর হরণের ও পরবর্তী প্রসঙ্গ ওঠে না। রামকথার প্রাচীনতর এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপকথাটি নিটোল ভাবে এখানে পাচ্ছি। এইটুকু রামকথা অশ্বঘোষও জানতেন।

খ. দ্বিতীয় জাতক-গল্পটি অখণ্ডিত ভাবে পাই নি। গোড়ার দিকে বেশ খানিকটা নেই। এটি চীন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ২৫১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম জাতক গল্পটি সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য থেকে নেওয়া, দ্বিতীয় গল্পটি তা নয়, এটি বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তৈরি। এতে রামকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়েছে। মাতুল রাজ্য জবরদখল করলে পর রাম মহিষীকে নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে চলে যান। সেখানে শান্ত জীবন যাপন করতে

১। মূল 'মহাতলং'।

থাকেন। কিছুকাল পরে বোধিসত্ত্ব যখন কুটিরে নেই তখন এক সমুদ্রব্যাপী নাগ তপস্বীর বেশ ধারণ করে এসে তাঁর পত্নীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তিনি এক বানর-দলপতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পত্নীকে উদ্ধার করেন। পত্নী নিজের সতীত্বের প্রমাণ দেন। তাঁদের মিলন ঘটে। (অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে, এই কাহিনীতে কারো নাম দেওয়া নেই।)

এই গল্পটিও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রামায়ণ-কাহিনীর ক্ষীণকায় দ্বিতীয় অংশ। দশরথের পুত্রসমস্যার কোনই উল্লেখ নেই। এটি আলাদা একটি উপাখ্যান। দুটি জাতক-গল্পেই নায়ক তপস্বী।

গ. তৃতীয় জাতক-গল্পটি (৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনূদিত) প্রথম জাতক-গল্পের অনুরূপ। তবে সীতার অর্থাৎ রামের ভার্যার উল্লেখ নেই। তার কারণ গল্পটি জনসমাজে প্রচলিত ধর্মকথা রূপে গৃহীত ছিল, রূপকথা রূপে নয়। তাই রাজকুমার রামকে নারায়ণের শক্তিধর বলা হয়েছে।

জৈন কবিদের রামকথা কাব্য

জৈন কবি-পণ্ডিতের রামকথা বিস্তৃত কাব্য-আকারে প্রাকৃতে অথবা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক বিমলসূরি, রবিষেণ[১], জিনসেন, গুণভদ্র, স্বয়স্তু, পুষ্পদত্ত ইত্যাদি। আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই জৈন কবিদের রামায়ণ গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। জৈনদের ঐতিহ্য ব্রাহ্মণ্য যদুবংশের ঐতিহ্যের সমগোত্রীয় এবং তারই জের টেনে এসেছিল। (তাই দুটি ঐতিহ্যেই যদুবংশ-গাথার নাম 'হরিবংশ।') জৈন রামকথায় ব্রাহ্মণ্য রামকথায় উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত কিছু মিথের মিশ্রণ আছে। অনুল্লিখিত মিথ হল রাবণের গোষ্ঠীর বিদ্যাধরদের (অন্যত্র যক্ষ বা নাগ) কথা। এই মিথ হিমালয়ের সঙ্গে বিজড়িত।[২] রাবণ কুবেরের ভাই। কুবেরের নিবাস অলকায় হিমালয়ে, রাবণের নিবাস লঙ্কায় (—'অলকা' ও 'লঙ্কা' নাম বা শব্দ দুটি সমগোত্রীয় এবং সমার্থক)। রাবণও একদা হিমালয়বাসী ছিল। রাবণ দশগ্রীব—অর্থাৎ দশমাথা নাগ। তৃতীয় জাতক কথাটিতেও রাবণ সমুদ্রব্যাপী নাগ বলেই উল্লিখিত।

জৈন রামকথা কাব্যগুলির সাধারণ নাম 'পদ্মচরিত' (প্রাকৃতে 'পউম-চরিউ'), 'পদ্মপুরাণ' অথবা 'রামায়ণ-পুরাণ' নামও পাওয়া যায়। জৈন রামায়ণে—যেমন,

---

১। এর রচনা সংস্কৃতে, অপর সকলের প্রাকৃতে।

২। বৌদ্ধ কাহিনীগুলির অধিকাংশে রামের বনবাস হিমালয়, রামায়ণের মতে দক্ষিণে।

স্বয়ম্ভুর—সব শুদ্ধ পাঁচ কাণ্ড—বিজ্জাহর (=বিদ্যাধর), উজ্‌ঝা (=অযোধ্যা), সুন্দর, জুজ্ঝ (=যুদ্ধ) এবং উত্তরণ। বিদ্যাধর কাণ্ডে রাবণের পূর্ব-ইতিহাস ইত্যাদি আছে।

জৈন রামকথার অভিনবত্ব সংক্ষেপে এইগুলি। রামের মায়ের নাম অপরাজিতা, ভরতের মায়ের নাম সুপ্রভা। জনকের যমজ সন্তান ছিল—ভামণ্ডল ও সীতা। ভামণ্ডল শিশুকালেই অপহৃত হয়েছিল। বড় হয়ে সে সীতাকে বিবাহ করতে ঝুঁকেছিল। সীতার স্বয়ংবরসভার কাহিনী একটু অন্যরকম। সূর্পণখার নাম এখানে চন্দ্রনখা। বালী এখানে সুগ্রীবের ছদ্মবেশধারী প্রবঞ্চক বিদগ্ধ সহসত্তি। তাকে বধ করে রাম দধিমুখের তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। লঙ্কার গড়রক্ষক বজ্রমুখ নিহত হলে পরে হনুমান তার কন্যা লঙ্কাসুন্দরীকে বিবাহ করে।

জৈন সাহিত্যে প্রাপ্ত রামকথায় খাঁটি গল্পরূপটি অবিকৃত রয়ে গেছে সংঘদাসের বসুদেবহিণ্ডীর চতুর্দশ খণ্ডে। সে কাহিনী উপরের বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করলে তা বোঝা যাবে। এই সংক্ষিপ্ত রামকথা রামায়ণের সঙ্গে প্রায়ই মিলে যায়। বিশেষ যা, তা নির্দেশ করছি।

রাক্ষস (যেমন রাবণ), বানর (যেমন সুগ্রীব), পক্ষী (যেমন জটায়ু)—এরা সবই 'বিজ্জাহর' (অর্থাৎ বিদ্যাধর), তবে ভিন্ন ভিন্ন বর্গের বা গোষ্ঠীর। কেকয়ীর দুই পুত্র—ভরত ও শত্রুঘ্ন, সুমিত্রার এক পুত্র লক্ষ্মণ।

সীতা রাবণ-মন্দোদরীর কন্যা। পিতৃবংশের উচ্ছেদের হেতু হবে সে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী থাকায় একে পরিত্যাগ করে আসা হয়েছিল জনকের মাঠে। সেখানে তিনি সীতাকে লাঙ্গলের ডগায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। জনকের পত্নী ধারিণী সীতাকে মানুষ করেছিলেন। স্বয়ংবরে সীতা রামকে বরণ করেছিলেন। ধনুর্ভঙ্গের কোন উল্লেখ নেই।

একদা পঁয়তিরিশ জন রাজার বিরুদ্ধে দশরথকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। যুদ্ধে রাজা ধরা পড়েন। মন্ত্রীরা রানীদের পালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। কেকয়ী বলেছিলেন, 'তা হবে না, আমি নিজে যুদ্ধে নামব।' তিনি আদেশ দিলেন, যুদ্ধ ছেড়ে যে পালাবে তাকে হত্যা করা হবে। কেকয়ী রথে চড়ে যুদ্ধে নামায় সৈন্যেরা সাহস পেয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করে দশরথকে উদ্ধার করে। এই জয়লাভে দশরথ কেকয়ীকে যদৃচ্ছা বর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

রামের বনবাস বারো বছরের জন্য।

সীতার হরণে রাম অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বলেছিলেন, 'অজ্জ ণারিহসি সোইউং ইত্থি-নিমিত্তং। জই বা মরিউমিচ্ছসি

তো কিং সত্তুপরাজএ পয়ত্তং ণ করোসি'। (অর্থাৎ—'আর্য, স্ত্রীলোকের কারণে শোক করা আপনার উচিত নয়। আর যদি মরতে চান তবে কেন শত্রুকে পরাজিত করতে প্রযত্ন করছেন না?')

রাম-লক্ষ্মণ যখন কিষ্কিন্ধায় এলেন তখন সুগ্রীব বালীর কাছে পরাজিত হয়ে জিনায়তনে (অর্থাৎ দেবকূলে) আশ্রয় নিয়েছিলেন হনুমান জাম্ববানদের সঙ্গে। ধনুর্ধারী রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব পালিয়ে যেতে চাইলেন। হনুমান তাঁর সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিলন ঘটিয়ে দেয়।

রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগে প্রথমেই রামের চিঠি দিয়ে বিদ্যাধর দূত পাঠিয়ে দিলেন অযোধ্যায় ভরতের কাছে। তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। ('ততো রামসন্দেশেন সুগ্‌গীবেণ পেসিয়া বিজ্জাহরা ভরহসমীবং। তেন চ চউরংগবলং পেসিয়ং।' অর্থাৎ—তারপর রামের চিঠি দিয়ে সুগ্রীব বিদ্যাধর পাঠিয়ে দিলে ভরতের কাছে। তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য পাঠালেন।)

লক্ষ্মণের দ্বারা রাবণ-বধ হয়েছিল। এই কীর্তির জন্য তিনি ভারতবর্ষে অষ্টম বাসুদেব বলে প্রসিদ্ধ হলেন। তারপর বিভীষণ যুদ্ধ মিটিয়ে দেন, সীতাকে রামের কাছে আনেন। রাবণের সৎকার হল। বিভীষণ অরিঞ্জয় নগরের রাজা নির্দিষ্ট হলেন। তারপর সুগ্রীবকে নিয়ে রাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যায় ফিরে এলেন। রাজা হলেন। বিভীষণ ও সুগ্রীবের সহায়তায় অর্ধ ভারত জয় করা হল। বিভীষণ অরিঞ্জয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন।

বৌদ্ধ জাতকে রামই মুখ্য পাত্র, লক্ষ্মণ অবান্তর। সেখানে রাম শান্ত, সুধীর, বিজ্ঞ ('পণ্ডিত') এবং তপস্বী। জৈন কাব্যে রাম শান্ত প্রকৃতির ভদ্র ব্যক্তি, লক্ষ্মণই প্রধান পাত্র। তিনিই বিজ্ঞ, যেহেতু রামকে উপদেশ দিয়েছিলেন। রাবণকে বধ করেছিলেন লক্ষ্মণই। তাই তিনিই 'অষ্টম বাসুদেব', অর্থাৎ ত্রেতা যুগের কৃষ্ণ।

ইরানীয় খোটানী ভাষায় রামকথা কাব্য

রামকথা ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইরের রামকথার মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট ও পুরানো হল চীনীয় তুর্কিস্থানের অন্তর্গত খোটানে, সেখানকার প্রাচীন ভাষায়—ইরানীয় ভাষাগুচ্ছের অন্তর্গত—রচিত কাহিনীটিতে (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লেখা)। এটি উদ্ধার করেছিলেন এইচ্. ডবল্যু. বেলী (H. W. Bailey)। এই রামকথাটি পদ্যে বিরচিত। সবশুদ্ধ শ্লোকসংখ্যা সাড়ে সাতশর কিছু বেশি। মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় ছাড় আছে। বৌদ্ধদের রচনা, তাই গোড়ায় ও

শেষে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে রামের যোগাযোগের নির্দেশ আছে। মূল্যবান খোটানী গল্পটি যথাযথ এখানে বলছি।

এক ব্রাহ্মণ পর্বতে বারো বছর ধরে মহাদেবের উপাসনা করে তাঁর কাছ থেকে বর পান সর্বার্থপ্রসূ সর্বকর্মফলপ্রদ চিন্তামণি। বর পেয়ে ব্রাহ্মণ বিবাহ করে ঘরবাসী হন এবং সুখে জীবন যাপন করতে থাকেন।

দশরথ নামে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী রাজা ছিলেন, তাঁর নামান্তর ছিল সহস্রবাহু। তিনি মৃগয়া করতে বনে গিয়ে সেই ব্রাহ্মণের গোরু হরণ করে আনেন। দুরবস্থায় পড়ে ব্রাহ্মণ তাঁর বালক পুত্র পরশুরামকে নিয়ে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে থাকেন। পরশুরাম বড় হয়ে পর্বতে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। বারো বছর তপস্যার পর ব্রহ্মা তাঁকে সিদ্ধি দান করলেন। তারপর পরশুরাম তাঁর কুঠার নিয়ে গেলেন পিতার হয়ে দশরথের উপর প্রতিশোধ নিতে। দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হল, দশরথ নিহত হলেন। তারপর পরশুরাম নগরে নগরে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন, রাজাদের হত্যা করে ব্রাহ্মণদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে।

দশরথের দুটি পুত্র ছিল রাম ও লক্ষ্মণ। পরশুরামের কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে মা তাঁদের মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন বারো বছর ধরে। তারপর ভূমিগর্ভ থেকে বেরিয়ে বলীয়ান দু-ভাই খোঁজ করতে করতে পরশুরামের সন্ধান পেলেন পর্বতে। সেখানে রাম তাঁকে হত্যা করেন। তখন সমগ্র জম্বুদ্বীপ দু-ভাইয়ের অধিকারে এল।

ব্রাহ্মণদের রাজা দশগ্রীবের অগ্রমহিষী এক কন্যা প্রসব করেছিল। জ্যোতিষীরা মেয়ের জন্মলগ্ন গণনা করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যে, সে কন্যা হতে দশগ্রীবের নগরীর উচ্ছেদ ঘটবে। দশগ্রীবের আদেশে সদ্যোজাত কন্যাকে মঞ্জুষায় ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল। সেই মঞ্জুষা দেখতে পান এক ঋষি। তিনি মেয়েটিকে তুলে এনে সযত্নে পালন করতে থাকেন। (অতঃপর পুঁথিতে একটু ছেদ আছে। মনে হয়, এ ঋষি বাল্মীকি এবং তাঁর সীতা পালন যেন আগেই ঘটেছিল।)

রাম ও লক্ষ্মণ একদা (বনে বেড়াতে বেড়াতে) এলেন যেখানে সীতা থাকেন। সীতাকে দেখে দু-ভাই প্রেমে পড়েন। (ঋষির কাছ থেকে?) সীতাকে চেয়ে নিয়ে দু-ভাই অন্যত্র গিয়ে এক মণ্ডল এঁকে তার মধ্যে সীতাকে রাখলেন। সে মণ্ডল পেরিয়ে ঢোকবার সাধ্য পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষের কোনও জীবের বা দেবতার ছিল না। একদিন রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে দশগ্রীব আকাশপথে উড়ে যেতে যেতে ভূতলে অপূর্ব-সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে অবতরণ করে, তবে মণ্ডল পেরতে পারে না। সীতার প্রহরী ছিল এক শকুনি। সে দশগ্রীবকে আক্রমণ করে, কিন্তু সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হয়। তারপর

দশগ্রীব ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের বেশ ধরে আসে। সীতা ভিক্ষা দিতে মণ্ডলের বাইরে হাত বাড়ালে দশগ্রীব তাকে ধরে ফেলে লঙ্কাদ্বীপে নিয়ে যায়।

রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এসে সীতাকে না দেখে তার সন্ধানে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এলেন মর্কটদের দেশে। সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন এক বিশাল-দেহ বৃদ্ধ মর্কট, যেন পাহাড়ের একটা চূড়া। তার শারীরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে দু-ভাই লজ্জিত হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন সীতাকে খুঁজতে। শরৎকাল এল। বারো বছর পরে ঘুরতে ঘুরতে রাম-লক্ষ্মণ আবার দুটি মর্কটকে দেখতে পেলেন। তারা দু-ভাই ঠিক একই রকম দেখতে। এক ভাইয়ের নাম নণ্ড। দুজনে মারামারি করছে। রাম নণ্ডকে জিতিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করলেন, নণ্ড প্রতিজ্ঞা করলে তাহলে সে মর্কট-বাহিনীকে রামের সাহায্যে নিয়োগ করবে। তারপর দু-ভাইয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় নণ্ড গলায় দর্পণ ঝুলিয়ে নিলে। তার ফলে রাম দু-ভাইয়ের পার্থক্য বুঝতে পারলেন। রামের বাণে সুগ্রীব নিহত হল। নণ্ড মর্কটদের ডেকে তাদের শাসিয়ে বললে, 'সাত দিনের মধ্যে সীতার সন্ধান এনে দিতে হবে। যে এ আদেশ অমান্য করবে তার চোখ উপড়ে দেব।'

সাত দিন কেটে গেল সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন এক মর্কটী, নাম লফুষ, বললে যে, সে এক পাখিকে তার শাবকদের বলতে শুনেছে যে তারা শীঘ্রই প্রচুর মর্কটদের চোখ খেতে পাবে, কেন না মর্কটরা জানতে পারে নি যে দশগ্রীব সীতাকে লঙ্কাদ্বীপে নিয়ে গেছে। নণ্ডের কাছে লফুষের এ খবর পৌঁছল। মর্কটদের মুক্ত করা হল। গুরু ভবিষ্যৎ বাণী করলেন, জয় হবে এবং উপদেশ দিলেন সেতু বাঁধতে। তারা সেতু বেঁধে সেতু দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে সেতু ধ্বংস করলে—যাতে কেউ না পালাতে পারে, তারপর লঙ্কাপুরীর দিকে অগ্রসর হল। তুমুল কোলাহল উঠল। দশগ্রীব খবর পেলে রাম এসেছেন। (এইখানে পুঁথির কিছু অংশ মেলে নি।)

রাক্ষসেরা ছত্রভঙ্গ হল। দশগ্রীবের প্রবীণ মন্ত্রীরা নানা উপদেশ দিলে, উদাহরণ দিলে সীতাকে মুক্তি দেবার জন্যে। কিন্তু দশগ্রীব কোন কথাই শুনলে না। মন্ত্রীরা পালিয়ে গেল। দশগ্রীব তপস্যা করতে লাগল।

মর্কট সৈন্য নিয়ে রাম লঙ্কাপুরী প্রবেশ করলেন। দশগ্রীব তপস্যায় সিদ্ধি পেলে না। সে বুঝলে পরাজয় আসন্ন। সে সাপের বিষ নিয়ে মাখনের সঙ্গে মিশিয়ে বাণের ফলায় মাখিয়ে দিলে। এই বাণ সে রামের প্রতি নিক্ষেপ করলে। বাণ কপালে লাগলে রাম মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক জীবককে ডাকা হল। জীবক বললে হিমালয় থেকে 'অমৃত-সঞ্জীব' ওষধি আনতে হবে। নণ্ড গেল ওষধি আনতে, কিন্তু গাছের নামটি ভুলে যাওয়ায় সে সব পাহাড়টাই উপড়ে এনে দিলে। রাম সুস্থ হয়ে উঠলেন। ইতিপূর্বে দশগ্রীব সীতাকে কোলে করে আকাশে উড়ে তাঁকে দেখালে—রাম ভূমিতে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন।

জ্যোতিষীরা গুণে দেখে বললে, দশগ্রীবের মর্মস্থান তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল। তারপর দশগ্রীবকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলা হল তার পায়ের আঙুল দেখাতে। সে দেখালে। রাম বাণ ছুঁড়লো সে আঙুলে। দশগ্রীব ধরাশায়ী হল। রামের কাছে সে জীবন-ভিক্ষা করে বললে, 'খাজনা দেব'। রাম তার প্রাণ হরণ করলেন না।

সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ এক শ বছর যাপন করলেন। তারপর প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় রামের মনঃপীড়া হল। লক্ষ্মণ বললেন সোনারূপা দিয়ে প্রজাদের শান্ত করতে। সীতা কিন্তু জানতেন যে তাঁকে নিয়েই জনগণের অসন্তুষ্টি। রামকে তিনি সেই কথা বলে পাতালে প্রবেশ করলেন।

রাম সমুদ্রের তীরে এলেন এবং অঞ্জন ও সর্ষে পুড়িয়ে সমুদ্রের নাগদের তাড়িয়ে দিয়ে জম্বুদ্বীপে প্রত্যাগমন করলেন।

দশগ্রীব বুদ্ধের কাছে এসে ধর্মদেশনা নিয়েছিল।

খোটানী রামকথায় যে নূতনত্ব আছে তা বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য-পূর্ণ। এখানে সেগুলি নির্দেশ করছি।

১. দশরথের এক পত্নী ও দুই পুত্র ছাড়া আর কোন পত্নীর ও পুত্রের উল্লেখ নেই।

২. দশরথ পরশুরামের পিতার গোরু চুরি করেছিলেন। পরশুরামের হাতে তিনি নিহত হন। রামের বনবাস তিনি দেন নি, রাম-লক্ষ্মণের অজ্ঞাতবাস করিয়েছিলেন তাঁদের মা পরশুরামের কোপ এড়াতে। বড় হয়ে রাম পরশুরামকে নিধন করে জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্রতা লাভ করেন। (পরশুরামের সঙ্গে রামের বিরোধের উল্লেখমাত্র রামায়ণে ও প্রাচীন সংস্কৃত রামকথায় আছে। কিন্তু সে উল্লেখের কোন প্রাসঙ্গিক সঙ্গতি নেই। খোটানী কথায় সে সঙ্গতি মিলছে। পরশুরাম জম্বুদ্বীপ নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, কিন্তু দশরথ ছাড়া পেয়েছিলেন কেন তার উত্তর সংস্কৃত রামকথায় নেই, কিন্তু এখানে পাচ্ছি। তিনি দশরথকেও বাদ দেন নি।)

৩. রাবণের—খোটানী কথায় সর্বদা 'দশগ্রীব' বলে উল্লিখিত—পরিত্যক্তা কন্যা সীতা এক ঋষি কর্তৃক অরণ্যে পালিত হয়েছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রম গড়ে সীতাকে রাখেন এবং দুজনেই তাঁকে পত্নিত্বে বরণ করেন। এই ঋষি সংস্কৃত রামায়ণের বাল্মীকি, যিনি দেখা দিয়েছিলেন সমাপ্তিকালে।

৪. রামায়ণের বালী ও সুগ্রীব খোটানীতে সুগ্রীব ও নণ্ড। হনুমান নেই, তার স্থান নিয়েছে নণ্ড। লক্ষ্মণের স্থানে রাম রাবণের বাণে নিপাতিত। সুষেণের স্থান জীবক (বৌদ্ধ ঐতিহ্য বিখ্যাত চিকিৎসক।)

৫. রাবণের প্রাণ রাম হরণ করেন নি। তাঁর মর্মস্থান পায়ের বুড়ো-আঙুলে আঘাত করে রাম তাঁকে আহত করেন। রাবণ পরে বুদ্ধের শরণ নিয়েছিলেন।

৬. সীতা কখনোই অযোধ্যায় পদার্পণ করেন নি।

অপর বহির্ভারত ভাষায় রামকথা

তিব্বতী ভাষায় রচিত যে রামকথা চীনীয় তুর্কিস্থানে পাওয়া গেছে (এফ, ডবল্যু টমাস ও মার্সেল লালু প্রকাশিত) তার সঙ্গে খোটানী রামকথার বেশ কিছু মিল আছে, অমিলও আছে। মিল যেমন, সীতা রাবণের কন্যা। সীতার সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিলন ঘটেছিল বনদেশে। রাবণের মর্মস্থান ছিল ডান পায়ের বুড়ো আঙুল। ইত্যাদি। অমিল যেমন, প্রজারা খুঁজে বার করে সীতাকে রামের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল মাটিশুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে, লঙ্কায় সীতার সঙ্গে রামের পত্র বিনিময় হয়েছিল, রাবণ যখন রামকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছিল তখন রাম তার ঘোড়ামাথা কেটে ফেলেন। রাম-সীতার এক ছেলে লব, সে হারিয়ে গেলে মুনিরা কুশ দিয়ে আর এক ছেলে গড়ে দেন। পুত্রজন্মের পর সীতার নির্বাসন হয়েছিল এবং হনুমান তাঁদের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিল। ইত্যাদি।

সিয়াম-কাম্বোডিয়ায় প্রচলিত রামকথায় একটি বড় বিশেষত্ব দেখতে পাই বাংলা রাক্ষস-রাক্ষসীর রূপকথায় যেমন তেমনি, রাবণের—রাক্ষস বলে—তার মর্ম বা প্রাণকীট গচ্ছিত ছিল এক মুনির কাছে। নাম তার অগ্নিচক্ষু। রাম রাবণকে যখন কিছুতেই কাবু করতে পারছিলেন না, তখন এক বন্ধু রাক্ষস (—বিভীষণ?) তাঁকে সন্ধান দেয়। সে-ই রাবণের বেশ ধরে মুনির কাছ থেকে গচ্ছিত কৌটাটি আকাশপথে নিয়ে আসছিল। আনবার সময় হাতের টিপুনিতে কৌটাটি চেপ্‌টে যায়, আর রাবণের প্রাণও পিষ্ট হয়ে যায়, এবং রাবণ প্রাণত্যাগ করে। (ফ্রেজারের দি গোল্‌ডেন বাউ ঃ 'দি ইটার্নাল সোল ইন্ ফোক্-টেল' দ্রষ্টব্য।)

মালয় উপদ্বীপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপিন-দ্বীপপুঞ্জ—এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে রামকথা কাব্য ও গল্প আকারে পাওয়া গেছে। পুরানো যবদ্বীপীয় ভাষায় কাব্যটির নাম কাকাবিন (Kakawin)। এটি অনেকটা ভট্টিকাব্য অনুসারে লেখা। আর একটির রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী, এটি বাল্মীকির কাব্যের অনুগত। মালয় উপদ্বীপে অনেকগুলি রামকথা গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে তিনটির সন্ধান মিলেছে। ফিলিপিন মারানাও (Maranaw) ভাষায় সম্প্রতি রামকথা কাব্য মিলেছে। এটির নাম 'মহারাদিয়া লাওয়ানা' (সংক্ষেপে ম-লা)। এটি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে, সম্ভবত এই কালের শেষ দিকে। কাহিনীটির সংক্ষিপ্তসার দিই।

প্রথমেই রাবণের কথা। রাবণ ('লাওয়ানা') কোন এক স্থানের (Pulu Bandiarmasir) রাজার ছেলে। তার আট মাথা (পরে আবার সাতও বলা হয়েছে), তবে দুটির বেশি হাতের উল্লেখ নেই। দুর্বিনীত ও অত্যাচারী বলে পিতা তাকে এক দ্বীপে (Pulu Nagara) নির্বাসন দেন। সেখানে তপস্যা করে রাবণ সিদ্ধিলাভ করে এবং পিতৃরাজ্যে ফিরে আসে। পিতা তাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

অন্য এক রাজ্যে (Agama Niog) ছিলেন এক রাজারানীর দুই সন্তান দুইভাই রাজকুমারের নাম যথাক্রমে রাজা মঙ্গন্‌দিরি (Radia Mangandir) ও রাজা মঙ্গবর্ণ (Radia Mangawarna)। তাঁদের বয়স হয়েছিল, কিন্তু বিয়ে হয় নি। কিছুকাল পরে তাঁরা আর এক রাজ্যের (Palu Nabandai) রাজকন্যার, নাম মালাইলা তিহাইয়া (Tuwan Potre Malaila Tihaia), পাণিপ্রার্থী রূপে জলযাত্রা করলেন দীর্ঘ দশ বছরের জন্য প্রস্তুত হয়ে। উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবার কিছু আগেই তাঁদের জলযান ভেঙে গেল। ঢেউয়ের বেগে তাঁরা উদ্দিষ্ট স্থানের উপকূলে নিক্ষিপ্ত হলেন। তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করলে এক বুড়ী। নাম তার কাবায়ন (Kabayan)। রাজকুমারী মালাইলা গাণ্ডিঙের (Ganding) অর্থাৎ তিহাইয়ার—বিবাহের জন্য পাণিপ্রার্থীদের এই পরীক্ষা নির্দিষ্ট ছিল,—একটি বেতের বল (sipa) লাথি মেরে অন্তঃপুরের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজা মঙ্গন্‌দিরি রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন। কিছু কাল সে দেশে কাটাবার পর রাজকুমারদের মন হল বাড়ি ফিরতে। দীর্ঘ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁরা লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথে তাঁদের খাদ্যশস্য সব ফুরিয়ে গেল। অগত্যা তাঁদের এক স্থানে কিছুদিন থাকতে হল ধান ও ভুট্টার চাষ করে ফলাবার প্রতীক্ষায়।

ইতিমধ্যে রাজকন্যা ও রাজপুত্রদ্বয় একদিন দেখলেন যে, সোনার-শিঙ এক হরিণ তাঁদের ক্ষেত্রে ঢুকে ফসল খাচ্ছে। রাজকন্যা তা দেখে ঝোঁক ধরলেন যে সোনার-শিঙ হরিণটি তাঁকে ধরে দিতেই হবে, নইলে তিনি প্রাণ রাখবেন না। অগত্যা মঙ্গন্‌দিরি গেলেন হরিণ ধরতে। হরিণকে ধরে কায়দা করতে না পেরে তিনি ভাইকে ডাকতে লাগলেন। মঙ্গবর্ণ ভ্রাতৃপত্নীর রক্ষায় ছিলেন। রাজকন্যার কথায় তিনি ভাইয়ের দিকে ছুটে গেলেন। মঙ্গবর্ণ আসতেই হরিণ নিজের জোড়া সৃষ্টি করলে। তখন দুভাই দুটি হরিণকে পাকড়াতে ব্যস্ত রইল। মঙ্গন্‌দিরি যার পিছনে ছুটেছিলেন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে বাড়ির কাছে এনে দিয়ে অন্তর্হিত হল। তিনি দেখেন যে পত্নী বাড়িতে নেই। তখনি তাঁর মনে হল এ রাবণের কাজ। সে হরিণ হয়ে ভাঁওতা দিয়ে তাঁর পত্নীকে অপহরণ করেছে।

তারপর তিনি ভাইয়ের খোঁজে বেরলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি পড়ে গেলেন এক নদীর গর্ভে অচেতন হয়ে। অচেতনতার মধ্যে থেকে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে

এক বুনো মোষ (Carabao) তাঁকে আক্রমণ করেছে এবং তাঁর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূবদিকে ছিটকে পড়েছে। পড়বি তো পড় একেবারে পূবদেশের রানী পোত্রে লাঙ্গাবির (Potre Langawi) মুখের মধ্যে, এবং সেও তা গিলে ফেলেছে। ফলে লাঙ্গাবির গর্ভ সঞ্চার হল এবং যথাকালে সে প্রসব করলে এক বানর-শিশু। তার নাম রাখা হল লক্ষ্মণ (Lakshmana)। এমন সময়ে মঙ্গবর্ণ এসে পড়াতে মঙ্গন্‌দিরির স্বপ্ন ভেঙে গেল। গাণ্ডিঙের জন্যে প্রচুর দুঃখপ্রকাশ করে দুভাই ঠিক করলে রাবণের রাজ্যে বন্দিনী রাজকন্যাকে খোঁজ করে উদ্ধার করতেই হবে।

অনতিবিলম্বে বানর-শিশু লক্ষ্মণ এসে হাজির হয়ে রাজকন্যার খোঁজে তাঁদের সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। তখন মঙ্গন্‌দিরি বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্বপ্ন অচৈতন্যের খেয়াল নয়, সত্য ঘটনা। কিছু ইতস্তত করে শেষে রাজপুত্রেরা লক্ষ্মণের সহায়তা স্বীকার করলেন। কুমীর বুনো মোষ ও বানর জুটিয়ে নিয়ে লক্ষ্মণ বিরাট বাহিনী গঠন করলে। তারপর লক্ষ্মণ পিতা মঙ্গন্‌দিরির হাতের তেলোর উপর থেকে লাফ মেরে সাগর ডিঙিয়ে গিয়ে গাণ্ডিঙের সন্ধান পেলে। সে দেখলে, যখনই রাবণ রাজকন্যার কাছে যায় তখনই দুজনের মাঝখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিছুতেই পরস্পরের স্পর্শ সংযোগ ঘটতে পারে না।

তারপর দু দলে যুদ্ধ বাধল। রাবণের সৈন্য বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন হল। তখন রাবণ নিজে যুদ্ধে নামল। প্রথম যুদ্ধের পর একটি বিশিষ্ট পাথরে শাণ দেওয়া (—এই পাথরে শাণ দেওয়া অস্ত্রে নিধন রাবণের বিধিলিপি নির্দিষ্ট ছিল—) তলোয়ারের আঘাতে মঙ্গবর্ণ রাবণকে ভূপাতিত করলেন।

পরাজিত হওয়ার ফলে রাবণের মতিগতি বদলে গেল। রাবণ স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুশাসনে রত হল। ভাই, লক্ষ্মণ ও পত্নীকে নিয়ে মঙ্গন্‌দিরি সদলে স্বরাজ্যে (Agama Niog) প্রত্যাবর্তন করলেন কুমীরের পিঠে চেপে। প্রজারা তাঁদের আনন্দে বরণ করে নিলে। লক্ষ্মণের রূপ পরিবর্তন ঘটল, সে সুরূপ রাজকুমারে (datu) পরিণত হল। সকলে সুখে দিন যাপন করতে লাগল।

উপরের কাহিনীর সঙ্গে মালয় গল্পকথাটির মিল ও অমিল দুইই আছে। অমিলগুলি এখন দেখাই। গল্পটি শুরু হয়েছে রাজকুমারী সুকুতুম্ বুঙ্গা সতঙ্কেই (Sukutum Bunga Satangkei, মানে 'একটি বৃন্তে ফুলটি') ও শ্রীরামের বিবাহিত অথচ নিঃসন্তান অবস্থায় দুঃখের বর্ণনা দিয়ে। পুত্র কামনায় সুকুতুম্ ও শ্রীরাম গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বানররূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের বানরপুত্র হয়েছিল, তার নাম ক্রা কেচিল ইমাম তের্‌গঙ্গা (Kar Kechil Imam Tergangga ; মানে 'বানর-শিশুপুত্র নেতা-সেনাপতি') ক্রা কেচিল হনুমান নয়। গল্পটিতে হনুমান

(Shah Numan) ক্রা কেচিলের মাতামহ, সমুদ্রের কূলে বানররাজ্যের অধিপতি। তবে রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের কীর্তি প্রায় সবই, গল্পটি অনুসারে, ক্রা কেচিলের।

রামকথা গল্পটির এক প্রধান বিশেষত্ব হল লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব। লক্ষ্মণ বড় ভাই, রাম ছোট ভাই। বুদ্ধি-বিদ্যায়ও লক্ষ্মণ শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁর নাম 'রাজারাজা লক্ষ্মণ'। এইখানে জৈন রামকথার সঙ্গে মিল রয়েছে। রাবণ এখানে মহারাজা জুয়ান (Maharaja Duwana)। সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী। সে নিজ স্থান (Kachapuri) থেকে শ্রীরামের স্থানে (Tanjong Bunga) গগনপথে যায় এবং মায়াশক্তিবলে সুকুতুমের মনোহরণ করে। তারপরে সে সোনার ছাগল হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। শ্রীরাম প্রভৃতি সকলেই তা দেখেন এবং সে ছাগলকে ধরতে সকলে তাড়া করে বনে যান। তখন মহারাজা জুয়ান ছাগল রূপ সংহরণ ও নিজরূপ ধারণ করে রাজপ্রাসাদে আসে, আর সুকুতুম্‌কে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যায় তার দেশে। (জুয়ানের সঙ্গে সুকুতুমের কিছু সংলাপ হয়েছিল যেন সাংকেতিক ভাষায়। এর থেকে অনুমান করি যে, গল্পটির মধ্যে আইরিশ মিথে যেমন, তেমনি পুরানো গাথা কিছু রয়ে গিয়ে থাকবে।) বাড়িতে ফিরে এসে জুয়ান নিজের বংশতালিকা নিরীক্ষণ করে দেখলে যে সুকুতুমের সঙ্গে তার সম্পর্ক মেয়ে-বাপের। সুতরাং তাকে পত্নীরূপে নেওয়া চলল না।

সুকুতুম্‌কে উদ্ধার করতে শ্রীরাম বড় ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করে বানর-রাজ্যে গেলেন। সেখানে গিয়ে ত্যক্তপুত্র ক্রা কেচিলের সঙ্গে দেখা হল। মায়ের সন্ধান-কাজে পিতাকে সাহায্য করতে রাজি হল ক্রা কেচিল এই সর্তে যে, শ্রীরাম যেন তার সঙ্গে এক পাত্রে অন্নগ্রহণ করেন এবং তাঁর কোলে তাকে শুতে দেন। শ্রীরাম রাজি হলেন। তারপর ক্রা কেচিল শ্রীরামের কাঁধে উঠে লাফ দিলে সমুদ্র পেরতে। কিন্তু এক লাফে পারলে না, সমুদ্রে পড়ল। সেখানে এক জিন (= দৈত্য) ছিল। সে একদা ক্রা কেচিলের অনুগ্রহ পেয়েছিল। তার সাহায্যে ক্রা কেচিল সমুদ্র পেরিয়ে জুয়ানের রাজধানীতে পৌঁছল। সুকুতুমের সঙ্গে দেখা হল, শ্রীরামের আংটি দেখিয়ে পরিচয়ও হল। তারপর ক্রা কেচিলের সঙ্গে জুয়ানের সংঘর্ষ বাধল। ক্রা কেচিল জুয়ানের প্রিয় দুটি গাছ—একটি নারকেল আর একটি আম—ধ্বংস করে দিলে। তারপর দুজনের মধ্যে দারুণ যুদ্ধ চলল। শেষে ক্রা কেচিল বন্দী হল। সে বন্ধনকর্তাদের উপদেশ দিলে তার সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে তেল মাখিয়ে যেন আগুন ধরানো হয়। তাই করা হল। কিন্তু ক্রা কেচিল তো মরলই না, উপরন্তু লম্ফঝম্প করে জুয়ানের পুরী পুড়িয়ে দিলে। তারপর সুকুতুম্‌কে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এসে শ্রীরামের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলে। তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে আনন্দোৎসব করছেন এমন সময় জুয়ান এসে উৎপাত আরম্ভ করলে। ঘোর যুদ্ধ বাধল। লক্ষ্মণ

মারা পড়লেন। এক পর্বত (Enggil-ber-Enggil) থেকে ওষুধ এনে ক্রা কেচিল লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে তুললে। জুয়ান তখন পরাজয় স্বীকার করে চলে গেল। তার মৃত সৈন্য-সামন্তদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি হল ক্রা কেচিলের ওষুধের দ্বারা। ক্রা কেচিল বানররূপ ছেড়ে রাজপুত্রের রূপ নিলে। শ্রীরাম ও সুকুতুম্ ক্রা কেচিলকে পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করলেন।

এখন 'হিকায়ৎ মহারাজা রাবণ' (সংক্ষেপে হি-ম-রা) ও 'হিকায়ৎ সেরি রাম' (সংক্ষেপে হি-সে-রা) আখ্যান দুটির সঙ্গে যোগাযোগ অনুধাবন করি। এ দুটি কাহিনীতে, গল্পকাহিনীটির মতো নায়কের নাম শ্রীরাম ('সেরি রাম') অথবা রাম এবং তাঁর ভাইয়ের নাম লক্ষ্মণ (Laksmana)। নায়িকার নাম, রামায়ণের মতোই, সীতা অথবা সীতা দেবী। হি-সে-রা অনুসারে রাম দশরথ-মন্দোদরীর সন্তান। মন্দোদরীকে রাবণ হরণ করে নিয়ে যায়। তারপর একদা দৈবশক্তিবলে দশরথ লঙ্কাপুরীতে গিয়ে সহবাস করে। তার ফলে সীতা দেবীর জন্ম হয়। সুতরাং রাম-সীতার জন্ম-সম্পর্ক ভাইবোনের। রাম-সীতার জলকেলির ফলে গর্ভসঞ্চার হয়ে যে বানর-পুত্র জন্মেছিল তার নাম হনুমান ('জঙ্গপুলবা', Janggapulawa) তাকে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভ থেকে নিষ্কাশিত করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে ভ্রূণ গ্রাস করেছিল দেবী অঞ্জাতি (Dewi Anjati)। সুতরাং রাম-সীতার বানরপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সাক্ষাৎ দেবী অঞ্জাতির গর্ভ থেকে।

হি-সে-রা ও হি-ম-রা উভয়ত্রই রাম ধনুর্বিদ্যার জোরে সীতাকে ভার্যারূপে পেয়েছিলেন। সীতার প্রতিপালক কালা (Kala) ঠিক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি এক বাণে যুগপৎ চল্লিশটি তালগাছ বিঁধতে পারবে সে-ই সীতা দেবীর পতি হবে। রাম এই দুষ্কর কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

হি-সে-রা কাহিনীতে সীতাহরণ ব্যাপারের কোন কারণ দেখানো নেই। হি-ম-রা মতে, যেমন রামায়ণে, লক্ষ্মণের কাছে লাঞ্ছনা পেয়ে সূর্পণখা (Sura Pandaki) রাবণকে উত্তেজিত করেছিল সীতা-হরণ ব্যাপারে।

হি-সে-রা, হি-ম-রা এবং ম-লা—তিন কাহিনীতেই সোনার (বা রূপার) হরিণ, সোনার-শিঙ হরিণ অথবা সোনার ছাগল স্বয়ং রাবণ। রামায়ণের মতো সে রাবণের দূত মারীচ নয়।

গল্পকাহিনীটিতে হনুমান (Kra Kechil) লঙ্কায় সীতাকে দেখা দিয়েছিল তার বানর-স্বরূপে। হি-সে-রা অনুসারে সে ব্রাহ্মণবেশে দেখা দিয়েছিল, হি-ম-রা অনুসারে বৃদ্ধা নারীর বেশে। পরে অবশ্য সে বানর-স্বরূপ পরিগ্রহ করে আত্মপরিচয় দিয়েছিল।

হি-ম-রা অনুসারে রাবণের প্রথমে দশ মুণ্ড ছিল না। কোন ঋষির আশ্রমের উপর দিয়ে যাবার সময়ে তার মনে অসীম ক্রোধের সঞ্চারের ফলে তার দশ মাথা ও বিশ হাত গজায় এবং সে রাক্ষসে পরিণত হয়।

হি-সে-রা (Shellabear ; শেলাবেয়ারের পাঠ্য) অনুসারে গোড়া থেকেই রাবণ দশগ্রীব, বিংশতিভুজ ছিল। রাবণের তপস্যার উল্লেখ সব আখ্যানেই আছে।

হি-সে-রা মতে কোন এক হ্রদে স্নান করার ফলেই রাম-সীতা বানররূপ পেয়েছিলেন এবং বনবাসে থাকার সময়ে তাঁদের আর এক পুত্র জন্মেছিল। তার নাম তাবালাবি (Tabalawi)। এ আখ্যানে এবং হি-ম-রা আখ্যানে রামের ও হনুমানের এক পাত্রে খাদ্য গ্রহণের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত আখ্যানে কলাপাতা বলা হয়েছে।

শুধু ফিলিপিন রামকথায় ও মালয় গল্পকথাটিতে রাম-সীতার পুত্র পরবর্তী জীবনের ঘটনার উল্লেখ আছে। মানুষরূপ নেওয়ার পর তার নাম হয়েছিল গল্পকথায় মাম্‌বাঙ্‌ বোঙ্‌সু (Mambang Bongsu)। তার বিয়ে হয়েছিল এক রাজকন্যার সঙ্গে। শ্বশুর তাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিল। বন্দর তাওহিলে (Bandar Tawhil) সে রাজ্য করতে থাকে।

মালয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত এই সব রামকথায় কিছু বিচিত্রতা রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু অংশ স্থানীয় পরিবর্তন বলে নিতে হবে। তবে কিছু অংশ বেশ পুরানো বলে সন্দেহ হয়। উত্তরকাণ্ডের ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ না থাকায় মনে হয় যে, উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অংশরূপে গৃহীত হবার আগে রামকথায় যে সংহত রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই-ই হয়ত এদেশ-ওদেশ ঘুরে ফিরে মালয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিল। ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও রামকথার কোন কোন গল্প ওখানে পৌঁছে থাকবে।

কাহিনীগুলি সবই মুসলমানদের রচনা। ইসলামি প্রভাব তাই কিছু কিছু আছে। তবে সে প্রভাব পড়েছে নিতান্ত বাইরে বাইরে এবং তা সহজেই ধরা পড়ে।[১]

১। উপরের আলোচনা Dr. Juan R. Francisco বিরচিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

প্রগতি ও পরিবর্তন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মনোবিকলনে ধরা পড়ে যে মানুষমাত্রেই পরিবর্তনবিমুখ ; অথচ প্রতিনিয়ত না বদ্‌লে সে বাঁচতে পারে না। যে-জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতি অনুকল্প, এবং যোগবিভূতির কিংবদন্তী বিশ্বাস্য হোক বা না হোক, শুধুই আধিদৈবিক উৎপাত তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না, এমনকি নিজের দেহবিকারেও সে সদা-সর্বদা অস্থির। ফলত বিবর্তনে মনের আদিম অদ্বৈত ঘুচিয়ে সে আজ অচৈতন্যের উপরে চাপিয়েছে আত্মবিপর্যয়ের তত্ত্বাবধান, আর চৈতন্যকে নিযুক্ত করেছে অবস্থান্তরের নিয়ম-নিরূপণে ; এবং তার বিশ্বাস যে বুদ্ধির দিগ্বিজয়ে যদি অন্তরায় না আসে, তবে সে অচিরে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মধ্যে এ-রকম এক কার্য-কারণশৃঙ্খলার সন্ধান পাবে যে চরাচরের ওলট-পালট আর তাকে প্রাণে মারবে না, ভবিষ্যতের সংসারযাত্রা পর্যন্ত তার মন যুগিয়ে চলবে। খানিকটা কপালের জোরে আর বাকীটা অবস্থা-গতিকে তার এ-আশা একেবারে বিফলে যায়নি ; বহিঃপ্রকৃতি কোনও দিন তার কাল্পনিক হেতুবাদের তোয়াক্কা রাখে না বটে, তবু বারংবার ঠেকে ঠেকে সে এখন প্রকৃতির ধরণ-ধারণ অল্প-বিস্তর বুঝতে শিখেছে ; এবং এই অনিশ্চয় অভিজ্ঞতার কল্যাণে তার সভ্যতা আপাতত সমৃদ্ধ। কিন্তু এত ভুগেও তার স্বভাব শোধরায়নি ; তার অন্তরস্থ পুরাণ পুরুষ বিপ্লবের ঠিক আগের মতই সন্ত্রস্ত ; এবং থামা অসম্ভব ব'লে, এই আতঙ্ক সত্ত্বেও যেমন অগত্যা তার পায়ের বিরাম নেই, তেমনই সাধ থাকলেও, অবচেতন প্রতিবন্ধকের প্রতিপক্ষে এগোনো অধিকাংশ মানুষের সাধ্যে কুলায় না।

সেই জন্যে আধুনিক সমাজে মনোব্যাধির এত প্রাদুর্ভাব ; এবং বিশেষজ্ঞদের মতে হিস্টিরিয়া শুধু অবলাদের প্রবলাস্ত্র নয়, অনেক সময়ে পুরুষের কাছেও রোগের ভান স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে অধিক প্রীতিকর। উপরন্তু এই অবধি মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিবাদ না থাক, ফ্রয়েড্ নিজে এখানে থামতে অনিচ্ছুক ; এবং তিনি যেহেতু তত্ত্বত জড়বাদী, তাই তাঁর বিশ্বাস যে জড়সম্ভূত জীবের মধ্যে নিশ্চেষ্টাসংরক্ষণের পৈতৃক প্রবৃত্তি স্বধর্মানুযায়ী আত্মরক্ষায় অগ্রগণ্য। অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় আধি-ব্যাধির মানস গ্রন্থি কোন্ ছার, মরেও মানুষ বর্তমান থেকে পালিয়ে অতীতের কোলে বিশ্রাম চায় ; এবং মুমূর্ষাকে তিনি কেবল নৈরাশ্যের চরম অভিব্যক্তি হিসাবে দেখেন না ঃ রিরংসার মতো জিজীবিষু প্রবৃত্তিও মৃত্যু-কামনার সংক্রাম কাটাতে পারে না ব'লেই,

প্রণয়ীরা ধর্ষণ আর মর্ষণ—এই দ্বিবিধ রতির দোটানায় রাত্রি-দিন উদ্ব্যস্ত। অবশ্য মনস্তত্ত্ব এখনও বিজ্ঞান-পদবাচ্য নয় ; এবং প্রেম ও ঘৃণার অন্যোন্যবিরোধী সমন্বয় সম্প্রতি সে-শাস্ত্রে স্বীকৃত হলেও, উক্ত ধ্রুবদ্বয় এ-যাবৎ একধারে শুধু কাব্য-নাটকের আশ্রয় যুগিয়েছে। কিন্তু কবিকল্পনা-সম্বন্ধে বুদ্ধিমানের অবজ্ঞা অনুচিত ; এবং কল্পনার নির্দেশ যদি ন্যায়ের বিধান নাই মানে, তবু বাস্তব জগতের প্রতি কবির পক্ষপাত আসলে হয়তো বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে বেশী। অন্ততঃপক্ষে ভূয়োদর্শী নৃতত্ত্ববিদ্‌ও এ-প্রসঙ্গে ভাবপ্রবতিম কবির সঙ্গে একমত যে যুদ্ধ আর পুত্রেষ্টির আনুষ্ঠানিক সাদৃশ্য যেকালে সুস্পষ্ট, তখন সে-দুই প্রকরণের প্রেরণা খুব সম্ভব অভিন্ন ; এবং ফ্রয়েড্‌-এর মনে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ নেই যে অবচেতনের নৈরাজ্যে একাধিক বিপ্রলাপ একত্রে বিদ্যমান।

তাহলেও আত্মবিবাদের অস্তিত্ব-অঙ্গীকার শক্ত ; এবং যাঁরা স্থান, কাল ও পাত্রের অতীত ভূমানন্দে অনধিকারী, তাঁদের অভিজ্ঞতায় যত বৈষম্যই থাক না কেন, তাতে তর্কশাস্ত্রের প্রথম নিষেধ বিনা ব্যতিক্রমে মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্যস্মর্তব্য যে ব্রহ্মবিদ্যাই নেতিবাদের একমাত্র পরিণতি ; এবং নিয়মানুবর্তিতা যেহেতু ব্রহ্মোপলব্ধির মতো শুধু অগতির গতি নয়, অনেক সময়ে অভীষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়, তাই অবৈধতার অভাবে বিধানপ্রমাণের চেষ্টা অনুপকারী। সে-জন্যে সদর্থক সাক্ষ্যের প্রয়োজন ; এবং নিয়ম আর নিষেধের পারস্পরিক মুখাপেক্ষা তো সন্দেহ-জনক বটেই, এমনকি নিয়ম ও দৃষ্টান্তের সম্পর্কও শুঁড়ী আর মাতালের সুপরিচিত সহযোগের সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং অব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যবস্থার ব্যাপ্তি দেখা হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং নিয়ম-সম্বন্ধে নিরুক্তি কেবল তখন সম্ভব, যখন দৃষ্টান্ত বা বৈপরীত্য নয়, কোনও সামান্য বিধান থেকে নাতিপ্রশস্ত বিধিতে অবরোহণ সহজ ও সুকর। দুঃখের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রের মূল সূত্রত্রয় এ-রকম কোনও সাধারণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় ; এবং সেই কারণে নির্দ্বন্দ্বকে অভিজ্ঞতার অপরিহার্য লক্ষণ ব'লে বুঝেও আমরা মরমীদের বৃথা বাক্যে অর্থ খুঁজি। সুতরাং স্বতোবিরোধ না হোক, অন্তত বিরোধের সঙ্গে মানুষমাত্রেই সুপরিচিত ; এবং আমরণ জীবনের ধাক্কা খেয়েও, সে যদিচ সংঘর্ষের মধ্যে অস্তি-নাস্তির তাৎকাল্য মানতে বাধ্য নয়, তথাচ একবার ভাবতে বসলে, সে আর অস্বীকার করে না যে সদসদ্যের বিকল্প ব্যতীত প্রাণযাত্রা অচল।

সময়ে দ্বন্দ্বে তার ভয় ভাঙে ; এবং সে ইতিহাস প'ড়ে বোঝে যে স্বতোবিরোধ সুদ্ধ অস্থায়ী। অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর অনভিজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধির দরুন আজ যে-সমস্যাকে অগভীর দৃষ্টিতে বিবাদমূলক ঠেকে, কাল জ্ঞান বাড়লে, তার ন্যায্য সমাধানে আর তিলার্ধ সংশয় থাকে না। তখন হঠাৎ তার নিরাশা দুরাশায় বদ্‌লায় ; এবং বর্তমানের ভাবনা ভুলে সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকিয়ে ভাবে যে সে টিকুক বা না টিকুক, সভ্যতার প্রগতি কোনও দিন থামবে না—আধুনিক প্রতর্ক আগামী প্রমিতির প্রসাদ

পাবে। তবে তার পর কী ঘটবে, তা যেহেতু নিছক কল্পনাবিলাসের গোচরে আসে না, তাই সে অগত্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দ্বারে ধরনা দেয় ; এবং সে দৈবজ্ঞের কথায় শুভ-বাদের উপজীব্য জোটে না, জানা যায় যে এণ্ট্রোপি-র চক্রবৃদ্ধি জগৎসংসারকে প্রলয়ের দিকে পাঠাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজে বিশ্ববিকীরণের ধ্বংসতীব্র আকাশবাণী ; এবং তারই তালে তালে চলে পরমাণুর লম্ফ-ঝম্প, যাতে য়ুরেনীয়ম্ সীসায় না নেমে নিঃশ্বাস নেয় না। অবশেষে উদ্বর্তনের সমর্থনে ডাক পড়ে জীবলোকের। কিন্তু সেখানেও কোনও আশ্বাস মেলে না ঃ বরঞ্চ প্রাণীবিদ্যা শেখায় যে অভিব্যক্তির উৎস এখনও শূন্যে মেশেনি বটে, তবু জাতিবিশেষের বেলায় ক্ষয়ই এ-যাবৎ জিতেছে। অনন্তর প্রগতির সঙ্গে প্রকৃতির অহি-নকুল-সম্বন্ধ ফুটে বেরোয় ; এবং প্রথমে প্রতিবেশপরাজয়ের অভিলাষ-পোষণ ক'রে ক্রমশ আমরা যখন ধরতে পারি যে শীতের প্রকোপে আপাদমস্তক রোমশ পরিচ্ছেদে মুড়ে আমরা উন্নতির শিখরে উঠি না, বিবর্তনের সোপানমার্গে প্রয়োজনমতো ধাপ-কয়েক নামি, তখন বুদ্ধিগত বিরোধকে আর সাময়িক লাগে না।

অর্থাৎ মানুষী চিন্তার মুষ্টিমেয় পদার্থ-প্রত্যয়াদি চিরনির্দিষ্ট ব'লেই, প্রবর্ধমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ ব্যাসকূটের রঙ্গভূমি ; এবং তৎসত্ত্বেও ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার যদিচ থামে না, তবু প্রতিযোগী অর্থাপত্তির আপত্তি-বিপত্তি মনীষার আপোষে সত্যই মেটে কিনা সন্দেহ। অবশ্য আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে কণাবাদীদের সঙ্গে তরঙ্গধর্মীদের বাদবিতণ্ডা সম্প্রতি লুই দ ব্রোগ্লি-র মীমাংসা মেনেছে ; এবং সেই সামঞ্জস্যের জন্যে তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু এ-রকম পরিকল্পনার দ্বারা গণিতের মান যতই বাড়ুক না কেন, অণু আর ঊর্মির বাস্তবিক সাযুজ্য কিছুমাত্র এগোয় না ; বরং আমার মতো মূর্খ ভাবতে পারে যে সমুৎপন্ন সর্বনাশে আধুনিক পণ্ডিতেরা আর অর্ধত্যাগে নিস্তার পান না, সনাতন প্রথায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব দেখে সমস্যার সঙ্গে গতানুগতিক কাণ্ডজ্ঞানকেও যথাসত্বর ঝেড়ে ফেলেন। অন্ততঃপক্ষে য়ুং-এর মতো স্থিতপ্রাজ্ঞের বিচারেও বিরোধভঞ্জনের চেষ্টা পণ্ড শ্রম ; এবং যারা দারুণ দ্বিধায় দিশা হারিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ চায়, তাদের তিনি অধ্যবসায়ের শত নাম শোনান না, অবিলম্বে সে-দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র তাকাবার উপদেশ দেন। কারণ তাঁর ধ্যানলব্ধ সিদ্ধান্ত আর পাভ্‌লোভ-এর প্রয়োগ প্রতিষ্ঠ অনুমান উভয়ে বোধহয় এ-বিষয়ে একমত যে ব্যক্তি আধিজৈবিক প্রয়োজনের নিমিত্তমাত্র ; এবং তাই তার বিশ্ববীক্ষার প্রতীকাদি এক দিকে যেমন নির্বিকার, তেমনই অন্য দিকে তার অঙ্গপ্রতঙ্গের স্বাতন্ত্র্য অবস্থাবিশেষে অধিকারভেদের শাসন-মুক্ত।

নচেৎ সুরিখের কূপমণ্ডূকেরা তদ্গত চিত্তে ছবি আঁকতে গিয়ে তিব্বতী অলাতচক্রে ঘুরে মরত না ; নতুবা খাদ্যের পরিবর্তে রঙীন আলো দেখে কুকুরের জিহ্বায় লালা

ঝরত না ; নয়তো আমের বীজে জাম জন্মাত, ভিন্ন জাতির নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী ভিন্ন আকার ধরত, সীজর-নেপোলিয়ন্ এর অনুকরণ ছেড়ে মুসোলীনি পেত আত্মসমাহিতির প্রয়াস। অর্থাৎ সোহংবাদের প্রাচীনতা সত্ত্বেও নিঃসম্পর্ক নূতন ইহলোকে দুর্লভ ; এবং এই অনেকান্ত পৃথিবীর যোগসূত্র কাকতালীয়-ন্যায়ের মতোই শিথিল বটে, কিন্তু ইতিহাস পুনরুক্তিময় ব'লেই, স্বদেশপ্রত্যাখ্যাত প্রবক্তারা অন্তত বিদেশে সমাদর কুড়ায়। কারণ পূর্ণতা ও সত্তার ব্যতিহার-সম্বন্ধে খৃষ্টান্ দার্শনিকদের নিঃসংশয় হয়তো একেবারে অমূলক নয় ; এবং আমানুষ প্রাণী যদি স্বভাবত ইষ্টানিষ্টের পার্থক্য না চিনত, তবে তার পাট তো ইতিপূর্বে উঠতই, এমনকি বহিঃপ্রকৃতিও এত দিন তার প্রাক্তন প্রবৃত্তির সঙ্গে তাল রেখে না চললে, সে নিশ্চয়ই নিমেষের বেশী টিঁকত না। দুর্ভাগ্যবশত স্বভাব প্রায়ই অচেতন ; এবং মজ্জাগত অনীহার অঙ্গীকার শুধু আমাদের আত্মপ্রসাদে বাজে না, আমাদের দেহধর্মেও বাধে। কাজেই পারেতো-র বিবেচনায় মানুষের অধিকাংশ ক্রিয়া-কর্ম নিরতিশয় অসঙ্গত ; এবং একা বিজ্ঞানেই যেহেতু উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও উপলক্ষের অভেদ সম্ভব, তাই তিনি যেমন শুধু সেই চর্চাকে অযৌক্তিকের এলাকায় ফেলেননি, তেমনই বোধহয় মনুষ্যত্বের অভিশাপেই, ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বেঁচেও, বিজ্ঞানের শোচনীয় পরিণাম তাঁর চোখে পড়েনি।

পারেতো বুঝেও বোঝেননি যে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে জ'ন্মে বিজ্ঞান যখন অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর মন যোগাতে গিয়ে সারা সভ্যতার সঙ্গে মরতে বসেছে, তখন অন্যায়-উপাধি সর্বাগ্রে তারই প্রাপ্য ; এবং সামাজিক কার্যকলাপের জাতি-বিচারে তিনি অনুরূপ আরও অনেক ভুল করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর মূল প্রতিপাদ্য অসার্থক নয় ; এবং তাঁর মতো অহংসর্বস্ব হলে, আমরাও মানব না বটে যে আমাদের অদ্বিতীয় অভিমত পূর্বসূরীদের প্রতিধ্বনি, তবু তাঁর দিব্যদৃষ্টি যদি আমাদের অধিকারে আসে, তাহলে আমরা নিশ্চয় জানব যে ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর আচারে-ব্যবহারে যুগে যুগে যতই পরিবর্তন ঘটুক, তার সংস্কার কখনও বদ্‌লায় না। কারণ এই সংস্কার বা "রেসিডিউ" অহৈতুক, লক্ষ্যহীন বা স্বগত ; এবং মানুষ যেমন এরই প্রেরণায় চলে, তেমনই তার কার্যক্রম এর দ্বারা ধার্য নয়। অর্থাৎ শুধু তার মানস প্রতিক্রিয়া এর আজ্ঞাধীন ; এবং একই সংস্কারের বশে নানা মানুষ নানা কাজে লাগে। অতএব কেউ ভাবে যে ডাইনীদের অগ্নি-পরীক্ষা ভিন্ন দেশের ও দশের মঙ্গল নেই ; কেউ ধ'রে নেয় যে নিরীহনিগ্রহের প্রতিবিধানই হিতৈষণার আদ্যকৃত্য ; এবং উভয়ত্র এই কুসংস্কার প্রকাশ পায় যে অকল্যাণ একটা সাময়িক উৎখাত, যার নিরাকরণ শক্তিমানের ইচ্ছাসাপেক্ষ। তবে মৌরসী সমাজে ষড়্‌বিধ সংস্কার ধরা পড়ে ; এবং সেগুলোর প্রত্যেকটা অপরিহার্য্য, অথচ গোটাকয়েক আপাতত পরস্পরবিরোধী ব'লে, সব কটাকে এক সঙ্গে এক জনের মধ্যে মেলে না। ফলে কোনও ব্যবস্থা চিরকাল

টেঁকেনি ; এবং কেবল তাই নয়, সমস্ত সংস্কারে একত্র সমাবেশ যেহেতু অসম্ভব, অগত্যা সমাজমাত্রেই শ্রেণীবিভক্ত আর শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য স্বভাবত স্বল্পায়ু।

কারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবশ্যক পারম্পর্যে একটা সংস্কার কিছু দিন চললে, তার বিপরীত সংস্কার আপনা থেকে উৎপন্ন হয় ; এবং সমাজপতিরা যেমন অমর নয়, তেমনই প্রতিভাবানের ঔরসেও নিষ্প্রতিভ সন্তান জন্মায়। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে আজ যে-দল জেতে, নিসর্গের স্বয়ংবরসভায় কাল আর তার মাল্য জোটে না ; এবং তখন সে যদি নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়ে অপাঙ্‌ক্তেয়দের স্বপক্ষে স্থান দেয়, তবেই তার মঙ্গল, নচেৎ আসন্ন কুরুক্ষেত্রে তার সপরিবার নিপাত নিশ্চিত। এই সত্যকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে আদর্শ সমাজ ব্যতীত অন্য কোথাও বিস্তারের ইচ্ছা আর সংরক্ষণের প্রবৃত্তি—এই অনোন্য-বিমুখ প্রাথমিক সংস্কার-দুটো যুগপৎ কার্যকর নয় ; এবং সাধারণত রাষ্ট্রপরিচালকেরা হয় এত সাবধান যে আত্মীয়দের অসার জেনেও তাঁদের ক্ষাত্র দুর্গে অন্ত্যজদের প্রবেশ তাঁরা অপছন্দ করেন, নয় এমন বৈশ্যভাবাপন্ন যে শত্রু আগত বুঝেও তাঁদের খোলা হাটে তাঁরা বেড়া লাগান না। সেই জন্যে বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় আভিজাতিক শাসকগোষ্ঠীকে ডুবিয়েও মনুষ্যসংসার প্রজাতন্ত্রে এসে কূল পায় না, গণনায়কদের বেবন্দোবস্তে একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহে হেরে আবার স্বৈরাচারে আশ্রয় চায় ; এবং আমাদের সাময়িক অভিভাবকেরা প্রতিবার শক্তি হস্তান্তরের আগে ও পরে জনহিতের ডঙ্কা পেটান বটে, কিন্তু এই নিরন্তর পরিবর্তন সর্বসম্মতির অপেক্ষা রাখে না, কেবল একাগ্র অনুচরদের প্রতি পক্ষপাত দেখায়। এমনকি বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলও একটা কথার কথা ; এবং শুভবুদ্ধির সঙ্গে আত্মম্ভরিতার সম্পর্ক এ-রকম নিকট যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য-ব্যতিরেকে ইষ্টানিষ্টের বিচার পারেতো-র বিদ্রূপ জাগাত।

পক্ষান্তরে গণিতের পদ্ধতি যতই নিরপেক্ষ হোক না কেন, তার প্রয়োগ নির্বিকল্প নয় ; এবং সেই জন্যে তার নির্দেশেও বিবিধ সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটার নির্বাচন অসাধ্য, সে-উপায়ে হয়তো কেবল এইটুকু জানা যায় যে উপস্থিত বিধান ভবিষ্যতে কেমন দাঁড়াবে। অর্থাৎ ভালো-মন্দের বাছাই ন্যায়াতিরিক্ত ব্যাপার, সেখানে বিবেক-নামক ব্যক্তিগত খেয়ালই সর্বেসর্বা ; এবং সমাজতত্ত্ব যেকালে প্রামাণিক বিজ্ঞানের পদ-প্রার্থী, তখন কোনও রকম হার্দ্য বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া তার উচিত নয়, কোন্ সমাজের উপচিকীর্ষা কতখানি—সে-প্রসঙ্গ অমীমাংসিত রেখে সমাজবিশেষের উপকারিতা কোথায় ও কিসে—সেই আলোচনায় মনোনিবেশই তার একমাত্র কর্তব্য। কারণ পারেতো-র বিবেচনায় উল্লিখিত ক্ষেত্রদ্বয় এমনই স্বতন্ত্র যে এক উত্তরে উভয়ের সমীকরণ প্রায় অসম্ভব ; এবং রাষ্ট্র যত দিন সাম্প্রদায়িক আধিপত্যের লীলাভূমি থাকবে, অন্তত তত দিন মূল্যবিচার তো আমাদের ক্ষমতায় কুলাবে না বটেই, এমনকি

অবস্থাবিশেষের উপকারিতাও প্রজারঞ্জনের পরিমাপে আবিষ্কার্য নয়, তার পরিমাণ অন্যান্য সমাজের অনুপাতে অধীত সমাজের প্রবলতর অস্ত্রে-শস্ত্রে বা প্রশস্ততর বাণিজ্যে। আসলে সাধারণ সুখ-সুবিধার বহিরাশ্রিত হিসাবনিকাশ একেবারেই অচল ; এবং কেন অচল, তা যিনি বুঝতে চান, নানা মুনির নানা মত, কিংবা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি ইত্যাদি প্রবাদবাক্যগুলো তাঁর স্মরণীয় নয়। সে-সময়ে এইটুকু ভেবে দেখাই যথেষ্ট যে কোনও অঞ্চলের প্রজননবৃদ্ধি আবশ্যক, না অনাবশ্যক,—এই শাশ্বত সমস্যারও সনাতন সমাধান নেই ; এবং রাষ্ট্র যুদ্ধব্যবসায়ীদের কবলে পড়লে, এ-প্রশ্নের উত্তর যেমন হাঁ, তেমনই রাজদণ্ড যদি শ্রেষ্ঠীদের হাতে আসে, তবে এর জবাব না। অতএব মানবচৈতন্য সদা-সর্বদা উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন ; এবং উভয়-সঙ্কট স্বভাবতই গতিপরিপন্থী ব'লে, মানুষের সংস্কার শত সহস্র বৎসর ধ'রে নির্বিকার রয়েছে।

পারেতো-র জন্ম ও মৃত্যু, দুই, দুটো রাষ্ট্রবিপর্যের অব্যবহিত আগে আর পরে ; এবং পিতা-পুত্রের অনিবার্য বৈপরীত্যের ফলে তিনি আজীবন মাৎসীনি-মার্কা উদারনীতির বিপক্ষে কলম চালিয়ে শেষ কালে যেহেতু বাহুবলের মাহাত্ম্য-কীর্তনে বিস্তর বাক্যব্যয় করেছিলেন, তাই এক দিকে ফাশিস্ট-রা যেমন তাঁর প্রশংসায় শতমুখ, তেমনই অন্য দিকে তিনি বামাচারীদের চক্ষুশূল। কিন্তু রাসেল্-এর মতে মানুষমাত্রেই যখন ঝোঁকের মাথায় হাঙ্গাম বাধিয়ে বুদ্ধির সাহায্যে সে-গোলোযোগ মেটাতে চায়, তখন একদেশদর্শী ভিন্ন আর কেউ ভাববেন না যে রাজনৈতিক পক্ষপাতের স্পর্শদোষ একা পারেতো-র সমাজতত্ত্বেই বর্তমান ; এবং জ্ঞানপাপী হেগেল্ যদি প্রুষ স্বৈরাচারের ডায়ালেক্‌টিক্ আবশ্যিকতা দেখিয়েও শুধু তত্ত্বের জোরে গুরুবাদী বিপ্লবীদের পূজা পেতে পারেন, তবে তথ্যের গুণে পারেতো নিশ্চয়ই সদাশয়ীদের প্রণিধান-যোগ্য। উপরন্তু তিনি আসলে ফাশিস্ট্ নৃশংসতার অগ্রদূত নন, পরিবর্জিত মনুষ্যধর্মের অন্তিম মুখপাত্র ; এবং মনুষ্যধর্ম পশ্চিমাকাশেই অস্ত গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার উদয় খুব সম্ভব প্রাচ্যে। অন্ততঃপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতো বৌদ্ধ ভাবুকেরাও বুঝেছিলেন যে জীবের বিবর্তন অনিবার্য ব'লেই, তার বৃত্তি অস্থায়ী নয় ; এবং বৃত্তি না থাকলে, সংসারযাত্রায় তো ঘন ঘন পূর্ণচ্ছেদ পড়ত বটেই, এমনকি কেউ কখনও প্রতীত্যসমুৎপাদের চেষ্টায় মাথা ঘামাত কিনা সন্দেহ। হয়তো সেই জন্যে বৈনাশিকেরা সত্য ও শুভের অলৌকিক আদর্শে আস্থা হারিয়ে সক্রেটিস্-এর সঙ্গে সমস্বরে মেনেছিলেন যে শ্রেয়োবোধ প্রত্যেকের মধ্যে বদ্ধমূল, কেবল চিত্তশুদ্ধির অভাবে তা আমাদের গোচরে আসে না ; এবং আমার বিশ্বাস পারেতো-র "রেসিডিউ" এই বৃত্তিরই নামান্তর—অর্থাৎ বৃত্তির ন্যায় "রেসিডিউ"-ও মানস জগতের স্বতঃসিদ্ধ আদিভূত।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্প্রতি লিখেছেন যে ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র মুমূর্ষু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শেষ আস্ফালন হলেও, ফাশিস্ট্ দর্শন নাকি বেদ-বেদান্তের সমবয়সী ; এবং কিছু কাল পূর্বে অধ্যাপক ক্রস্‌ম্যান্ ভজিয়েছিলেন যে আসলে প্লেটো-ই এই অনর্থের জন্মদাতা। সুতরাং পারেতো-র প্রায়শ্চিত্তে গ্রীক বা বৌদ্ধ মনীষীদের ডেকে আনা হয়তো সঙ্গত নয়, স্বয়ং মার্ক্‌স্-এর শরণ নেওয়াই সমীচীন ; এবং উপসংহারে এঁদের যতই অমিল থাক না কেন, অন্তত উপক্রমণিকায় উভয়ে বোধহয় একমত। কারণ মার্ক্‌স্-এর মতো পারেতো-ও বুঝেছিলেন যে ধনবিজ্ঞানই সমাজজীবনের একমাত্র নিয়ন্তা ; এবং সেই হেতু-প্রভব বিদ্যার সংজ্ঞা-সম্পর্কে তাঁদের পার্থক্য যদিও সুপ্রকট, তবু অর্থনীতির আনুকূল্যেই যে শাসকবর্গ ক্ষমতাশালী, এ-বিষয়ে কোনও পক্ষেরই সন্দেহ ছিল না। ফলত তাঁরা দুজনেই অহিংসার নিন্দা রটিয়েছেন ; এবং তাঁদের বিবেচনায় অর্থনীতি যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়মেরই প্রকারভেদ, তাই উৎপাদিকাশক্তির হস্তান্তরে রক্তপাত তাঁদের কাছে দূষণীয় ঠেকেনি। অবশ্য সে-আদ্যাশক্তি কী রকম, জড় বা চেতন—কোন্ বিশেষণ তার প্রাপ্য, তাতে পরিবর্তন না প্রগতি—কিসের সাক্ষ্য মেলে, এ-সব প্রসঙ্গে তাঁরা আপাতত বিপরীতগামী ; এবং মার্ক্‌স্ যেখানে নিষ্কাম কর্মের প্রচারক, পারেতো সেখানে অবাধ প্রতিযোগের পতাকাবাহী। কিন্তু মার্ক্‌স্-এর বিরুদ্ধে বাকুনিন্-এর অন্যতম অভিযোগ এই যে সাম্যবাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এমনই বাহ্য যে তাঁর উপদেশে কান পাতা মানে স্টেট্ সোশ্যালিজম্-এর সাধারণ স্বত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পিষে মারা ; এবং পারেতো মুখে স্বপ্রাধান্যের গুণ গেয়েছেন বটে, কিন্তু সর্বগ্রাসী ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র যে তাঁরই আদর্শসম্ভূত, এ-রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা উদারনীতিকদের মধ্যে খুব সুলভ।

উপরন্তু উন্নয়নে আস্থা সত্ত্বেও মার্ক্‌স্-এর জিহ্বায় ভবিষ্যদ্বাণী আটকায়নি ; এবং কর্মকাণ্ড থেকে হেতু-প্রত্যয়ের বালাই চুকিয়েও পারেতো স্বসমুত্থবাদে পৌঁছাননি, সমাজতত্ত্বই লিখে গেছেন। অগত্যা আমি মনে করি যে প্রকাশ্যে না হোক, অন্তত প্রকারান্তরে মার্ক্‌স্-ও বৃত্তির দুর্মরতা মেনে নিয়েছিলেন ; এবং তথাচ প্রগতির উপরে তাঁর আস্থা দুর্মর বটে, কিন্তু তাঁর বিরাট মতবাদের ভিত্তি নিশ্চয়ই এই বিশ্বাসে যে সভ্যতার প্রত্যেক পর্যায়ে মানুষ একই প্রয়োজনের দাস। তবে সেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় অন্যের আয়ত্তে ব'লে, সমানাধিকার নৈরাজ্যবাদের আগে সে কোনও মতে থামতে পারবে না ; এবং উক্ত কৈবল্য-প্রাপ্তির দিন-ক্ষণ যদিও অঙ্কশাস্ত্রের ধার ধারে না, তবু তার আবশ্যিকতা কায়মনোবাক্যে না বুঝলে, মনুষ্য-জাতির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ মার্ক্‌স্-এর ভাবতে বাধেনি যে তাঁর অভ্রান্ত দূরদৃষ্টি শুধু ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক নয়, তাঁর বস্তুনিষ্ঠাও অন্য সকল সিদ্ধান্তের পরিপন্থী, এবং কার্য-কারণের মার্জনীয় বিপর্যয় ঘটিয়ে সেই তন্ময় দৃক্‌শক্তিই তাঁকে দিয়ে রটিয়েছিল

যে সাবধানে যারা ইতিহাস পড়েছে, তারা অবিলম্বে দেখতে বাধ্য যে আধ্যাত্মিক সম্পদ বা ভাবের ঔদার্য ঐহিক অবস্থার উৎকর্ষ বাড়ায় না, বরং ধনোৎপাদনের পদ্ধতি ও পণ্য-বিনিময়ের প্রথা যেহেতু বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্কোচ ঘোচায়, তাই বিপ্লববিশেষের প্রেরণা মনীষীদের শ্রেয়োবোধে বা দার্শনিকদের জীবনবেদে অন্বেষ্টব্য নয়, সে-ঘটনাঘটনের সূত্রপাত তখনকার ধনবণ্টনে কিংবা তদানীন্তন অর্থশাস্ত্রে। আসলে প্রচলিত বিধি-বন্দোবস্তে যখনই আমরা আস্থা হারাই তখনই ধরা পড়ে যে নূতন ধনোৎপাদন তথা পণ্যবিনিময়পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার তাল কেটেছে ; এবং মানুষের বিবেক বা বোধি এই বিরোধনিরাকরণের উপায় জানে না, যে-অবস্থান্তরের ফলে বিরোধবিশেষের উৎপত্তি, তার মধ্যেই সামঞ্জস্য-সাধনের প্রকরণও মেলে।

এমনকি যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এই নিত্য সংঘাতের নিমিত্ত, শান্তি তার সাধ বা সাধ্যের তোয়াক্কা রাখে না ; এবং উৎপাদিকাশক্তি আর উৎপাদনপ্রণালীর অসঙ্গতি যেমন অতিমানুষিক, উভয়ের সন্ধিও তেমনি বস্তুজাত। আমাদের ভাবনা-বেদনা খুব জোর সেই প্রাকৃত ডায়ালেক্‌টিক-এর মুকুরমাত্র ; এবং সেই জন্যে অবরোহী চিন্তার দ্বারা সে-নিয়মের আবিষ্কার সম্ভবপর নয়, ঘটনানিয়ন্ত্রিত আরোহী অভিজ্ঞতাই বার বার ঠেকে তাকে চিনতে শেখে। তৎসত্ত্বেও অনেকে এখনও নিঃসন্দেহ নন যে মার্ক্‌স্ প্রকৃত প্রস্তাবে জড়বাদী, না জীববাদী, কিংবা তাঁর সম্বন্ধে রাসেল্‌-এর অনুমানই সত্য, এবং তিনি ড্যুই-প্রচারিত উপযোগবাদের আদিপুরুষ। কিন্তু সে সমস্ত সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক ; এবং এখানে আমার এইটুকুই বক্তব্য যে বিষয়-সম্পর্কে তাঁর আর বার্ক্‌লি-র সিদ্ধান্ত সময়ে সময়ে যতই এক রকম শোনাক না কেন, বিশ্বব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যের লীলা-খেলা দেখেননি, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাই তাঁর কাছে অবশ্য স্বীকার্য লেগেছিল। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে বিষয় বিষয়ীর প্রভাবে বদ্‌লায় বটে, কিন্তু বিষয়ীর কর্মপ্রবর্তনা যেকালে বিষয় থেকেই আসে, তখন তত্ত্বত বিষয়ী গৌণ আর বিষয় মুখ্য ; এবং বিষয়ীর সংস্পর্শে বিষয়ের বিকার অনিবার্য ব'লে, তার স্বরূপ যদিও কারও ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তবু তার নির্গুণ সত্তা না মানলে, আমাদের এক মুহূর্ত চলে না। ফলত ফয়েরবাখ্‌-এর বিরুদ্ধে গিয়েও মার্ক্‌স্ নিজেকে জড়বাদী আখ্যাই দিয়েছিলেন ; এবং তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয়—এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন্—বিজ্ঞানবাদের প্রতি গুরুর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত লক্ষ্য সুদ্ধ করেননি, জ্ঞানত না হোক, অন্তত অজ্ঞাতসারে মেকিয়াভেলি-র বস্তু-প্রত্যয়কেই বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। কারণ মেকিয়াভেলি-ও ইতিহাসের ভিতরে স্বধর্মনিষ্ঠ তন্মাত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন ; এবং তাই মধ্য যুগের অতিজীবিত সমাজ-ব্যবস্থা তিনি সইতে পারেননি।

অগত্যা তিনি ভজিয়েছিলেন যে ইতিহাসের সাহায্যে উপাধির আপদ কাটিয়ে একবার অব্যয়, অক্ষয় দ্রব্যগুণে পৌঁছাতে পারলে, এ-রকম আদর্শ রাষ্ট্র আপনা-আপনি গ'ড়ে উঠবে যাতে ব্যক্তিত্বের বিসংবাদ থাকবে না, স্বত্বের সংঘর্ষ বাধবে না, ত্রিকালদর্শী পদার্থবিদের নেতৃত্বে ও দ্রব্যের নির্বিশেষ ঐক্যে মানুষ মানুষকে ভাববে ভাই ; এবং বলাই বাহুল্য যে এ-রাজ্যেও বৃত্তিই একেশ্বর। অর্থাৎ তারই ফলে মেকিয়াভেলি-র বৈশেষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান একাধারে সাম্য আর স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক, গতি ও স্থিতির মুখাপেক্ষী ; এবং সেই জন্যে অহিংসায় মেকিয়াভেলি-র অভক্তি মার্ক্স্ ও পারেতো-র চেয়ে বেশী বই কম নয়। আসলে এ-ধরণের দ্বৈধ জড়বাদীর পক্ষে অনতিক্রম্য ; এবং যাঁরা ফিশ্‌তে-কীর্তিত আত্মরতির প্রতিভূকল্প নন, এমন জীববাদী যেহেতু সনাতন সাধারণ্যের ভুক্তভোগী, তাই তাঁরাও অভিব্যক্তিতে ন্যায়সঙ্গতি আনতে পারেননি, অনুমান করেছেন যে যদি অনুক্রমের নাম জপা যায়, তবে প্রগতির রথ নিরাপদে এগোবে। কেননা তাঁদের মতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেকালে মানস ধাতুতে গঠিত, আর মন স্বভাবতই পরিণামী, তখন জাগতিক ক্রমবিকাশে মানুষেরও স্থান আছে বটে, কিন্তু নিরবধি কালের তুলনায় মনুষ্য-জাতির পরমায়ু এতই সংক্ষিপ্ত যে সভ্যতার বিবিধ পর্যায়ের মধ্যে সাদৃশ্য সম্ভবত বৈসাদৃশ্যের অগ্রগণ্য ; এবং হেগেল্ এখানে থামেননি, ভাববাদে মানুষী উদ্বর্তনের অনন্ত সোপানমার্গ দেখে রটিয়েছিলেন যে সমাজজীবনের আকার-প্রকার যেমন দেশে দেশান্তরে, তথা যুগে যুগান্তরে, অবিকার থাকে, তেমনই সেই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে-উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের উপরে স্থাপিত, তার নিয়ত পরিবর্তন অনিবার্য।

টয়েন্‌বি-ও বিশ্বাস করেন যে সভ্যতায় চিরন্তন জড়প্রকৃতির স্থূল হস্তাবলেপ যতই পরিষ্কার হোক না কেন, বস্তুর অভ্যাঘাতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া চিরনির্দিষ্ট নয় ; এবং বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কে বৈচিত্র্য অনিবার্য ব'লে, একই প্রতিবেশে ভিন্ন যুগের মানুষ ভিন্ন চিৎপ্রকর্ষে পৌঁছাতে বাধ্য। কিন্তু এ-কথা মানলেও, প্রগতির পূজা আমাদের আদ্যকৃত্য নয় ; এবং তথ্যের গরজে যদি সংস্কৃতির স্তরভেদ স্বীকার্যই ঠেকে, তবু সত্যের খাতিরে এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য যে সভ্যতার পর্যায়পরম্পরায় কোনও কালাতীত গুণের তারতম্য ধরা পড়ে, অথবা সেগুলোর জাতি-বিচারে অগ্র-পশ্চাৎ ব্যতীত অপর কোনও পার্থক্য দ্রষ্টব্য। বিপরীত সিদ্ধান্ত আপাতত জাত্যভিমানের ফল ; এবং জাত্যভিমান কেবল নাৎসী বিজিগীষারই শনি নয়, দুর্দমনীয় জার্মানির মতো পরাধীন ভারতও ভাবে যে সেই সভ্যতার জন্মভূমি। দুর্ভাগ্যবশত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সম্প্রতি যেমন মহেঞ্জো-দড়োর খবর শুনেছেন, তেমনই মায়া সংস্কৃতির বার্তাও আর তাঁদের কাছে গোপন নেই ; এবং মিশর আর মায়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য সত্ত্বেও অব্যাহত আদান-প্রদানের অসুবিধা দেখে আমরা যখন সে-দুই ভূখণ্ডের আত্মীয়তা মানি না,

তখন নীল নদের গভীর কর্দমে সিন্ধু দেশীয়দের পদাঙ্ক-সন্ধান হয় অসাধ্যসাধনের নামান্তর, নয় আত্মপ্রসাদের সাক্ষ্য। আসলে ইতিহাসের উপরে কার্যকারণের আরোপ হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা ; এবং প্রাচীন পৃথিবীও যেহেতু একেবারে দুর্গম ছিল না, তাই এক স্থানের সামগ্রী পর্যটকদের মারফৎ স্থানান্তরে যেত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরা অপরিচিত বস্তুর বা ভাবের যথাযথ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই শিখত না, প্রায়ই তাকে নূতন কাজে লাগাত। উদাহরণত জ্যামিতির পুরাবৃত্তান্ত স্মরণীয় ; এবং অহিন্দু গবেষকেরাও বৈদিক সাহিত্যে তার সাক্ষাৎ পান বা না পান, অনুরূপ ভূয়োদর্শনের সাহায্যে গ্রীক্‌রা শুধু বেদি বানায়নি, সে-নিষ্প্রমাণ প্রাচ্য বিদ্যার ভিত্তিতে তারা গ'ড়ে তুলছিল পাশ্চাত্ত্য প্রজ্ঞার অটল কীর্তিস্তম্ভ।

হিন্দুস্তানী গাড়ু, ঘটি বা বদ্‌নার ভাগ্যবিপর্যয় আরও রোমহর্ষক ; এবং অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের সঙ্গে কালাপানি পেরিয়ে সেই লজ্জাকর শুদ্ধিপাত্র আর আঁস্তাকুড়ের আশে-পাশে লুকাতে চায় না সগৌরবে চ'ড়ে বসে ড্রইং রুমের সমুচ্চ সেল্‌ফে। অবশ্য উত্তমর্ণ আর অধমর্ণের এতখানি বৈপরীত্য সর্বত্র চোখে পড়ে না ; দুই পক্ষ যেখানে একই অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানে সমীক্ষার বিস্তার যদি কমানো যায়, তবে একটা ধারাবাহিকতার আভাস হয়তো ক্বচিৎ-কদাচিৎ মেলে ; এবং সেই জন্যে হোয়াইট্‌হেড্‌-প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীরা পশ্চিমের দর্শনে-বিজ্ঞানে আজও প্লেটো-র স্বাক্ষর খোঁজেন। কিন্তু এ-কথা তাঁদের মুখেও বাদে যে আধুনিক য়ুরোপ প্লেটোনিক্ অ্যাথেন্স্‌-এর প্রতিচ্ছবি ; এবং ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পরেও চীন ও জাপানের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন যে-পরিমাণে স্বকীয়, য়িহুদী-প্রস্তাবিত খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে মুস্‌লিম্‌-প্রচারিত মনুষ্যধর্ম ঢুকিয়ে প্রতীচ্য ততোধিক স্বতন্ত্র। কারণ জাত্যভিমান যতই নিন্দনীয় হোক না কেন, জাতির বৈশিষ্ট্য নিরতিশয় নিশ্চিত ; এবং এই পার্থক্যের কষ্টিপাথরে উত্তম-অধমের যাচাই চলে না বটে, তবু মানুষের আচার-ব্যবহার, তথা মতিগতি, এর দ্বারা এতখানি নির্ধারিত যে দেখে শেখা প্রায়ই তার সাধ্যে কুলায় না, সে সাধারণত ঠেকেই শেখে। অথচ সে মানুষ ; এবং মানুষী সমস্যার সবগুলোই তাকে আজীবন ঘিরে থাকে। কেবল সমাধানের বেলায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া তার বারণ ; এবং প্রত্যেক প্রশ্ন নিজের বুদ্ধিতে বুঝে, নিজের উপায়ে সকলের দাবি না মেটালে, সে নিজেকে সজাগ রাখতে পারে না, জীবন্মৃত্যুর অগাধে তলায়। অতএব সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যক্তির বৈষম্যে ভাঁটা লাগে, তখন জাতির যৌবনসুলভ তেজ ফুরিয়ে তাকে বর্তায় বার্ধক্যোচিত অনীহা, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের প্রেরণা ভুলে সে মজে স্মৃতির কুহকে, স্বাবলম্বীদের নির্বাসনে পাঠিয়ে সে কান পাতে সংখ্যাধিকের পরামর্শে ; এবং তার পর প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত তার মাথায় ঢোকে না, উপযাচকের আবেদন তার গোচরে আসে না, সে ম'রে প্রেতত্ব পায়, আর কণ্ঠহারা ছায়ামূর্তি নিয়ে জীবিতদের সামনে প্রহেলিকার মতো ভেসে বেড়ায়।

অন্ততঃপক্ষে তাই ভিকো-র বিশ্বাস ; এবং সেই বিশ্বাসের পিছনে মনোবিদেরা ভিকো-র নিঃসহায় শৈশব ও অক্ষম জরার খোঁজ পেয়েছেন বটে, কিন্তু গত দুশ বছরের গভীর গবেষণাতেও এমন কোনও অবিসংবাদিত তথ্য বেরোয়নি যার ফলে এলিয়ট্-স্মিথ্-এর "সংস্কৃতিব্যাপন" আজ সর্ববাদিসম্মত ঃ বরঞ্চ সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্বে আমাদের জ্ঞান বাড়ায় আমরা নিঃসংশয়ে জেনেছি যে মানুষের ঐতিহ্যবোধ ইতিহাসের চেয়েও পুরাতন ; এবং "সাফোক্ অস্থিস্তর"-এর উপরে দাঁড়িয়ে ময়র, লীকি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভজিয়েছেন যে প্লায়োসীন্ যুগেই ডার্ম্স্ডিনীয়ান্, আইসিনীয়ান্ ও প্রীশেলীয়ান্-নামক তিন-তিনটি সংস্কৃতি বহু সহস্র বৎসর ধ'রে পূর্ব অ্যাংলিয়াতে পাশাপাশি বসবাস ক'রেও কিছুমাত্র বদ্‌লায়নি, বা পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যে হাত দেয়নি। উপরন্তু সংস্কৃতির স্বাধিকার প্রাগিতিহাসের সাক্ষ্যেই গ্রাহ্য নয়—ভিকো-র গুরুবিস্মৃত শিষ্য স্পেংলার সভ্য জাতিদের ইতিহাসেও অনুরূপ অবৈকল্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন ; এবং মুখ্যত পশ্চিমের ও গৌণত প্রাচ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ সংস্কৃতিধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তাঁকে দেখিয়েছে যে মানবসভ্যতা শাখা-প্রশাখাযুক্ত মহামহীরুহ নয়, তার গতিবিধি কম্বুরেখায় আঁকা যায় না, সে তুলনীয় অবচ্ছিন্ন, উত্থান-পতনশীল, যৌবন-জরাসম্পন্ন, স্বল্পায়ু ব্যক্তির সঙ্গে। এমনকি এ-উপমাও আংশিকভাবে সত্য ; এবং বংশরক্ষার ক্ষমতা আছে ব'লে, মুমূর্ষু মানুষ যদিচ খানিকটা মৃত্যুঞ্জয়, তবু জাতিগত সভ্যতা সর্বত্র অপুত্রক, তার মৃত্যু পুরোপুরি বিলুপ্তি। সুতরাং সভ্যতা মণ্ডলাকার ও সীমাবদ্ধ ; এবং তার স্বভাব চক্রবর্তী ও আত্মঘাতী। অর্থাৎ তার জীবনের প্রথমার্ধ বর্ধিষ্ণু আর শেষার্ধ ক্ষীয়মাণ ; যেখানে তার যাত্রারম্ভ, সেখানেই তার যাত্রাশেষ ; এবং তার উন্নতি তথা অবনতি একই অন্তঃপ্রেরণার অবশ্যম্ভাবী ফল।

স্পেংলারী পরিভাষায় উক্ত আরোহণ-পর্বের নাম সংস্কৃতি আর অবরোহণটা সভ্যতা-অভিধেয় ; এবং তাঁর বিশ্বাস যে এই নাগরদোলার ওঠা-পড়া মনুষ্যজাতির জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যেহেতু কোথাও কখনও থামেনি, তাই এর গতিবিধি যারা নিরাসক্ত মনে বুঝতে চেয়েছে, সৃষ্টির মূল রহস্য তাদের কাছে সুপরিস্ফুট। কারণ কীর্তিমান মনুষ্যগোষ্ঠীর এক-একটা এক-একটা নক্ষত্রের মতো, যার প্রত্যেকটাই বিকর্ষণগুণে অন্যদের থেকে একেবারে পৃথক বটে, কিন্তু আচরণে ও আয়তনে তাদের মধ্যে এতখানি সৌসাদৃশ্য বর্তমান যে অপর সকলের প্রতিমান হিসাবে কোনওটা নগণ্য নয়। অধিকন্তু স্পেংলার-এর মতে সকল সভ্যতার কার্যক্রম যেমন এক, তেমনি সেই কার্যক্রমের নির্বাহকেরা সমানধর্মী, হয়তো বা আকৃতিতেও অভিন্ন ; এবং সেই জন্যে দুটো সভ্যতার সংমিশ্রণ বা অন্তঃপ্রবেশ যতই অনাবশ্যক ও অভাবনীয় লাগুক, আবেষ্টনবিশেষের অবরোধে আর পাঁচটা পরিবেশের পরিকল্পনা সার্থক ও সম্ভবপর। তবে সভ্যতার ব্যষ্টিসমূহ তুল্যমূল্য শুধু সমস্যার দিক থেকে ; এবং যখন জোর পড়ে সমাধানের উপরে, তখন তাদের বৈচিত্র্য অনস্বীকার্য। অতএব এই প্রভেদ প্রতিপাদনের

জন্যে, পাউলি-প্রস্তাবিত ব্যাবর্তন-বিধির ঐতিহাসিক প্রয়োগ প্রশস্ত নয় ; এবং সকল জাতির জীবনে যদৃচ্ছার চাপ সমমাত্রিক হলেও, ভবিতব্যের বিচারে তাদের বৈষম্য স্বতঃপ্রমাণ। উক্ত পার্থক্যের ব্যাখ্যায় স্পেংলার প্রাচীনদের বিশ্বাত্মিক পটভূমির সঙ্গে অর্বাচীনদের আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতের বৈরূপ্য দেখিয়েছেন ; এবং তাঁর বিচারে সভ্যতার এ-দুই পর্যায়ে অনুরূপ প্রয়োজন আনুষ্ঠানিক সৌসাদৃশ্য ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রীকো-রোমান্-দের দৈবানুগত্য আর আধুনিক য়ুরোপীয়ান্-দের স্বাবলম্বন স্বভাবত এতই পরস্পরবিরোধী যে কবিরা উভয়ত্র যদিও একই তাগিদে ট্র্যাজেডি লিখেছেন, তবু সে-দু রকম ট্র্যাজেডির তাৎপর্য একেবারে আলাদা।

অবশ্য দুটো সম্পূর্ণ সভ্যতাব্যষ্টির বৈপরীত্যও কালাবর্তের বৃত্তাভাস কিনা, অথবা ভূত-ভবিষ্যতের সকল সভ্যতাকে পাশাপাশি সাজালে, একটা চিরন্তন উত্থান-পতন ধরা পড়ে, না পড়ে না—সে-সম্বন্ধে স্পেংলার-এর দর্শনে কোনও হঠোক্তি নেই ; এবং সরোকিন্-এর বিরাট পাণ্ডিত্য পারেতো-র প্রভাব কাটাতে না পেরে মানুষের অতীত বিবর্তনে একটা একান্তর ছন্দের সন্ধান পেয়েছে বটে, তবু সে-ছন্দের মূল সূত্র জানবে হয়তো মনুষ্যগোষ্ঠীর সর্বশেষ প্রতিনিধি। কিন্তু ইতিমধ্যে রুথ বেনিডিক্ট্ প্রাক্সভ্য সমাজেও রূপকল্পের স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতা দেখেছেন ; এবং তাঁর মতে সেই রেড ইণ্ডিয়ান্ রূপক অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যাতে প্রত্যেক জাতি একই প্রাণপ্রবাহ থেকে তৃষ্ণার জল তুলেছিল ঈশ্বরদত্ত বিভিন্ন মৃৎপাত্রে। কারণ মানুষের সামনে অনন্ত সম্ভাবনা খোলা থাক বা না থাক, যে পরের মুখ চেয়ে বাঁচতে চায়, তার পক্ষে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অর্জনীয় ; এবং আমাদের কণ্ঠ থেকে যত আওয়াজ বেরোয়, আলাপের সময়ে সে-সবগুলোর প্রয়োগ যেমন অর্থবোধের আশাকে বিড়ম্বনায় পরিণত করতে বাধ্য, তেমনি শক্যতামাত্রেই যদি শক্তি-রূপে ফুটে উঠত, তবে বাইবেলী সৃষ্টি-বর্ণনার সঙ্গে ভূপঞ্জরবিদ্যার বিবাদ কোনও দিন বাঁধত না, প্রাণিবিজ্ঞানীরাও প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরিবর্তে ভাগবত দাক্ষিণ্যেরই গুণ গাইতেন। আসলে মানুষী জ্ঞানের বর্তমান জটিলতায় সে-রকম সারল্য আর পোষণীয় নয় ; এবং তাই টয়েন্‌বি-র মতো সাম্যবিলাসীও আজ অগত্যা মানেন যে পরিবেশের ক্রিয়া সকল জাতির পক্ষে যতই অভিন্ন হোক, ক্ষেত্রবিশেষে তার প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই পৃথক।

সারা পায়ে জুতোর ঘর্ষণ লাগলেও, যখন কড়া পড়ে শুধু দু-একটা জায়গায়, সেকালে চার দিক থেকে অনুরূপ আক্রমণ সয়েও পৃথক্ পৃথক্ জাতি যে স্ব স্ব উপায়ে তাদের সামর্থ্য দেখাবে, তাতে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ নেই ; এবং জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সাদৃশ্যই এখানে সুপরিস্ফুট। কারণ আডলার-এর মতে একই উত্তরাধিকারে জ'ন্মে, একই শিক্ষা পেয়ে দুই ভাই যেমন তাদের নিজ দেহের অসম্পূর্ণতা-বশত দু ধরণের মেজাজ বেছে নিয়ে সেই মৌলিক ক্ষতিপূরণের চেষ্টায় নামে, তেমনই

টয়েন্‌বি-র বিবেচনায় দুটো জাতির বাহ্য পরিমণ্ডলে আপাতত কোনও তারতম্য না থাক, তাদের বিশ্ববীক্ষায়, তাদের জীবনবেদে, তাদের শ্রেয়োবোধে সারূপ্যের কোনও আভাস মেলে না ; এবং তৎসত্ত্বেও টয়েন্‌বি প্রগতিতে আস্থাবান এই জন্যে যে তাঁর বিচারে সভ্যতার মশাল বারংবার হাত বদ্‌লেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক আলোকপ্রাপ্ত জাতি তাকে আপন আগুনে জ্বালেনি, উদ্বর্তনের কুটিল পথে অগ্রগামীরা বয়সোচিত অবসাদে যখন ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে, তখন কোনও পশ্চাদ্বর্তী তরুণদল ছুটে এসে তাদের বোঝা আরও দু-এক পাক এগিয়ে দিয়েছে। অতঃপর অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এই অজ্ঞাতকুলশীল স্বেচ্ছাসেবকেরা পরমায়ুতে ও পরাক্রমেই পুরশ্চারীদের সমকক্ষ, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ অগ্রজদের চেয়ে অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক ; এবং তাই ক্ষিপ্রতার প্রতিযোগিতায় এদের সাময়িক উৎকর্ষ হয়তো বা অনিবার্য। পক্ষান্তরে স্থিতিসাম্যেরও সীমা তথা প্রকারভেদ আছে ; এবং সম্প্রতি জেরালড হর্ড যদিও লিখেছেন যে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করতে পেরেই মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের প্রাগ্রসর শাখা এখন মনুষ্য-পদে প্রতিষ্ঠিত, তবু কীথ-এর ন্যায় সাধারণিক নৃতত্ত্ববিদও সৌজাত্যবিদ্যার ঠেলায় আজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মানুষের জাতিগত বিভাগ প্রাঙ্‌মানুষিক অনৈক্যের পরিণাম।

ওই প্রভেদ ভৌগোলিক নয় ; এবং নিসর্গের নির্দেশ এত নেতিবাচক যে দ্বৈপায়ন জাতি-মাত্রেই নৌবহরে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী নয়, শুধু যে-দেশের ত্রিসীমানায় জলের নাম-গন্ধ নেই, সেখানে পোতনির্মাণের প্রয়োজন স্বভাবত অনুপস্থিত। এমনকি শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত—এই তিন মহাজাতির বিশেষ বিশেষ দৈহিক দোষ-গুণও যে অন্তর্বিবাহের পরে একাকার হয় না—এ-রকম নিরুক্তি শুধু নাৎসী-দের সাজে ; এবং যদি তর্কের খাতিরে মানি যে নীল চোখ, কটা চামড়া, সোনালী চুল ইত্যাদি উপলক্ষণগুলো মেণ্ডেলীয় নিয়মের আজ্ঞাধীন, তবু আমাদের বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি, আমাদের মেধা ও মনীষা যে প্রকৃতির দান নয়, পালনের ফল, সে-বিষয়ে আজ অধিকাংশ পণ্ডিত বোধহয় একমত। তথাচ সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গেও বিশেষজ্ঞদের বিবাদ নেই যে রক্তের চাতুর্বর্ণ্যে সঙ্করের উদ্ভব অসম্ভব ; এবং যে-পুরুষানুক্রমিক রোগ মাথার গড়ন বা চ্যাপ্টা নাকের মতো একাধিক ক্রোমোসোম-এর বশবর্তী, বহির্বিবাহের দ্বারাও তার প্রতিকার দুঃসাধ্য। উপরন্তু সন্তানপোষণের রীতি-নীতি শুধু পিতা-মাতার ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, তার উপরে প্রতিবেশীদের প্রভাবও যথেষ্ট ; এবং যে-নিগ্রোর মার্কিনে জন্ম, সে যেমন বর্ণ বৈষম্য সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের কুটুম্ব, তেমনই মিশনারী প্রচেষ্টা যেহেতু কাফ্রিদের এখনও সাহেব বানাতে পারেনি, তাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে-পরিমাণে অনুপকারী, স্বদেশী ইন্দ্রজাল সেই অনুপাতে মঙ্গলময়। অবশ্য আবহ সকল ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতাশালী নয় ; এবং বর্তমান জগতে

পশ্চিমের প্রতিপত্তি পরিব্যাপ্ত ব'লে, প্রবাসী য়ুরোপীয়দের ছেলে-মেয়েরা আপাতত স্বধর্মানুসারেই বেড়ে ওঠে বটে, কিন্তু আজীবন প্রাচ্যে কর্মঠবৃত্তি বজায় রেখে তারা যখন শেষ বয়সে স্বজনের মাঝে ফেরে, তখন তাদের অনেকে আর স্বস্তি পায় না, নিজ বাসভূমিতেও কাল কাটায় বিদেশিসুলভ সঙ্কোচে।

হয়তো সেই জন্যে জীববিদ্যার পূর্বাচার্যেরা পারিপার্শ্বিককে কুলসংক্রামের উপরে স্থান দিয়েছিলেন ; এবং যান-বাহনের ক্ষিপ্রতায় আর যন্ত্রপাতির আশীর্বাদে পৃথিবীর প্রাথমিক বৈচিত্র্য ক্রমেই মিলিয়ে আসছে বটে, কিন্তু মানুষের শরীরে যত দিন জল-বায়ুর প্রভুত্ব খাটবে, তার চারিত্র্যে যত দিন আত্মীয়-বন্ধুর স্বাক্ষর থাকবে, তার ব্যবসা যত দিন সামবায়িক সঙ্কল্পের মুখ চাইবে, তত দিন সে যে কী উপায়ে গোষ্ঠীর গণ্ডি খণ্ডাবে, অন্তত আমার কাছে দুর্বোধ্য। অবশ্য আমার বোধশক্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ; এবং আমি বুঝি বা না বুঝি, ভূমাবাদী হেগেল-এর মতো ভূয়োদর্শী মার্কস-ও নির্ভাবনায় রটিয়েছিলেন যে গুণ তো গণনার অমোঘ পরিণতি বটেই, এমনকি পরস্পরবিরোধী পদার্থের সমন্বয় সেধেই সৃষ্টি কৈবল্যের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মর্যাদাবিচারে আমার স্থান উক্ত তত্ত্বজ্ঞদের যত নীচেই হোক না কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা অক্ষমতার ফল ; অন্ততঃপক্ষে তার পিছনে কোনও সর্ববাদিসম্মত যুক্তির সমর্থন নেই ; এবং বিপরীতধর্মী পিতা-মাতার সঙ্গম সন্তানসম্ভাবনার একমাত্র উপায় ব'লে, যদি অ্যারিস্টটেলী তর্কশাস্ত্র অর্বাচীনদের কাছে অস্বীকার্যই ঠেকে, তবে অশ্বেতরের ক্লৈব্যও নিশ্চয় ডায়ালেক্‌টিক্ ন্যায়দর্শনের পরিপন্থী। হয়তো এ-আপত্তির আশঙ্কা মার্ক্‌স্-এর মনেও সতত জাগরুক ছিল ; এবং তাই তিনি কখনও আন্বীক্ষিকী নিয়ে মাথা ঘামাননি, সেই শ্রেণীসংরক্ষিত রহস্যের সামান্যীকরণ শিষ্যদের স্কন্ধে চাপিয়ে নিজে ডায়ালেক্‌টিক্-এর ঐতিহাসিক নিদর্শন-সংগ্রহে প্রাণপাত করেছিলেন। তবে অত গবেষণার পরেও ডায়ালেক্‌টিক্-এর ঐকান্তিক প্রগতি অদ্যাবধি অপ্রমাণিত রয়েছে ; এবং গত পাঁচ শ বছরের পাশ্চাত্ত্য ইতিবৃত্তে তার সাক্ষ্য যেমন নিঃসন্দেহে মেলে, তেমনই তৎপূর্ববর্তী যুগ, তথা অত্যাধুনিক কাল, স্পষ্টতই মার্কসীয়দের বিপক্ষে।

তাছাড়া ইতিহাস একা য়ুরোপেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, তাতে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেরও স্বত্ব আছে ; এবং উন্নতিসূচক নির্দ্বন্দ্বের দাবি যখন রোম্ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেই অশোভন, তখন অন্যত্র সে-আদর্শের গুণগান ভূতের মুখে রামনামের চেয়েও শ্রুতিকটু। আসলে মানুষের বয়স এত অল্প যে তার মতিগতি-নিরূপণের সময় এখনও আসেনি ; এবং ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জেনেছি, তাতে তার উদ্বর্তন আর পরিবর্তন, এ-দুটোর কোনওটা নিঃসংশয়ে ধরা পড়ে না—কেবল এই পর্যন্ত বিনা প্রশ্নে মানা যায় যে স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতার প্রতিবিধান-কল্পে সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাত্রায় পৌঁছেও সে যেহেতু শ্রমবিভাগ ব্যতীত সামাজিক শক্তির অপব্যয় আটকাতে পারেনি, তাই তার বিধিলিপিতে সঙ্কলনের প্রবৃত্তি যত না প্রবল,

বিকলনের প্রয়োজন ততোধিক প্রকট। আমার অনুমানে মানুষের জাতিগত বৈষম্য উক্ত শ্রম-বিভাগের ফল ; এবং প্রকৃতিপূজার আধিক্য আমার চোখে হাস্যকর ঠেকুক বা না ঠেকুক, প্রাণিমাত্রেই শ্রেয়োবোধের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় তো দেয় বটেই উপরন্তু শ্রমবিভাগের বৃহত্তম সংস্করণ বোধহয় বহুলাঙ্গ জীবলোকে। এমনকি জড়জগতেও কেউ কেউ শ্রমবিভাগের সন্ধান পেয়েছেন ; এবং অনেক জ্যোতিবিজ্ঞানীর মতে অভিব্যাপ্ত বস্তুর আদিম অবিচ্ছেদ কেবল আয়তনগুণেই আজ অসংখ্যাত নীহারিকায় বিদীর্ণ। কিন্তু শুধু বিশ্লেষ শ্রমবিভাগের সার কথা নয়, যোগ-বিয়োগের তাৎকাল্যেই তার প্রতিষ্ঠা ; এবং বস্তুবিশ্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিসাম্য ঘটলেও, তার দুর্নিবার বিস্ফোটন শেষ পর্যন্ত যদি সত্যই প্রত্যেক তারাপুঞ্জকে নিঃসঙ্গ ক'রে তোলে, তাহলে জড়ের রাজ্যে সংযোগপ্রসূত শ্রমবিভাগের সুব্যবস্থা খোঁজা আমার বিবেচনায় পণ্ডশ্রম। কারণ শ্রমবিভাগ আর গৃহবিবাদের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান বর্তমান ; এবং যে আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখে, সে নিজের তথা সমাজের শত্রু।

স্বাবলম্বীর সময়নষ্ট যেহেতু অবশ্যম্ভাবী, তাই সমাজভুক্ত জীব বিভিন্ন বৃত্তির স্বাতন্ত্র্য মানে ; এবং অনধিকার চর্চার লোভ সে সামলায় শুধু এই প্রত্যাশায় যে আপনার গতর খাটিয়ে অপরের একটা প্রয়োজন মেটালে, অন্যেরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার সকল অসুবিধা ঘোচাবে। অর্থাৎ যথোচিত শ্রমবিভাগের অন্যায় প্রতিযোগের স্থান নেই ; এবং মোটর চালাতে পারে না ব'লে, কৃষক লাঙল ধরে না, হলচালনায় নিজেকে স্বভাবত ব্যুৎপন্ন ভেবেই সে যখন স্বেচ্ছায় মাটি চষে, তখন চীন-জাতি শৌর্যের অভাব-বশত তিতিক্ষার মন্ত্র জপে না, অন্তঃপ্রেরণার প্ররোচনায় সৌজন্যকে পৈশুন্যের চেয়ে শুভঙ্কর জেনেই তারা বর্বরদের আস্ফালন যথাসাধ্য সয়। তবে নিরুপায় কবি তো সওদাগরী অফিসের খাতা লিখতে বাধ্য বটেই, চীনেরাও বন্দুক ছুঁড়তে অপারগ নয় ; এবং সে-অবস্থায় ডায়ালেক্‌টিক্ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখা যতই সহজ ঠেকুক, সভ্যতা যে প্রাগ্রসর এ-রকম মন্তব্য কেমন যেন বেসুর শোনায়। ফলত আজকাল অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে মার্ক্‌স্ হয়তো হেগেল্-কে ঠিক পায়ের উপরে দাঁড় করাতে পারেননি, বরং সেই চেষ্টায় আপনি উল্‌টে পড়েছিলেন ; এবং সম্ভবত সেই জন্যে তিনি বোঝেননি যে জগতে সত্যই যদি ডায়ালেক্‌টিক্ খাটে, তবে তার গতি বিরোধ থেকে সমন্বয়ে, অথবা দুই থেকে, একে নয়, তার শ্রেঢ়ী অখণ্ড থেকে খণ্ডে, শৃঙ্খলা থেকে সংঘাতে, স্বভাব থেকে অভাবে। অর্থাৎ যে-নিয়মে জীবকোষ নিরন্তর বাড়তে পায় না, একটা প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট অবস্থায় পৌঁছে দু-ভাগে ভেঙে পড়ে, সেই বিধির অনুসারেই জাতি তথা ব্যক্তির প্রাথমিক একাগ্রতা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বুদ্ধির জন্ম দেয় ; এবং সেই দ্বন্দ্বের দোষে জাতির বেলা বর্ণাশ্রম যেমন শ্রেণীসংঘর্ষে বদ্‌লায়, তেমনই ব্যক্তির—বিশেষত শিল্পী ব্যক্তির—ক্ষেত্রে কল্পনা হারায় সঙ্কল্পে।

কেন এমন ঘটে, তার নৈয়ায়িক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার অজ্ঞাত ; এবং আমি যেকালে স্বয়ং হেগেল্-এর অপ্রমেয় প্রত্যয় মানতে অসম্মত, তখন আমার স্বপক্ষে সোরেল্-এর সাক্ষ্য নিশ্চয়ই কেউ শুনতে চাইবেন না। কিন্তু সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, সুখ-শান্তির প্রলোভনে চোখ বুজে, ধনিকদের চক্রান্ত-প্রসূত রামরাজ্যের মায়া কাটিয়ে, রূপকথার নিয়োগে প্রতিনিয়ত মাতিয়ে বেড়ানো শ্রমিকদের কর্তব্য হোক বা না হোক, ক্ষীয়মান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রোগনিদানে সোরেল্-এর মতামত খুব সম্ভব অকাট্য ; এবং স্টালিন্-ভক্তির আতিশয্যে দু-চার জন সম্প্রতি সোরেল্-কে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেলেও, গত কয়েক বছরের রুশ রাষ্ট্রদ্রোহীদের নাম, সংখ্যা ও স্বীকারোক্তি দেখার পরে অন্তত বস্তুনিষ্ঠেরা আর বলবেন না যে ত্রিভুজই জীবনযাত্রার যথাযথ প্রতিকৃতি, অথবা তার ধর্মবাদী ও বিবাদীর বিসংবাদ-মোচন। কারণ প্রাণপ্রবাহ আসলে একটা ঘূর্ণাবর্ত, যার কেন্দ্রে অবস্থিত নাস্তি আর পরিপার্শ্বে বর্তমান অসেতু শূন্যতা ; এবং চক্রচর সমাজ শুধু অর্ধপথে গন্তব্যবিমুখ নয়, এমনকি অন্তর্বিক্ষোভের প্রাবল্যে তার খানিকটা যদিও মাঝে মাঝে ছিটকে যায়, তবু সে-ছিন্নাংশ যেহেতু ভ্রমিমূলক, তাই তার কলামাত্রেই একাধারে আত্মস্থ ও আত্মবিস্মৃত। সম্ভবত সেই জন্যে ক্যাথলিক্ ও প্রটেস্ট্যান্ট-এর প্রাথমিক মনান্তর কালক্রমে ব্যাপকতর ধর্মানুষ্ঠানে সন্ধি পাতেনি, তাদের ব্যবধান যুগে যুগে এত বেড়েছে যে ইদানীং তারা পরস্পরের অস্তিত্ব ভুলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে নব নব সংঘাতের সৃষ্টি করছে ; এবং ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক আজ তো বিলুপ্তপ্রায় বটেই, উপরন্তু সমানাধিকারে উভয়ের সমন্বয় দূরের কথা, সম্প্রতি ধনতন্ত্র যেমন অবাধ প্রতিযোগ ও একচেটিয়া ব্যবসার দোটানায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তেমনি সমাজতন্ত্র আবার ট্রট্স্কি-স্টালিন্-এর দ্বৈরথযুদ্ধে কণ্ঠগতপ্রাণ।

সুতরাং নাৎসী পাশবিকতা হয়তো চির দিন টিকবে না ; এবং আজ অন্ধ বা অসবর্ণ উদারনৈতিকেরা না বুঝে তাকে যতই প্রশ্রয় দিন, কাল পুনরুজ্জীবিত রোয়েম্ নিশ্চয়ই তার সর্বনাশ সাধবে। হয়তো তারপর আসবে কোনও কনিষ্ঠতর ব্যষ্টির পালা ; এবং সে-আপদ চুকতে না চুকতে ঘুণ ধরবে পশ্চাদ্বর্তী পর্যায়ের সর্বাঙ্গে। কারণ বুঝি বা এণ্ট্রোপি ঘটিত তাপমৃত্যুতে শুদ্ধ এ-বৈকল্যের শেষ নেই ; এবং সংসারের বিশ্লেষ অব্যবস্থার চরমে পৌঁছেই থামবে না, এমনকি বৌদ্ধ সংবর্তের মহাশূন্যেও ঘুরে বেড়াবে নিরবলম্ব বৃত্তি। ইতিমধ্যে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিনির্বাণের অকালবোধন যাঁদের অনভিপ্রেত, পরের স্বভাব শোধরানোর বৃথা চেষ্টায় প্রগতিও তাঁদের প্ররোচিত করবে না : তাঁরা জানবেন যে জনসাধারণকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজালেও, যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘোচবার নয়, তখন আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মচিন্তাই নিশ্চয় বেশী লাভজনক ; এবং প্রতিবেশীর উপরে গায়ের জোর ফলিয়ে তাকে যদিও দাবানো যায়, তবু তার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত আপন স্বায়ত্তশাসনের আশা বিড়ম্বনা। আমার বিশ্বাস সাযুজ্য নয়, এই

দ্বৈতবোধেই সাম্যবাদের উৎপত্তি ; এবং যে-মানুষ সত্যই নিজেকে চেনে, তার কাছে যেমন স্বীয় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সে এ-জ্ঞানেও বঞ্চিত নয় যে জীবমাত্রেই বৈশেষিক ব'লে তার বৈশিষ্ট্যও অবশ্যস্বীকার্য। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই সম্পূর্ণ একক, আমরা অদ্বিতীয় শুধু নাতিসামান্য ক্ষমতার জোরে ; এবং ক্ষমতাবিশেষ যেহেতু বিশেষ অক্ষমতার প্রতিবাদী, তাই সর্বত সকলের মূল্য সমান, ব্যষ্টিও আসলে সাধারণ দোষ-গুণের দেশকালগত সমষ্টি। পক্ষান্তরে আত্মদর্শন আত্মধিক্কারের পরিপন্থী ; এবং তার কারণ এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রসাদ না চোকে, ততক্ষণ যথার্থ আত্ম-প্রত্যয়ের উপলব্ধি অসম্ভব।

মানুষ যখন দেখে যে তার ইন্দ্রিয়ার্থ আর অন্য সকলের ইন্দ্রিয়ার্থ তুল্যমূল্য, পার্থক্য শুধু অবস্থানে, সে যখন জানে যে তার জন্মসংস্কার আর অন্য সকলের জন্মসংস্কার মুখ্যত অনুরূপ, প্রভেদ কেবল সেই সংস্কারসমূহের পদবিন্যাসে, এবং এই রকম বিশ্লেষণে একটার পর একটা উপসর্গ খসাতে খসাতে সে যখন আপনার মূল ধাতুতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন আর তার সন্দেহ থাকে না যে সে এমন একটা অনির্বচনীয় আদিভূতের সম্মুখীন যা তার আয়ত্তের বাইরে, যাকে সে কোনও দিন মানেনি, অথচ যার বাধা তাকে আজীবন যথেচ্ছাচারে বিরত রেখেছে। অতঃপর তার চোখে প্রকৃতি-পুরুষের একাকার ঘটে, স্বরূপ বিশ্বরূপে বদ্‌লায় ; এবং সে বোঝে যে এ-দুটোর একটাও যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকে অন্যোন্যনির্ভর, তাই ব্যক্তির পক্ষে অর্জন-বর্জন সমান, এমনকি শুধু মরমী সাধক কেন, মানুষমাত্রেই ম'রে বাঁচে। কিন্তু এই আত্মবিসর্জনজাত আত্মোপলব্ধি যদৃচ্ছার দান নয় ; এবং তাতে যদি কায়মনোবাক্যের সমর্থন না থাকে, তাহলে সে-ত্যাগ যেমন বৃদ্ধের চিত্তবৃত্তিনিরোধের মতো শোচনীয়, তেমনই ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির পরিণাম ম্রিয়মাণ সভ্যতার মতো লজ্জাকর। বলা বাহুল্য যে ফাশিস্ট রাষ্ট্র যেহেতু একাধারে বহির্জগতের প্রতিপালনসাপেক্ষ ও অন্তর্জগতের দৌর্বল্য-সূচক, তাই তার সংস্রবে পৃথিবীর বিসংবাদ কমছে না, বরং অনৈক্য বাড়ছে ; এবং কম্যুনিস্ট-রা নিত্যের মর্যাদা দেয় না, মিথ্যা মিথ্যা ভাবে যে নিমিত্তের তারতম্য ঘুচলেই, ব্যক্তিত্বের বিষ ফুরাবে। তবে তারা হয়তো জানে যে স্বভাবারোপিত সাম্যও অবিবেকীর প্রাপ্য নয়, সামবায়িক সঙ্কল্পের পুরস্কার ; এবং তৎসত্ত্বেও সার্বভৌম প্রভুত্বের মায়া কাটিয়ে, স্বাবলম্বনে ব্যক্তি ও জাতির জন্মগত অধিকার তারা স্বীকার করতে পারে না বোধহয় এই জন্যে যে তাদের বিবেচনায় তারাই অনিবার্য প্রগতির অভ্রান্ত অগ্রদূত। কিন্তু বিশ্বমানবের দীক্ষা মনুষ্যধর্মের অমর জপমন্ত্রে ; এবং মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ শুধু উভবলী নয়, একটার বাদে অন্যটা নিরর্থক।

সংস্কৃতির গোড়ার কথা

গোপাল হালদার

সংস্কৃতির যে রূপান্তর হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে—এই সহজ সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানেন না ; আবার অনেকে মানিয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চাহেন না। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম কথা, সংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায় তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। কেহ মনে করি, সংস্কৃতি বলিতে বুঝায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণা। কেহবা মনে করি—আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ; সে সম্পর্কীয় ভাবনা-ধারণা, নীতি-নিয়ম, এই সবও উহার অন্তর্গত। কেহবা উহাদের কোনো একটি জিনিসকেই সব বলিয়া ধরিয়া লইবেন। যেমন, কেহ বলিবেন ধর্মই হইল সংস্কৃতি, ধর্ম সর্বব্যাপক। কেহবা অপর কোনো জিনিসকে মনে করেন মুখ্য কথা। যেমন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইহাকেই বলেন 'কাল্‌চার'। তাই সংস্কৃতির অর্থ কি, তাহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি, প্রথমত, এই কথাটাই আমাদের পরিষ্কার করিয়া জানা প্রয়োজন।[১]

মূল একটি কথা স্পষ্ট—সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবনসংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সেই জীবনযাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে

১। বাঙলা 'সংস্কৃতি' শব্দটি এই গ্রন্থে বরাবরই ইংরেজী 'কাল্‌চার' শব্দটির প্রতি-শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানি, শব্দটি নূতন গঠিত। ইহার বয়স চল্লিশ বৎসরের বেশী নয়। তৎপূর্বে 'কাল্‌চার'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে কখনো 'অনুশীলন' কখনো বা 'সভ্যতা' ব্যবহার করিয়া অনেক সময়ে কাজ চালাইতে হইত। মাঝে 'কৃষ্টি' শব্দটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনো 'কৃষ্টি' সেই অর্থে অচল হয় নাই। কাল্‌চার শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্মক 'কৃষ্টি' শব্দ তৈয়ারী করা অন্যায় নয়। অবশ্য 'কৃষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্দ ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিস্মৃত। সেই অর্থ ছিল 'সমুদয় কৃষকদল'। (দ্রষ্টব্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি' ১ম ভাগ, পৃঃ ৬১)। 'সংস্কৃতি' শব্দটিও বৈদিক। 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে মানুষের 'কৃতির' বা সৃষ্টিমূলক সক্রিয় প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা সর্ব যুগের মানুষের উপযোগী। যে কারণেই হোক, কাল্‌চারের প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি' অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলনও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। 'সংস্কৃতি' এখানে সেই ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেই মোটামোটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃতির রূপ ও রঙও পরিবর্তিত হয়। আবার সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার সঙ্গে নূতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধ যখন দেখিতে পাই তখনি বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয়,—তাহার রূপান্তর ঘটে।

সংস্কৃতির বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি তাই এই—কোন্ নিয়মে সংস্কৃতির রূপান্তর চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া, পরিবর্তনের মূল তত্ত্বটির পরিচয় লওয়া। ইহার ফলে সংস্কৃতির মোট অবয়ব ও অবলম্বন কী, কী তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক, তাহাও

বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তথাপি প্রশ্ন শুনিতে হয়, 'সংস্কৃতি' শব্দটির কি অর্থে প্রয়োগ হইল? ইহা কি 'কাল্চার' বুঝায়? না বুঝায় 'সিভিলিজেশন'? নাৎসিতন্ত্রের দার্শনিক প্রবক্তা ওটো স্পেংলারের কৃপায় 'কাল্চার' ও 'সিভিলিজেশনের' মধ্যে একটা অচল প্রাচীর কল্পনা করা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইতেছে। 'কাল্চার'-এর মূল কথা—ব্যক্তিসত্তার ও জনসত্তার প্রাণময়, গতিময় বিকাশ অভীপ্সা। আর 'সিভিলিজেশনের' অর্থ সংগঠিত, পল্লবিত সমাজের সুস্থির স্থাণুত্বকামিতা।—এই মর্মে ব্যবধান টানা তথাপি শুধু অর্ধ সত্য নয়, উহাকে বিকৃত করা, মিথ্যারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। বলা বাহুল্য, সিভিলিজেশন মূলত পৌর-সদাচার। কিন্তু পৌর-জীবন ও পৌর-সংস্কৃতির উদ্ভব বাস্তব কারণে ঘটে। কেন্দ্র বিশেষে তাহার পতন ঘটিলেও পৌর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দাম তুচ্ছ নয়, তাহা শেষও হইয়া যায় নাই। বরং পৌর-সংস্কৃতির নব নবরূপই বিকশিত হইয়াছে, এবং পল্লী-সংস্কৃতি ও পৌর-সংস্কৃতির সমন্বয়েরও পথ এই কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও ব্যবস্থাপনায় সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কোন কোন পৌর সভ্যতায় জরা-মরণ ঘনাইয়া আসিল এই জন্য যে—সেখানে সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ও বিরোধে ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর পৌর-জীবনের আর্থিক প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিজয়-শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি বহির্বিরোধেও উহার আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল (দ্রষ্টব্য ভি, গর্ডন চাইলডের Man Makes Himself)। অতএব, 'কাল্চার ও সিভিলিজেশন'-এর নামে স্পেংলারী গবেষণা বা আধুনিক পৌর-সভ্যতার বিরুদ্ধে পল্লী-সভ্যতার 'বিকেন্দ্রীকরণ' প্রভৃতি প্রচারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে ঐসব শব্দের পার্থক্য প্রদর্শনের আপেক্ষিক প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু মুখ্যত ও কার্যত কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। এই গ্রন্থে অবশ্য আমরা 'সিভিলিজেশন' শব্দটির জন্য সাধারণ অর্থে 'সভ্যতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি; বিশেষ অর্থে উহাকে 'পৌর-সংস্কৃতি' দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম সংস্করণে 'কৃষ্টি' শব্দটি পরিহাসচ্ছলে (বাঙলার কাল্চার অধ্যায়ে) প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এবার সেইরূপ অর্থে উহার প্রয়োগ হইল না। এই সংস্করণে 'কৃষ্টি' বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইল 'লোক-সংস্কৃতি' বুঝাইতে; কিংবা প্রাথমিক কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি বুঝাইতে; এবং স্থলবিশেষে সেইরূপ কৃষিজীবীদের শিল্পসামগ্রী বুঝাইতে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে কালচারেরও বিশেষ অর্থ আছে, তাহা না বলিলেও চলে। সাধারণভাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি কাল্চারের প্রতিশব্দরূপে প্রযোজ্য।

বুঝিতে পারি। সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা তখন প্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্যের দিকে তখন একবার লক্ষ্য করিতে হয়,—দেখিতে হয় ইতিহাসের স্তরে স্তরে সংস্কৃতির কোন্ কোন্ রূপ কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহাই এই প্রসঙ্গের শেষে প্রয়োজনীয়—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির পরিচয় সাধন। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহের পরিচয় লওয়া ; বুঝিয়া লওয়া ইতিহাসের ধারা কোন্ দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, কোন্ দিকে বহিয়া চলিয়াছে—আমাদের দেশেই বা তাহা কোন্ খাত হইতে কোন্ খাতে বহিয়া আসিতেছে। ইহা বুঝিলে আর সন্দেহ থাকে না—দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কোন্ নূতন রূপ আজ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারাও চলিয়াছে আজ কোন্ দিকে।

সংস্কৃতির অর্থ কি?

সংস্কৃতির অর্থ কি, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ—মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি ; এই 'কৃতির' বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা—বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইহারই নাম জীবিকা-চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য করা। দৈহিক মানসিক প্রয়াস-প্রযত্নে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করিয়াছে—এই প্রয়াস-প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার এক-একটি উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি ; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।

জীব-জগৎ প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। সে নিয়মকেই আপনার নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহারা বাঁচে, তাহারা মরে। কিন্তু মানুষ জীবজগতের মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। বাঁচিবার উপায়—জীবিকার উপাদান—সে নিজেই পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে, নিষ্ক্রিয় হইয়া প্রকৃতির একান্ত মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই, সে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে কি করিয়া জীবনযাত্রা তাহার সুলভ হয়, প্রাণধারণ তাহার

সহজ হয়। এই লইয়াই তাহার বিপুল প্রয়াস, অফুরন্ত পরিশ্রম আর প্রকৃতির শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হইয়াছে, জীবিকার তাড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সভ্যতার সংস্কৃতিতে ততটুকু নিদর্শন মিলে। তাই, এই সভ্যতা বা সংস্কৃতিই তাহার সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহ্ন ; আবার ইহাই তাহার জয়-অস্ত্র।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই যুদ্ধাস্ত্রেরও আবার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পর্যায় দেখা গিয়াছে, জয়-চিহ্নও হইয়াছে বিচিত্রতর।

সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ

গোড়াতেই তাহা হইলে দেখিতেছি—এই ভাবে আমরা সংস্কৃতিকে সাধারণত বুঝিতে চাহি না। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার, বড় জোর এখন বিজ্ঞানও। কখনো আমরা ভাবি সংস্কৃতি দেশগত, কখনো বা ভাবি তাহা কালগত। যেমন, কখনও আমরা বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা। কিংবা আরও খণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গালার কাল্‌চার, 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি', 'ভাগীরথী-সভ্যতা' ইত্যাদি (এইসব ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটি 'কাল্‌চার' অর্থে যদৃচ্ছা ব্যবহার করি)। অথবা ধর্ম ও জাতিগত সূত্র ধরিয়া বলি 'হিন্দু সংস্কৃতি', 'ব্রাহ্মণিক কাল্‌চার', 'মোসলেম সভ্যতা' ইত্যাদি। আবার কখনো কালের হিসাব মনে রাখিয়া বলি প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, ইত্যাদি। এই সব হিসাব অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি পরস্পরবিরোধীও নয়—কিন্তু এইরূপ হিসাব খুব যুক্তিসঙ্গতও নয়। যেমন, ভারতীয় সভ্যতা বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সভ্যতাও আসে ; আবার তাহাতে প্রাচীন সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধ্যযুগের সভ্যতাও তেমনি বুঝাইতে পারে।

এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য বা প্রকৃতি বুঝা সম্ভব হয় না ; উহাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি এইরূপ নাম-দানে সুবিধা অনেক—জনমন সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, আর তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা বা 'গ্রুপ প্রাইড' বেশ তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু সেই সূত্রে সেই নাম-মাহাত্ম্য আমাদের মনে এমনি এক-একটা কমপ্লেক্স বা মোহের ঘূর্ণি সৃষ্টি করে যে, আমরা ভুলিয়া যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কী, তাহার মূল কোথায়, আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বা কি দিয়া নির্ণীত হয়। তাই এক এক জাতি বা জন-যূথ ধরিয়া লয়—এই মূল আছে তাহার রক্তে। সে রক্ত 'নর্ডিক' রক্ত হইতে পারে, 'ল্যাতিন' রক্ত হইতে পারে, 'আর্য' রক্তও হইতে পারে, এমন কি 'বাঙালী রক্ত'ও হইতে পারে। কেহ

বা আবার বলে, তাহার সংস্কৃতির মূল আছে তাহার ধর্মে—ইসলামে, হিন্দুত্বে অথবা খ্রীষ্টধর্মে কিংবা ভূতপূজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি মত নির্ণয় করিয়া ফেলে। কোনো সংস্কৃতির নাম দেয় 'আধ্যাত্মিক', কোনো সংস্কৃতিকে বলে 'জড়বাদী'। হইতে পারে গোষ্ঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা আছে; আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকের থাকে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য প্রায়ই আপেক্ষিক, কাহারও 'একান্ত' নয়। আর, সে 'বৈশিষ্ট্য'ও আবার নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়। তাহা ছাড়া, সংস্কৃতির মূল বিচারে, রূপ-নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব নিতান্তই গৌণ। সেখানে মুখ্য কথা এই—জীবনযাত্রার কোন্ সৌকর্য-সাধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের যে-অফুরন্ত প্রয়াস মানুষের, তাহার কোন্ স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয়?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা তাই সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহারা দেখিতে পান সংস্কৃতির অর্থ এই—মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিও অত্যন্ত বাস্তব—জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা। কথাটাও তাই পরিষ্কার—জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয়, সংস্কৃতিরও তেমনি পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তাহার পরিবর্তন চলে।

এই কথাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝা দরকার—মানুষ নিজেও পরিবর্তিত হইতেছে; আর মানুষ ও তাহার পরিবেশ দুই-ই পরিবর্তনের স্রোতে পরস্পরকে পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে রাখা ভালো 'মানুষ পরিবর্তিত হয়', এই কথাটি কি অর্থে সত্য। মানুষের নাক-মুখ-চোখ মোটামুটি সব একই আছে (অবশ্য প্রত্যেকেরই আবার এই সবদিকেও একটু না একটু বৈশিষ্ট্য আছে)। মানুষের আবেগ-কামনা, ক্ষুধা, জরা-মরণ,—তাহাও তো ঠিকই আছে। তবে মানুষ পরিবর্তিত হয় কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, মানুষ যেই পরিমাণে পশুপক্ষীর মতো মাত্র জীব সেই পরিমাণে সে প্রকৃতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির নিয়মের অধীন; সেই পরিমাণই তাহার পরিবর্তনও হয় না। সে আহার চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতেও ভয় পায়, সঙ্গম খোঁজে। কিন্তু মানুষ তো শুধু মাত্র জীব নয়, সে আপনার জীবিকা আয়ত্ত করিয়াছে, আর্থিক জীবন গড়িয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে সে নানারূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে। সে অন্য জীবের মত আহার করে, কিন্তু কত রকমে সে আহারও প্রস্তুত করে। সে সন্তান চায়, আবার কতকটা সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে পারে। সে মৃত্যুতে ভয় পায়, কিন্তু আবার অনেকাংশে ভয়কেও দূর করিতে পারে। ভূতপ্রেতের ভয়, পশু-শ্বাপদের ভয় কাটাইয়াও মানুষ উঠিতেছে। সে পুত্র-পরিবারের জন্য, দেশ ও সমাজের জন্য, এমন কি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাধনায় মৃত্যু বরণও করে। সে যৌন-কামনার অধীন, জরামরণের অধীন; কিন্তু তাহাও আবার কত ভাবে

ছাড়াইয়া উঠে, বিচিত্র করিয়া তোলে। এই সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবনা ও অবকাশ। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের জৈবধর্ম বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উহার প্রকাশভঙ্গী ও শক্তির মাত্রা পরিবর্তিত হয়,—যাহাতে তাহা জীবনযাত্রার বেশী সহায়ক হইয়া উঠে তাহা চায়। এইরূপেই জৈবধর্ম প্রথমত মনুষ্যপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। তাই সেই জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানুষের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হয়, তেমনি তাহার প্রবৃত্তিও আবার বিকশিত হয়, বিচিত্র হয় ; নূতন ভঙ্গীতে, নূতন শক্তিতে সংযমে-নিয়মে প্রকাশিত হয়। এই অর্থেই মনুষ্য-প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। মানুষ শুধুমাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে এই প্রকৃতি পরিবর্তিত হইত না। মানুষের আর্থিক জীবন না থাকিলে, সাংস্কৃতিক জীবন না থাকিলে, তবেই থাকিত শুধু তাহার পশুর জীবন—যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা নিজের পরিবেশকে বদলাইতে পারে না, নিজেও পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মানুষ, আর ঠিক সেই কারণেই মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

এই পরিবর্তন অবশ্য জানায়-অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। সাধারণত তাহা মানুষের চোখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হইতে অন্য এক স্তরে মানুষ নিত্য উত্তীর্ণ হয় না। সেইরূপ বিরাট ভাঙা-গড়া, বিপুল বিপ্লব ঘটে এক-এক যুগের শেষে এক-একবার। সেই যুগান্তরে সমাজের দেহান্তর হয়, আর সংস্কৃতিরও হয় রূপান্তর। তাহাতে মানব-প্রকৃতিও আপনার বিকাশের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া যায়, আর বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের বিজয় স্বীকার করিয়া আরও একটু নতি স্বীকার করে।

এইভাবে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি। সে প্রস্তরযুগের মানুষ আজ আর নাই। শিল্পযুগের মানুষ এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে সচেতন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, এখনো তবু প্রকৃতির একাংশও মানুষ জয় করিতে পারে নাই। আর একটি কথা—প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সংঘাত একেবারেই যেমন জন্মগত, তেমনি মনে রাখা দরকার মানুষও প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। বিশ্ব-প্রকৃতিরই এক বিশিষ্ট শক্তি মানবপ্রকৃতি। প্রকৃতিরই সেই বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দাঁড়ায় আবার প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে। আর সে দ্বন্দ্বে প্রথম চালায় বাহুপদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও মস্তিষ্কের দ্বারা, দেহের স্বাভাবিক বলে—প্রকৃতিজাতকে আপনার প্রয়োজনানুরূপে পরিবর্তিত করিয়া লইতে। অন্য জীবের এই সব দৈহিক সুবিধা নাই, তাই তাহারা প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধা। আবার বহিঃপ্রকৃতির সহিত এমনি প্রয়াসে এমনি ভাবে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়াই মানব-প্রকৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যায় : "He (man) opposes himself to nature as one of her own forces 2 setting in motion the arms and legs, head and hands,

the natural forces of his body, in order to appropriate nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature." (*Capital*—Marx, Vol. I. Pt. III, Ch. vii, Sec I.)

রূপান্তরের মূলতত্ত্ব

সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্ত্বটি এইবার জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, ইহা না হয় মানিলাম। কিন্তু কেন, কী নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে তাহা না জানিলে,—কোন্ কোন্ দিকে মানব-সমাজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই সংস্কৃতির আগামী রূপান্তরে কোন্ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং কোন্ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে,—তাহা বুঝিতে পারিব না। এই সত্য না বুঝিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েত প্রয়াস সার্থক হয়, কেন ফ্যাশিস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য ; কেনই বা এই সোভিয়েত প্রয়াসের আবির্ভাব, আর কেনই বা তাহার সঙ্গে পুরাতন অন্য তন্ত্রের, বিশেষ করিয়া প্রতিক্রিয়া-নেতা ফ্যাশিতন্ত্রের বিরোধ অনিবার্য ; কেনই বা ফ্যাশিতন্ত্র পরাজিত হইলেও মার্কিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়া-শক্তি এখন মূলতঃ সেই শোষণনীতিকেই আশ্রয় করিতেছে ; এবং কেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকার জাতিসমূহ রাষ্ট্রীয় শোষণের অবসান ঘটাইয়া এখন আর্থিক স্বাধীনতার বুনিয়াদ গড়িতে চাহিতেছে ; কেন সাম্রাজ্যবাদও বাধ্য হইয়া কোথাও তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিভাগ বা দেশ-বিভাগ সৃষ্টি করিয়া, কোথাও আর্থিক 'সাহায্যের' বেড়াজাল ফেলিয়া আপনাদের শোষণধর্মী ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে ; এবং নূতন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এইসব কথা পরিষ্কার হইয়া যায় সভ্যতার রূপান্তরের মূলতত্ত্ব বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার-বিতর্কের অন্ত নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব টিকিয়া গিয়াছে। এখানে শুধু তত্ত্বটি জানিয়া সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষের ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে—বুঝিতে পারিব সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

মানুষের সামাজিক জীবন ও মানুষের অন্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম মানিয়া চলে তাহা 'আধ্যাত্মিক' নয় নিতান্তই 'বাস্তব'। অবশ্যই এই বস্তুবাদের মতে 'মন' যে নাই তাহা নহে ; মনও আছে, তবে তাহা বস্তুরই এক বিকাশ। বস্তুই মূল জিনিস

আর পৃথিবী এবং মানুষ সবই বাস্তব। কিন্তু বুঝিবার মতো কথা এই—কিছুই জড় নয়। বস্তুও জড় নয়, প্রকৃতিও জড় প্রকৃতি নয়—তাহাও চঞ্চল, পরিবর্তনমান, নূতন নূতন আবির্ভাবের উৎস।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ জ্বলিতেছে, তাহারই ফলে সেই নূতন নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব—ইহাই বিজ্ঞানেরও সাক্ষ্য। বস্তুপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্জরে এক ঘূর্ণির হাওয়া লাগিয়াই আছে—বৈজ্ঞানিক এই সন্ধান দিয়াছেন। উহার নিত্য নূতন তথ্য তাঁহারা আবিষ্কারও করিতেছেন। বিশ্বের মূল উপাদান খুঁজিয়া তাঁহারা একদিন পাইয়াছিলেন—ইলেকট্রন ও প্রোটোন ; এখন আরও সন্ধান পাইয়াছেন নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন (মসন), এবং সম্ভবত নিউট্রিনের। সূক্ষ্মতর আরও আবিষ্কারও হয়তো হইবে। তবে এই সব উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তুর। অবশ্য সেই নূতন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্ত থাকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তাহাই আবার ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়, আবার বাধে সংঘর্ষ, আর তাহার সমাধান হয় নূতনতর আবির্ভাবে। এমনি করিয়া দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে চঞ্চল বস্তু আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের তাগিদে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকার দ্বন্দ্বে হঠাৎ দেখা যায় জল। জলকে শুধু হাইড্রোজেনও বলা যায় না, অক্সিজেনও বলা যায় না ; দুই-ই উহাতে আছে, কিন্তু উহা জল হিসাবে একটা নূতন বস্তু। আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে এক সময়ে বাষ্প হইয়া হঠাৎ উড়িয়া যায়। জলও তাপ মাত্র নয়, বাষ্পও আবার একটা নূতন বস্তু। বস্তু-চাঞ্চল্যের মূলে আছে এই দ্বন্দ্ব, আর অভ্যন্তরীণ সেই দ্বন্দ্বের বশে বস্তু এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে। কণিকার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে (quantitative change) শেষে পুরানো বস্তুই একেবারে নূতন ধরণের, নূতন গুণযুক্ত (qualitative change) বস্তু হইয়া উঠে ; আর সেই নূতন বস্তুর মধ্যে তখনকার মতো মিলাইয়া যায় পুরানো বিরোধ। কিন্তু দ্বন্দ্বই যখন মূল ধর্ম তখন এই দুই নিয়মই অনুসরণ করিয়া নূতন বস্তুও নূতনতর হইবে। হইতেছেও তাহাই। তবে পুরাতন হইতে নূতন, বা নূতন হইতে নূতনতর ধাপে সে সমুত্তীর্ণ হয় আকস্মিক রূপে—একটু বড় রকমের বাধা ডিঙাইয়া—এক উৎক্রান্তিতে ('Jump')। মানুষের সমাজে এই উৎক্রান্তিরই নাম—বিপ্লব। ইহারই বশে হয় বিরোধের সাময়িক বিনাশ, নূতনের আবির্ভাব,—আবার নূতনের বুক ফাটিয়া নূতনতরের জন্ম ইহাই 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ', (ডায়েলেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্)। শুধু বিশ্ব-প্রকৃতিতে নয়, মানুষের ইতিহাসেও এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মিলে ; এ জন্যই ইহাকে আবার বলা হয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', (হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্)।

বস্তুর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহৎ বিপ্লব ঘটে যখন পৃথিবীতে প্রাণবীজ বস্তুকেন্দ্রে জন্মাইল—যাহাকে প্রাণবিজ্ঞান নাম দিয়াছে প্রোটোপ্লাজম্। বস্তু হইতে প্রাণ,

দূরত্বটা ভাবিলে আজ সংশয় জন্মে বটে ; কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্ বস্তুর বড় নিকটবর্তী। একবার প্রাণের আবির্ভাব হইলে পর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুপ্রগতির যে ইতিহাস শুরু হইল, ডারউইনের শিষ্যবর্গের কল্যাণে তাহা এখন সুবিদিত, এবং আজ অবিসবাদিত। প্রাণের আবির্ভাবে প্রাণীর 'জীবন-সংগ্রাম' চলিল। তখনো কিন্তু প্রাণী অচেতন। সেই অচেতন প্রাণীর জগতে শেষে হঠাৎ চেতন প্রাণীর আবির্ভাব হইল—যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মানুষ। কিন্তু চেতনাহীন প্রাণী হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি—প্রাণিজগতে উহা আর এক সুবৃহৎ বিপ্লব। এখানেও হয়ত আবার আমাদের মনে সংশয় হানা দেয়। কিন্তু চেতন প্রাণী হইতে ক্ষীণ-চেতন, প্রায়-অচেতন ও অচেতন প্রাণীদের ক্রম-পর্যায় বাহিয়া নামিলে কথাটা অসম্ভব মনে হয় না। বস্তুবিকাশের শেষ দান কিন্তু মানুষের এই ক্রম-পরিস্ফুট চৈতন্য—যাহার বলে সে বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়াও বস্তুকে আপনার দাস করিয়া লইতে শিখিতেছে ; প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা হইয়াও প্রকৃতিকে বন্দিনী করিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহার বুকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব, বিরোধের নব-নব সূত্র তাহারও সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুস্যূত হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্যদিয়া অগ্রসর হয়, নূতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। আর এই উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সংকট (crisis) এবং বিপ্লবের (revolution) পথ,—ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য। 'অমিত্রয়ের' বেনামীতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এমনি ধরণের কথা আমাদের জানাইয়াছেন তাঁহার অনবদ্য ভাষায়—যদিও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বমূলক বা বিপ্লবী বস্তুবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন ঃ "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালাগাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ, এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

ইতিহাসের সাক্ষ্য

বিশ্বনিয়মের পূর্বোক্ত মূলসূত্রটি যাঁহারা না মানিতে চান তাঁহারাও এইরূপে স্বীকার করেন ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ বিপুল উৎক্রান্তির সাক্ষাৎ মিলে। মানুষের ইতিহাসের তলায় কোন শক্তি জমিয়া উঠিয়া তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেয়, বস্তুপ্রগতির সূত্র না জানিয়াও তাহার আভাস পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করিলেও যে তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাই যথেষ্ট। দেখিয়াছি মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তাহার জীবিকা প্রয়াস হইতে ; কিন্তু কিছু পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণী-বিরোধের কাহিনী, দ্বন্দ্বমূলক প্রগতির কাহিনী।

প্রাণীবিজ্ঞানের যাঁহারা ছাত্র তাঁহারা জানেন, সাধারণ জীবেরা প্রাণধারণের জন্য নিজ নিজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশ-বিজ্ঞানই (ecology) জীব-জগতের বড় শাস্ত্র। কিন্তু মানুষের বেলা এই পরিবেশ বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থবিজ্ঞানে। ecology-র স্থান লইয়াছে economics। ইহার সূচনা হইয়াছে সেদিন যেদিন মানুষের আদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত ; উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত দৃষ্টিশক্তি। মননশীল মানুষের (হোমো সেপিয়ান্) পক্ষে দুই হাত ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার তখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের অবলম্বন (means) সে নিজে উৎপন্ন করিতেই অপরোক্ষভাবে মানুষের জীবন-যাত্রার বস্তু-উপকরণও (material) উৎপন্ন হইল। "They begin to differentiate themselves from animals as they begin to produce their means of subsistence, a step which is conditioned by their physical organisation. By producing their means of existence men indirectly produce their material life itself". (*German Ideology*—Marx-Engels)।

সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আর্থিক উদ্যোগ। সেই জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় সর্বদাই খোঁজে, সমাজ তাহার আর্থিক বুনিয়াদ বারে বারে বদলায়। কারণ প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেইতো লুক্কায়িত আছে বিরোধের বীজ। এক-একটা ব্যবস্থা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে তাই সমাজের মধ্যে উৎপাদন-শক্তির (forces of production) তেজ এত বাড়িয়া যায়, তাহা এত প্রবল হয় যে, তখন পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থাৎ পরস্পরের উৎপাদন সম্পর্ক (production relations) আর সেই উৎপাদন-শক্তিকে সেই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যেই দ্বন্দ্ব বিশ্ববস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রূপে দেখিয়াছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। কিছুতেই কিন্তু পুরানো ব্যবস্থা আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নূতনকে সে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কর্তাব্যক্তিরা অর্থাৎ প্রভুশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে না, নূতন শক্তিধর শ্রেণীবিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়া লয়, প্রভুর শ্রেণীতে উঠিয়া গিয়া নিজেদের উৎপাদনপ্রথা প্রচলিত করে। এইরূপে বারবার নূতন শ্রেণী জয়ী হয়, পুরাতন প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। অবশ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক সৃষ্টিও চুরমার হয়—তাহার ধ্যান-ধারণা, ভাবনা চিন্তা, সাহিত্য, সুকুমার-কলা, রস-নিদর্শন, যাহা কিছু সৌধশিখরের মুকুট-শোভা, সমাজ-সভ্যতার পরম গরিমা! উপায় নাই, যাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। সান্ত্বনা এই যে, নূতন ভিত্তি গড়া হইতেছে ; আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর। আরও সান্ত্বনার কথা—পুরানো সংস্কৃতি তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির

সারবস্তু ও সৃষ্টিকলা নূতন স্রষ্টার প্রয়োজনানুরূপ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে—তাহা বিলুপ্ত হইবে না, প্রয়োজনমত মিশিয়া নবায়িত হইয়া উঠিবে, নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রূপে সঞ্জীবিত হইবে। সমাজ এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া আবার কিছু দিনের মতো স্থির হইবে, গড়িয়া উঠিবে নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় তদুপযোগী মানস-সম্পদ ; হইবে পুরানো সংস্কৃতির রূপান্তর।

ইতিহাসের মুখ্যরূপ

মোটামুটি মানুষের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস। পুরাতত্ত্বের, নৃতত্ত্বের ও সমাজ-তত্ত্বের গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমরা অবশ্য সাধারণভাবে শুনি—নানা কারণেই মানুষের ইতিহাস নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণে, কোন ধর্মপ্রচারকের ধর্মপ্রচারে। তদনুযায়ী রাজা-রাজড়ার রাজ্যারোহণ বা রাজ্যচ্যুতি দিয়া আমরা ইতিহাসের কাল নির্দেশ করিয়া থাকি ; কিংবা কোনো রাজবংশের রাজ্যপ্রাপ্তি বা কোনো বিশেষ শক্তির রাজ্যাধিকার দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি। বলি, আকবরের আমল কিংবা হিন্দু-রাজত্ব বা মুঘল-যুগ। এসব একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা জানি,—তথাপি আবার মনে রাখা দরকার, এসব গৌণ। এসবেও ইতিহাস প্রভাবিত হয়, কিন্তু ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আর্থিক অবস্থার, আর তাহারই জন্য ইতিহাসের মুখ্যরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম।

বিশ্বচরাচরের এই বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বটি বুঝিয়া লইলে সংস্কৃতির মূল উপাদান ও উহার রূপান্তরের নিয়ম সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। গোড়াতেই দেখিয়াছি—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বুনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। কিন্তু কেহ যেন মনে না করি—আর্থিক অবস্থাই সংস্কৃতির একমাত্র ব্যাখ্যা। মূলত তাহা প্রধান বস্তু, কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি থাকে।

সংস্কৃতির তিন অঙ্গ

সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শুধু যে রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়—চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়,—তাহাও আমরা

জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি—মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই।

প্রথমত উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means) ; দ্বিতীয়ত সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure) ; আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস-সম্পদ। সেই মানস-সম্পদ এই হিসাবে সমাজ-সৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (superstructure), সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্‌চার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধসত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়—এইটিই আসল কথা।

সমাজের রূপ ঃ উপাদানের দান

সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা আবার জাতি বা ধর্ম দিয়া নির্দেশ করি। কিন্তু একটু পিছনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও ধর্মের ঠিকানা দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিহ্নিত করি বৈজ্ঞানিক উপায়ে—তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (means of living) দিয়াই তখনকার সমাজের পরিচয়। যেমন, আমরা বলি প্রস্তর যুগের মানুষ—প্রস্তরের ছুরিকা, বল্লম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অস্ত্র। স্বর্ণ ও তাম্রযুগের মানুষ—প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার তখন ইহারা শিখিয়াছে। শেষে বলি লৌহযুগের মানুষ—লৌহের উপকরণও ইহারা ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মানুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল জানি না ; কিন্তু বুঝি ইহারা কী উপকরণ দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। আর সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, ঐ উপাদান হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি।

সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব ঃ বাস্তব উপকরণ

আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের বা লৌহ যুগের মানুষ ছিল 'অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপাদান তবু তাহারা আয়ত্ত করিতেছে,

পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সূত্রে ভাবভঙ্গী ছাড়াও অন্যরূপ প্রণালী (কণ্ঠধ্বনি) আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বিশেষ বিশেষ অর্থে এক-একটা শব্দকে প্রয়োগ করিয়া 'ভাষা' নামক অদ্ভুত মানস-সম্পদেরও অধিকারী হইয়াছে। এক কথায়, এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের গণনায় তাই তাহাদেরও 'সভ্যতার' নাম আছে ; উপাদান দিয়াই সেই নাম স্থিরীকৃত হয়। কারণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, ইহাদের বিচারের উপাদান—ইহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্য ও পানীয়-পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই, এখনো অন্য উপায়ে ইহাদের কথা জানিবার পথ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এইসব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রামাণিক রূপও (টাইপ) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরনের (টাইপের) উপকরণ মিলে তাহারা একযোগে তাঁহার নাম দেন সেই 'কালচার' বলিয়া। যেমন, সোয়ান নদীর উপত্যকার 'সোয়ান কালচার'—পাথরের একটা বিশেষ ধরনের কৃতি তাহাতে দেখা যায়।

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাদের সামাজিক বা মানসিক গঠনেরও একটা আভাস আমরা লাভ করিতে পারি। আহার, শিকার প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনে নানা উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু উপকরণের নির্মাণে ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্যও হয়ত এক-একটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। তাহার অনুসরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রভৃতি নির্মাণ চলে। সেই সামাজিক ঐতিহ্যের আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আলতিমারা ও দর্দঞ্রর গুহা-চিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্তু। কারণ, মানুষ ও তাহার জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার বস্তু, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ-সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে—জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথবিন্যাস গঠন করিয়া চলে,—তাহারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবনযাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক, উহা দিয়াই সমাজের মুখ্য পরিচয় ; ধর্ম, জাতি এইসব দিয়া সমাজের নামকরণ, এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয় অবয়ব ঃ সামাজিক রূপ

কিন্তু প্রশ্ন হইবে উপকরণ হইতে না হয় উৎপাদন-প্রথা অনুমান করা গেল, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু উহা হইতে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাওয়া যাইবে কি করিয়া ? ইহার উত্তর এই যে, মানুষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাই না, সেখানেও মানুষের মানসিক গঠনের কিছু পরিচয়

তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়া শিকার করিয়া খাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বাঁধিয়া দুর্বল বা বৃদ্ধ পশুকে তাড়া করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া খাইত, শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের মনে ক্ষুধা, পশু, শিকার, দল—এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষিকর্ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মনে নদী, মেঘ, ঋতু, জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, আশা-আকাঙক্ষার বড় বিষয়। মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও বেশী পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে—তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচারবিচার, উৎসব অনুষ্ঠান জানিলে।

যে মানস-সম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলিয়া থাকি,—যেমন দর্শন, কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেই যুগে মানুষের সেই সব রূপের খোঁজ পাই না সেখানেও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ অনুমান করিতে পারি—প্রথমত, সে যুগের জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত, তাহার সামাজিক রূপ হইতে। কোন যুগে জীবনযাত্রা তাই কী-কী প্রধান উপকরণ দিয়া নির্বাহ হইত, তাহা জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে যুগের সংস্কৃতি কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছিল। জীবনযাত্রার উপকরণ দিয়া এই পথে প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান করিতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) মানুষও মৃতসন্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধি মধ্যে খাদ্য পানীয় রক্ষা করিত। তাহাতে বুঝিতে পারি—'মানুষ মরে না', 'অমর' এরূপ একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মিয়াছে। শুধু তাহা নয়, লাখ খানেক বৎসর পূর্বেকার মানুষ তাহার পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে এমন করিয়া সযত্নে পালিশ করিত যে তাহা দেখিয়া বুঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতির প্রমাণ উপকরণ দেখিয়া 'অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদান অপেক্ষাও মানুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক রূপে। যে যুগে আসিয়া সংস্কৃতির এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদান মিলে, অর্থাৎ যে যুগে সমাজ-ব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধুমাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়াই সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ করা আরম্ভ হয়। যেমন, পশুচারিক (Pastoral) সভ্যতা, কৃষিমূলক (agricultural) সভ্যতা। অবশ্য, এই সব সভ্যতার বা সংস্কৃতিরও আরও স্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আবার নূতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তরভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের নূতন প্রয়োজনের চিরন্তন তাগিদ।

"The special manner by which this union (between worker and means of production) is accomplished, distinguishes the different economic epochs from one another," (*Capital*—Marks, Vol. II, Kerr end p. 44) কোনো যুগের উপকরণ কি বিশেষভাবে প্রয়োগ করিয়া যে যুগের মানুষ জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই-সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই সে যুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীত হয়।

শেষ অবয়ব : মানস-সম্পদ

কিন্তু যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ সেখান হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেরও আমরা প্রায়ই সন্ধান পাই। আচার অনুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোন মূর্তি বা বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে সেই সব যুগের মানস-ইতিহাস খুলিয়া দেয়। নিজেদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি-সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে আমরা বড় মনে করি না বটে, কিন্তু যখন এইসব প্রাচীন বা আদিম জাতির এই গীত, গান, নৃত্যের বা চিত্রের হিসাব লই তখন আমরা উপলব্ধি করি সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান, নাচ, বা কৃষিজীবির গান, নাচ, তাহার পশুপালন বা তাহার কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এইরূপ জীবিকা-প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবেই রচিত। ঐসব মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃতি পূর্ণতর হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে কড্‌ওয়েল রচিত 'ইল্যুশন এণ্ড রিয়েলিটি' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

পরস্পরের সম্পর্ক

বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন জীবিকার নূতন উপকরণ আবিষ্কার করাতে জীবনযাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,—তাহাতে সমাজ সম্পর্ক নূতন হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে, আর উহারই ফলে মানসিক ক্ষেত্রের নূতন চেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে,—তেমনি আবার মানসিক ক্ষেত্রের সেই নূতন চেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টিও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার নূতনতর উপকরণ আবিষ্কারে ও নূতনতর বাস্তব সৃষ্টিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে,—তাহার সামাজিক জীবনযাত্রাকেও ঐরূপ সৃষ্টির পক্ষে নূতনভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণা দিয়াছে। এইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি পরস্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়ভাবে এক ক্ষেত্রের সৃষ্টি অন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টিকে

পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। তাহাতেই আবার সমস্ত সংস্কৃতি উন্নত, ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে—থামিয়া থাকে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ ও মানসিক সম্পদ, এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিযুগে সেই যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে।

উপমা দিলে বলা যায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফুল ফল ; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও তাহার শাখা-প্রশাখা ; আর জীবিকার উৎপাদন-প্রথা যেন সেই গাছের মূল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভুলিবার নয়। ফুলই যে গাছ বা কাণ্ড এই কথা মনে করিলেও ভুল হইবে। আবার মূল ও কাণ্ড হইতে ফুলকে একেবারে নিঃসম্পর্কিত বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে। মূল যেমন ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপমা লওয়া যাইতে পারে—উৎপাদন-প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি ; সমাজ-সম্বন্ধ যেন তাহার নিম্নতল বা গ্রাউণ্ড প্লান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্যখচিত উপরতলা বা সৌধচূড়া। দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম ; তারপর নিম্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায় ; কিন্তু ভিত্তির কথা স্মরণ না রাখিলেও তো ভুল হইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আসল কথাটা হইল এই যে, সমাজ অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির গভীর যোগ আছে ; সে যোগ সক্রিয় যোগ ; আর উহার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাই সংস্কৃতি—ফল-ফুল-ভরা বৃক্ষ বা নানা-কক্ষসমন্বিত প্রাসাদ। অবশ্য এইসব উপমাতে একটা ভুল ধারণা হইতে পারে—গাছ বা গৃহের মত সংস্কৃতি বুঝি স্থাণু, নিশ্চল। কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া জয়ী হইতেছে—আর সংস্কৃতি তাহার সেই যুদ্ধের অস্ত্র, আবার সেই যুদ্ধেরই বিজয়-নিদর্শন। মানুষের সেই জীবন-যুদ্ধ যেমন নূতন নূতন রূপে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সংস্কৃতিও তেমনি রূপান্তরিত হইতেছে। মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই তাহার সংস্কৃতির এই রূপান্তরের ধারাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা

অন্নদাশঙ্কর রায়

যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট ; যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হলো উ নু ও তাঁর দলের। তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম। কে বাধা দেবে? কিন্তু এর পরিণাম হলো অশুভ। শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবী উঠল আংশিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এখনো লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জনগণ যদি কোনো দিন গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে তা হলে সেই সঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মার ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনো করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র, হলোই বা সেটা ফাসিস্ট শাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তানের বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এর উত্তরে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক? কারটা বেঠিক?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষারূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারী কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকের কাজকর্মের ভাষা। নিচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরো দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজীর প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারী ভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসীদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ পনেরটি সে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটিমাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনি। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনর বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইস্যুতেই হবে।

হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটিমাত্র যুক্তি। অধিকাংশ লোক হিন্দী চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তানে যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের আশংকা জাগে। এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষায় বেলাও কি দিতে পারিনে?

তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দীকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না। এমনি না মানার লক্ষণ চার দিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে দল যদি সবকটা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দীর প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা উপায়। যেমন হিন্দুর উপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। হিন্দী হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দী হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দী শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরেজীকে যারা বিদায় করবে তারা কি ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না?

হিন্দী যে ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে হিন্দী কি বুঝতে পারছে না যে, আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না? ভাগ করার নমুনা কি এই যে হিন্দীই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর-সব আঞ্চলিক ভাষা? সব ক'টা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হবে। প্রতিযোগিতার বা পরীক্ষার ভাষা যদি হয় ইংরেজী, তা হলে আমাদের ন্যায়বোধ যতখানি চরিতার্থ হয় হিন্দী হলে ততখানি হয় না। বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে হটাতে চাও? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত কর যে-ভাষা আমাদের ন্যায়বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি কোন ভাষা, অহিন্দীভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজীর মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দী চলে না সেখানেও ইংরেজী চলে।

ইংরেজীর অধিকারে না থাকলে সে সব অঞ্চল হিন্দীর অধিকারেও আসত না। ইংরেজী নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংলণ্ড। তেমনি আরো অনেকগুলি সত্যেরও উৎপত্তি ইংলণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, আইন আদালত, পার্লামেন্ট, আর্মি, নেভী, পুলিস, স্কুল, কলেজ, লেবরেটারি, রেল-ষ্টীমার, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা, খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, ট্রাম, বাস, মোটর—কোনটিই বা বিদেশাগত নয়? এমনকি কংগ্রেসও তো বিদেশী। হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী। এসবও তো বিদেশী ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশী পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। "রাজ ভবন" বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পালটে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী একটা বিকট হিন্দী নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটা টেলিফোন নামক বিদেশী একটা যন্ত্রই। বিদেশী বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজী। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল। এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরেজী শিখতে হবে। অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীতে কারো আপত্তি নেই। তাই যদি হলো তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালীরা জিতে যাবে হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেইভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদবদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজীই থাকবে, ইংরেজী ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দীকেও অন্যতম মাধ্যম কর তবে বাংলাকেও করতে হবে, তামিল, তেলুগু, কন্নাডিগ, মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দী ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজীই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম রূপে থাকুক। ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দু, মারাঠি, গুজরাতী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরোটি ভাষা। শুধু হিন্দী নয়। যেখানে হিন্দীকে বসালে অহিন্দীভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজীকে রাখাই সমীচীন। বিদেশী বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশী বলে শুধু হিন্দীকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবীকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দী আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে সেখানে হিন্দীর আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরেজী যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটি ভাষা। অন্য একটিমাত্র ভাষা। সেই বিদেশী লজিকের জোরে হিন্দীকেও একচ্ছত্র করতে হবে। কিন্তু বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদেরও নেই? বেলজিয়ানদেরও নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষ পর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায় ইংরেজী হলো বিদেশীর ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ তাই হোক। তা হলে ইংরেজীর নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব ক'টা ভাষাকেই হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়েরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—হিন্দী হলেও—কাজের কথা নয়। যতগুলি ভাষা ততগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপস রফা না করি তবে অমীমাংসিত সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তা হলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো। এরা যে যার সুবিধামতো এক একটা স্বদেশী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক স্বদেশী ভাষাকে। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দুর সার্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দী বা একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হতো। অত দূর যেতে হবে কেন? ধরুন, ১৯৪৭ সালে যদি জিন্নাসাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যেতেন, যদি অখণ্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তা হলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হতো, না একাধিক হতো, না হিন্দী উর্দুর যমজরূপ হতো? সকলেই জানেন যে একমাত্র হিন্দীর একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো, নয় ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হতো।

দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দী ও অন্যদিকে উর্দু একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দুভাষী মুসলমানদের শাসন শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দুর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনো কালেই মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ভাষী। লেগে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা হবে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দু ভাষীরা যদি তাতে নারাজ হয়, তবে রাষ্ট্র দু ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দুভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হবে। আপসের আর কোনো উপায় নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, কিন্তু আপসের একমাত্র উপায়।

উর্দুর বিরুদ্ধে নয়, উর্দুভাষীদের প্রচ্ছন্ন সনদের বিরুদ্ধেই পূর্বপাকিস্তানীদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দীভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষী এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী ভেবেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উল্টোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দীভাষীদের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের উপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দী নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপসের আর কী উপায় আছে—ইংরেজীকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে দেশ বহুখণ্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরী, কেরলী, বাঙালী, তামিল, অসমীয়া, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি। সেটা কিন্তু মিলেমিশে দেশ চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায় তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই

হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইস্যু যার একপ্রান্তে হিন্দীভাষীদের স্বার্থ, অপর প্রান্তে অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপসের প্রস্তাব। ওই সহচর ভাষা। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশী বলে ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছা করলে ইংরেজীর বদলে বাংলা, তামিল, মারাঠি ইত্যাদি চৌদ্দ পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষা বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরো সহজ নয়, আরো জটিল।

'বিদেশী' এই বিশেষণটাই যদি যত নষ্টের গোড়া হয়ে থাকে তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই বা বেখাপ হবে কেন? আগেকার দিনে বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেতো ইদানীং স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ বলে দিয়েছে যে, হিন্দীও ওদের পক্ষে বিদেশী। আমরাও তো দেখছি হিন্দী শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দীতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরেজীতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবীর কাছাকাছি যায়। 'মহাত্মা গান্ধীকী' হলো কেন? 'কা' হলো না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে? 'ফতে' স্ত্রীলিঙ্গ বলে।

যাই হোক হিন্দী আমাদের দেশের সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' হেঁকেছি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তা হলে বাধছে কোন্‌খানে? বাধছে এইখানে যে, ভারত যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দীভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হওয়ামাত্র ভারতকে বলা যাবে হিন্দীরাষ্ট্র। তখন হিন্দীভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী, তামিলভাষী, পাঞ্জাবীভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সদস্যেরা সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের

মধ্যে তখনি দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষ ছিলেন হিন্দীর সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজীর। বলা বাহুল্য ইংরেজীর সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। শুধু বিদেশীর নয় বিজেতার ভাষা। ইংরেজীর সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা যে কম স্বদেশী বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোটে দিয়ে দেখা গেল দু'পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দী ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সব ক'টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা। কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দী যদি সে রকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে, তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়। সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীর একটা নামডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দী এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজীও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বশে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হবে। লোকমুখে হিন্দীই থেকে যাবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারী ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরেজী না হয়ে উর্দু কিংবা তামিল হতো তাতেও হিন্দী গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরেজীকে যেমন তাঁরা 'বিদেশী' বলে অপাংক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না। হলেই বা সে স্বদেশী।

হিন্দী থাকছে, ইংরেজীও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দীতে চান তাঁরা হিন্দীতে ভাব বিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরেজীতে চান তাঁরা ইংরেজীতে। যদি বিনিময় করার মতো ভাব থাকে। যদি সে রকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাববিনিময় হয় না? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দুতেও।

গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতেই ভাববিনিময় করতেন কিন্তু জীবনের শেষদিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালিতে ফিরে বাংলায় ভাববিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের

জন্যে তিনি উর্দুতেও কথা বলতেন। রথীবাবুর সঙ্গে আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে কথা বললেন ১৯৪৫ সালে। ভাববিনিময় একটিমাত্র ভাষায় হবে—হিন্দীতে—এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজীর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতভাষী সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক গেছলেন যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, আলোচনা হলো—কোন্ ভাষায়, বলুন তো? ইংরেজীতে।

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুন বচসা বেধে গেল। খোঁপা আর এলোচুলে নয়, পাঞ্জাবীতে আর হিন্দীতে। তামাশা এই যে, দু'পক্ষেরই বাক্যবাণ বর্ষিত হলো উর্দু সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হলো উর্দু। মনে আছে ছেলেবেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুঃস্থির। হিন্দী নয়, ইংরেজী নয়, উর্দু। যেখানে উর্দু উভয়ের জানা সেখানে ভাববিনিময়ের ভাষা উর্দু হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে যিনি যাই পড়ুন না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বাতচিৎ হয় উর্দুতেই।

সরকারী ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দুতেই পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি। তেমনি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজীর কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশো কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজীকে অচলিত করতে পারবেন না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে। লোকে চায় হাই স্কুল। টোল নয়, মাদ্রাসা নয়, বুনিয়াদী নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজীর কাজ হবে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা। সে কাজ হিন্দীর দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে। সে প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতো তা হলে আমরা কেউ ইংরেজীকে সরকারী ভাষা বা তার সহচর করতুম না। সব যুক্তিকে খারিজ করত সেন্টিমেন্ট। বাংলাভাষাই হতো রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরতো না। লোকে ইংরেজীকে চাইত বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। সৃষ্টির ও সমালোচনার

আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজীর যুগ যায়নি। আরো আধ শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজী যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড় লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িকপত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিশেষত্বহীন, সেই জ্বলন্ত বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায় তা হলে অর্ধ শতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে? ইংরেজী যদি বাংলাকে বা হিন্দীকে এগিয়ে দিতে না পারে তবে ইংরেজীর অবস্থানকাল আধ শতাব্দীও নয়। আরো আগে তার উপর থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজী শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজী যে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে এটাও আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পশতাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পশতানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারীর ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজী শেখে। বাঙালীর ছেলেরা ফাঁকি দেয়।

ইংরাজীর পেছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দীর এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দীর অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দুকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দী লেখা যায় না, ছাপা যায় না? রোমক লিপিতে ছাপা বলে হিন্দী বই কাগজ আরো চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালীরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দী বই কাগজ একাধিক লিপিতে ছেপে পরীক্ষা করা উচিত পাঠকসংখ্যা কী পরিমাণ বাড়ে। অনেকে দেবনাগরীর ভয়ে হিন্দীর দিকে ঘেঁষতে চায় না। তাদের উপর জোরজুলুম করে যেটুকু ফল হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হবে বিভিন্নলিপিতে হিন্দী বই কাগজ ছেপে। তারপর হিন্দীর ব্যাকরণ আরো সরল হওয়া চাই। পশুপাখির কার কী লিঙ্গ তাই আমাদের জানা নেই। শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ থাকবে ও আমরা তা জানব, এ কী জ্বালা!

শেষ কথা, ইংরেজীর দীপশিখা নিবে গেলেই যে হিন্দীর দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা একপ্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজীর দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফু দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালীপূজা হবে, কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?

(১৯৬২)

সাধু এবং সজ্জন

আবুসয়ীদ অহিয়ুব

কারও চরিত্রের সুখ্যাতি করতে হ'লে আমরা বলি "সাধু সজ্জন ব্যক্তি"। বিশেষণ দুটি মানিকজোড়ের মতো পরস্পরের সঙ্গপ্রিয় ; একটা উচ্চারণ করলে আর একটা আপনিই জিভের ডগায় এসে পড়ে। এদের মিত্রভাব বঙ্গভাষীমাত্রেরই খুব পরিচিত কিন্তু আমার প্রবন্ধের অবতারণা তাদের বৈরিভাব নিয়েই।—একই ব্যক্তির পক্ষে সাধু এবং সজ্জন হওয়া কি আদৌ সম্ভবপর?

প্রশ্নটা হেঁয়ালি নয়, খেয়ালীও নয় ; একটু ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করলে সে-কথা পরিষ্কার হবে। 'সাধু'র অভিধান-সঙ্গত অর্থ হ'লো ধার্মিক ; ধার্মিক বলাতে অবশ্য কোনো সুরাহা হয় না। কারণ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় "ধর্ম" শব্দটা বড়ো আচারভ্রষ্ট—অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদাহরণ দিই : "ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে—কেন করব না?" ('কালান্তর') পরপর দুটি বাক্যে একই বাক্যের অর্থ বিপর্যয় লক্ষ্য করবার বিষয়। তেমনি লক্ষণীয় স্বভাবধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, ধর্মাধর্ম, বায়ুর ধর্ম—ইত্যাদি ব্যবহার। এই অনভিজাত শব্দটাকে জাতে তুলতে হ'লে তার কিছু অর্থশুদ্ধি প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধের পরিধিতে আমরা ধার্মিক কথাটা একটা সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করবো, ধার্মিক বলতে সেই ব্যক্তিকেই বুঝবো যাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক সর্বশক্তিমান পরম মঙ্গলময় সত্তার অস্তিত্বে অবিচলিত আস্থা।

Religion-এর মর্মার্থ বাংলায় প্রকাশ করতে গেলে যেমন অনেকগুলি কথা বলতে হয়, কোনো একটি চলতি কথায় কুলোয় না, তেমনি morality-র সঠিক প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় খুঁজে পাওয়া ভার। অনেকে নীতি বা সুনীতি কথাটা সমনামরূপে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু 'নীতি' শব্দে চিরাচরিত প্রথা ('রীতিনীতি'), কিংবা নিয়ম অর্থাৎ কোনো অনুজ্ঞাপ্রসূত বিধানের ভাবটাই ('সমাজহিতকর বিধান'—'চলন্তিকা') অধিকতর প্রকট, অথচ মর‍্যালিটি বলতে আমরা যে গুণটা বুঝি সেটা অন্তঃকরণমূলক, উপর থেকে চাপানো কিছু নয়। আমার বিবেচনায় বরং 'সজ্জন'

শব্দটাকে moralist বা moral person-এর সমার্থবাচক ব'লে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ্য পদে 'সজ্জনতা' খানিকটা বিসদৃশ শোনায় ব'লে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ্য পদে 'সজ্জনতা' খানিকটা বিসদৃশ শোনায় ব'লে অনেকস্থলে তার পরিবর্তে 'চারিত্র' ব্যবহার করেছি।

অর্থাৎ আমাদের প্রশ্ন হ'লো ধর্ম ও চারিত্রের সংঘাতের প্রশ্ন। একটু তাজ্জব প্রশ্ন, স্বীকার করছি। কারণ বাংলায় সাধু এবং সজ্জন যেমন পরস্পরের মিতা, দর্শনশাস্ত্রে তেমনি ধর্ম ও চারিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। চরিত্র নাকি ধর্মের কাছ থেকেই বল ও সম্বল পায় ; এবং অন্তত কাণ্ট্ ভগবৎ-বিশ্বাসকে চারিত্রবোধের সাক্ষ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বিবর্তনবাদী চারিত্র-বিজ্ঞান কেমন ক'রে কাণ্টের চেষ্টার অসারতা প্রতিপন্ন করলো তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। ভগবৎ-বিশ্বাস সজ্জনতা-বিকাশের সহায় কি অন্তরায় সেইটা আপাতত আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ।

"আমরা বাস্তব সত্তাকে আমাদের আদর্শের ছাঁচে ঢালিতে পারি না, তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি মাত্র। শাঙ্কর মতে দর্শনের কাজ যাহা হওয়া উচিত তাহার সংঘটন নয়, যাহা আছে তাহারই সংবোধি। ব্রহ্মানুভবের মধ্যেই আমরা পাইব চরম শান্তি ও তৃপ্তি।" (রাধাকৃষ্ণণ, 'ভারতীয় দর্শন', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৪)

"দার্শনিকরা এ-যাবৎ দুনিয়ার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন ঃ আসল কথা হইল তাহাকে পরিবর্তন করা।" (কার্ল মার্কস্, 'ফয়েরবাখ বিষয়ে প্রস্তাব')

উপরের দুটি উদ্ধৃতিকে ধর্মপরায়ণ এবং সজ্জন-সুলভ—এই দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভূ হিসেবে ধরা যেতে পারে। দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ মৌলিক। ধার্মিকের কাছে তার চরম আদর্শ ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন নয়, অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে বা কালাতীতরূপে বিশ্বসৃষ্টিতে অভিব্যক্ত। ভগবান স্বয়ং যখন ত্রুটিলেশহীন এবং তাঁর শক্তি অপরিমেয়, তখন তাঁর সৃষ্টিতেও কোনো দোষ স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং জাগতিক পরোৎকর্ষ সাধ্য নয়, চিরসিদ্ধ। চারিদিকে অবশ্য এমন অনেক-কিছু আমরা দেখতে পাই যা পাপবিদ্ধ, যা কদর্য ও ঘৃণ্য ; সেটা কিন্তু আমাদের মানুষী দৃষ্টির বিভ্রম, অবিদ্যা-জড়িত মনের একটি ব্যাপার-মাত্র। অপরপক্ষে, সজ্জন ব্যক্তির কাছে শ্রেয়স হচ্ছে তার মনোগত আদর্শ, বাইরের বাস্তব অমঙ্গল ও অন্যায়ের সঙ্গে যুঝে যেটাকে ক্রমশ সত্য ক'রে তুলতে হবে। হিতসাধনব্রতী মানুষের জীবন একটি বিরামহীন অন্তহীন সংগ্রাম ; প্রতিতুলনায়, ভগবৎ ভক্তের সঙ্গে তার পরিবেশের প্রকৃত সম্বন্ধ সন্ধির সম্বন্ধ, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্বন্ধ।

অমঙ্গলের সত্যাসত্যকে কেন্দ্র ক'রেই সাধুতা ও সজ্জনতার মধ্যে এই বিরোধ। মানবপ্রেম যার জীবনের মূল প্রেরণা, তার পক্ষে অমঙ্গলের অস্তিত্বকে শাস্ত্রবাক্যচ্ছটায়

আচ্ছন্ন ক'রে রাখা অথবা ধর্মতত্ত্বের ধূমায়িত তর্কবিতর্কের মধ্যে উবিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রেরণা ছিলো কার্ল মার্ক্সের জীবনে সবচেয়ে প্রবল প্রেরণা, কাজেই সামাজিক অমঙ্গল ও কদর্যতা ছিলো তাঁর চোখে সবচেয়ে প্রখর বাস্তব। তাঁর সমস্ত ধ্যান, বাক্য ও কর্মকে এই বাস্তবের সঙ্গে আপোষহীন যুদ্ধ মনে করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে ধার্মিকের কাছে সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। শুধু সত্ত্বগুণ নয়, যা কিছু রজঃ বা তমোগুণান্বিত তা-ও সেই চরম সৎ-এরই প্রকাশ। শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখলে কুৎসিত কিংবা হেয় কিছু নেই। ব্র্যাডলির ভাষায় "দুরাত্মার কলুষিত কামনাও এক পারমার্থিক পরম কল্যাণময় ইচ্ছার অঙ্গীভূত।" ('সত্তা ও প্রতিভাস', পৃ ৩৯০) সবই যদি শুভ হয়, অনিন্দ্য-সুন্দর হয়, তাহ'লে জাগতিক এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া খোদার উপর খোদ্‌কারী। ব্রহ্মের যে অখণ্ড অভিপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের চক্রপথে আপনি সিদ্ধ হচ্ছে তাতে অকিঞ্চিৎকর মানুষী হিতৈষণার স্থান কোথায়? কোনো-কোনো ধর্মতাত্ত্বিক বলেন যে অক্ষম মানুষের ক্ষুদ্র মঙ্গল-সাধনার মধ্য দিয়েই ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে অনন্ত নিঃশ্রেয়সের পথে নিয়ে চলেছেন। সেইজন্য আমাদের সৎকর্ম-প্রচেষ্টা বৃথা নয়, ব্যর্থও নয়। এর বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি তোলা যেতে পারে। প্রথমত, এ-কথা বললে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় যে বিশ্বজগৎ মঙ্গলের দিকে এগুচ্ছে মাত্র, এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণ মঙ্গলময় নয়। সেটা অসীম স্রষ্টার প্রতি দোষারোপ, কোনো ভগবৎভক্তের মন তাতে সায় দেবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা যদি আমাদের হিতৈষণাকে ভগবানের হিতসাধনের যন্ত্ররূপে জ্ঞান করি তাহ'লে আমাদের সামাজিক কর্তব্যের চেতনা নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। প্রকৃত দায়িত্ব যন্ত্রচালকের উপর ন্যস্ত থাকলে যন্ত্রের দায়িত্ববোধে মরচে ধরবেই, তাতে সেই ক্ষুরধার এষণা পাওয়া যাবে না যা সামাজিক শোষণ ও স্বার্থসিদ্ধির জগদ্দল পাথরকে কেটে খান-খান করবার জন্য অত্যাবশ্যক। ইতিহাসে তাই দেখা যায় স্থিতস্বার্থের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত বেঁধেছে যতোখানি, সন্ধি হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী; ধর্মের ধ্বজাধারীরা অল্পেতেই কবুল ক'রে নিয়েছেন: সীজারের ধন সীজারের হাতে প্রত্যার্পণ করো, সে-সীজার অতি জবরদস্ত অত্যাচারী হ'লেও। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে"—এই হ'লো ধার্মিক মনের অভিলাষ। কিন্তু শুধু ঈশ্বরের অশরীরী চরণে নতিস্বীকার নয়, রাজা-মহারাজা মালিক-মহাজন জমিদার-জোৎদারের অত্যন্ত শরীরী চরণের সামনেও মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াবার শিক্ষাই দিয়েছে ধর্ম। অত্যাচার-জর্জরিত মানুষের নতমস্তকে হাত বুলিয়ে উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বড়ো সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন: "It is the poor or those who have no care at all for wealth, whose concessiveness or submissiveness knows no limit, and those who take up the burden of misery most readily, who are to enjoy the blessings of the kingdom." (Bishop Gore.) মার্ক্সও সেই

কথা বলেছিলেন একটু রুক্ষ ভাষায় : "The mortgage the peasant has on heavenly goods gives guarantee to the mortgage the bourgeois has on the peasants' earthly goods."

সংগ্রাম-বিমুখতা থেকে এসেছে আত্মরতি, সামাজিক কর্মক্ষেত্রের সর্বাগ্রগণ্য দাবীকে লঘু ক'রে দেখবার পলায়নী মনোভাব। ধর্মের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মন নিয়ে যাঁরা ভক্তজীবনের পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম জেম্‌স্‌ অদ্বিতীয়। জেম্‌স্‌ও স্বীকার না-ক'রে পারেননি যে যে-অক্ষদণ্ডের চারদিকে ধার্মিকের জীবন ঘূর্ণ্যমান তা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিত্রাণের চিন্তা। "Religion in short is a monumental chapter in the history of human egotism." (*Psychology of religious Experience*, p. 480.) আগেই বলেছি যে এই আত্মরতির মূলে রয়েছে অমঙ্গলের বাস্তবতা সম্বন্ধে ঘোলাটে দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে পূর্ণসত্য ব'লে স্বীকার করায় অনভিরুচি! প্রকৃত ভক্তের এ ছাড়া উপায় নেই। অমঙ্গলকে বাস্তবজ্ঞান করলে ভগবানকে পরমমঙ্গলময় ভাবা যায় না, সৃষ্টির দোষ স্রষ্টার উপরও বর্তায়।* কাজেই অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, অমঙ্গলের মিথ্যাত্বের উপলব্ধিই সাধুর বরেণ্য পন্থা। কর্মের কথা ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সে-কর্ম পরার্থে নয়, স্বার্থে ; সেটা আত্মশুদ্ধির উপকরণ, স্বর্গারোহণের সোপান-মাত্র। এবংবিধ কর্মমার্গে দান-দক্ষিণা চলে, শৌখীন আত্মনিপীড়নও সম্ভব, কিন্তু তাতে অন্যায়ের বিরাট শক্তিশালী দুর্গগুলো ভাঙ্গে না, সমাজ-বিপ্লব ঘটে না। ধর্মের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে পরাবিদ্যারত্নদের মুখে এমন কথাও শোনা গেলো যে, "the very presence of ill in the temporal order is the condition of the perfection of the eternal order." (Royce, *World and the Individual*, p. 385.) তবে আর কী, ইহলোকের অন্যায়ের বোঝা যুগযুগান্তর মানুষের বুকে অক্ষয় হ'য়ে থাক, নইলে পরমার্থ-লোকের অখণ্ড পরিপূর্ণতা চিড় খেয়ে যাবে। স্বভাবতই মার্ক্সের তীক্ষ্ণ চারিত্রবোধ তাঁকে এই কর্মবিমুখ ধর্মাত্মাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করলো : "Criticism of religion is the necessary pre-condition of all criticism. It is at heart a criticism of the vale of misery for which religion is the promised vision." (Introduction, *Critique of Hegel's Philosophy of Law.*)

---

* এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্ভূত ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য। বাস্তব-জগতের মাঝখানে তাঁরা কেবল অমঙ্গলকেই অবাস্তব ঠাওরান। ভারতীয় ধর্মচিন্তায় problem of evil-এর নিষ্পত্তি আরো গোড়া ঘেঁষে করা হয়েছে। এখানে শুধু অমঙ্গল নয়, সমস্ত দৃশ্য জগৎটাই মায়ার সৃষ্টি, অধ্যাস। সামাজিক অভ্যুত্থানের দিক থেকে কিন্তু ফল প্রায় একই। উভয় ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রতি নিস্পৃহা, সামাজিক দায়িত্বলাঘব, আত্মনিমজ্জন।

মার্ক্সের চব্বিশ শতাব্দী পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থও উৎপীড়িত মানুষের জীবনে দেববন্দনার শূন্যতা অনুভব করেছিলেন। পৈতৃক রাজ্যপাটের সঙ্গে পৈতৃক দেবতা ও ধর্ম প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনিও হয়েছিলেন চলতি সমাজ-ব্যবস্থার বিদ্রোহী। সর্বমানুষের দুঃখ ছিলো উভয়ের জীবনের মূল সমস্যা। তাঁদের সমাধানের পথ কিন্তু এক নয়, কারণ সমস্যা এক হ'লেও তাঁরা সেটাকে দেখেছিলেন প্রায় বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে মার্ক্সের দৃষ্টি পড়লো রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং একটি ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্ন শ্রেণীর হাতে উৎপাদনযন্ত্রের একচেটিয়া মালিকানা, যার অনিবার্য ফল বিপুলসংখ্যক বিত্তহীনের উদয়াস্ত শ্রমজাত পণ্যের উপর অত্যল্প-সংখ্যক বিত্তবানের তস্করবৃত্তি। এবং বুদ্ধের চোখে ব্যক্তি-মানুষের বাসনা-বন্ধনই প্রধান অন্তরায় ঠেকলো, তার দুঃখের কারণ তিনি দেখলেন দুর্দান্ত অফুরন্ত তৃষ্ণার দাসত্বে। ফলে তাঁদের পন্থাও বিভিন্ন। মার্ক্সের সমাধান হ'লো শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্র ভেঙে সমসমাজের প্রতিষ্ঠা যাতে "প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ বিকাশ সমস্ত মানবজাতির অবাধ বিকাশের দ্বার মুক্ত ক'রে দেবে।" অপরপক্ষে, বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গ হ'লো শীল ও সমাধির পথে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার ফলে বৈরাগ্য এবং পরিশেষে নির্বাণ। নির্বাণ মানে অবশ্য শূন্যে বিলীন হ'য়ে যাওয়া নয়, তা "ইহজীবনের মধ্যেই লভ্য এক বিশেষ মানসিক অবস্থা (অর্হত্তের অবস্থা) যাহাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও সমাহিতি চিত্তে বিরাজ করে।" (হিরীয়ন্ন।)

এই দুই পন্থা পরস্পরের সংশোধক ও পরিপূরক নয় কি? বুদ্ধের দৃষ্টি ব্যক্তিগত জীবনে বাসনা-শৃঙ্খলের সর্বনাশা শক্তির উপর এতো বেশি নিবিষ্ট ছিলো যে তিনি সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করলেন। এবং মার্ক্সের চোখে সামাজিক, বিশেষত অর্থনৈতিক, অব্যবস্থার বীভৎস ফলাফল এমন সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠেছিলো যে তিনি মানব-চরিত্রের ব্যক্তিগত অক্ষমতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। অথচ এ-কথা অনস্বীকার্য যে জীবনধারণের পক্ষে যে-সব সামগ্রী একান্তই আবশ্যক তার অভাব যখন একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষ পশুর পর্যায়ে গিয়ে পড়ে, তার পক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনার মার্গে আত্মজয় ও চিত্তসমাহিতি লাভ করা অসম্ভব হয়, সে-রকম কোনো অনুপ্রেরণাই তার পাশবীকৃত জীবনে জাগতে পারে না। (দু-চারজন মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে এর ব্যতিক্রম হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু তাঁরা যে মহাপুরুষ। সাধারণ মানুষের সাধ্যাসাধ্যের পরিমাপ তাঁদের অসাধারণ শক্তির মাপকাঠি দিয়ে করা যায় না।) এবং এ-ও আজ কারও অবিদিত নেই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় অধিকাংশ লোক আত্মা-বিধ্বংসী দারিদ্রের মধ্যে দিনপাত করতে বাধ্য। অবশ্য সমাজতন্ত্রের কথা বুদ্ধদেবের কালে কারও পক্ষে মনে আনা সম্ভব ছিলো না, কারণ সমাজতন্ত্র-স্থাপনের জন্য উৎপাদিকা-শক্তির যে-বিপুল সম্প্রসারণ অপরিহার্য, বৈজ্ঞানিক

উদ্ভাবনার দিকচক্রবাল থেকে তা তখনও বহুদূর ছিলো। টেক্‌নলজি সংস্কৃতি ও ন্যায়াদর্শকে সম্পূর্ণ নিরূপিত না-করলেও যে অনেকখানি সীমায়িত করে তা সর্ববাদীস্বীকৃত।

মার্ক্স দেখলেন যে অত্যধিক সংখ্যক মানুষের দুঃখের কারণ নিহিত রয়েছে সমাজ-জীবনের হিংস্র প্রতিযোগিতা ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তিবাদের মধ্যে। উপরন্তু তিনি ধ'রে নিলেন যে উৎপাদিকা-শক্তির জাতীয়করণ এবং শোষকশ্রেণীর বিলোপের ফলে যে সামাজিক নববিধান রচিত হবে তাতে সর্বমানুষের জৈবিক অভাব ঘুচবে, অতএব সমস্ত দুঃখমোচন হবে। ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যায় এবং সামাজিক সমস্যাকে সামাজিক সমস্যার পরিভাষায় অনূদিত করা মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রকরণের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এর পিছনে রয়েছে ইতিহাসের নতুন পাঠ, সংস্কৃতিধারা ও মূল্যবিবর্তনের জড়বাদী ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিক অগ্রগতির কারণসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু অর্থনীতিই কি মানবিক অভ্যুদয়ের একমাত্র নির্ধারক? যদি তা না-হয় তবে আর্থিক মুক্তির সঙ্গে মানুষের সার্বিক মুক্তির সমীকরণ আমাদের বিপথগামী করবে। আর্থিক সমস্যার নিরসন না-হ'লে অন্য-কোনো সমস্যার নিরসনের দিকে আমরা এগুতে পারি না—এই পর্যন্ত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থান্তরের ফলে মানব-জীবনের অন্যান্য গভীরতর সমস্যার সমাধান ডায়লেক্‌টিক্ জড়প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আপনিই ঘটবে—এ-বিশ্বাস বিজ্ঞান-সম্মত নয়, ভগবৎ-নির্ভরতার অবদমিত ভগ্নাবশেষমাত্র। এঙ্গেল্‌সের ভাষায় "শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হবে, প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হবে।" আমাদের দুঃখ ও সংগ্রাম পাশবিক স্তর থেকে উঠে আসবে মানবিক স্তরে।

পাশবিক স্তরের সংগ্রাম ছিলো জড়প্রকৃতির সঙ্গে—জীবনধারণের জন্য। মাটি কেটে মানুষ ফসল ফলিয়েছে, পাহাড় কেটে রাস্তা বানিয়েছে, বাসভূমির সীমানা সম্প্রসারিত করেছে গহন অরণ্যের মধ্যে, ধরণীবক্ষের গভীরতা থেকে ছিনিয়ে এনেছে শিল্পের উপাদান, শক্তির উপকরণ। জীবিকার অন্বেষণে সে হয়েছে যোদ্ধা। মানবিক স্তরের সংগ্রাম হবে নিজের মগ্নচেতনার প্রাক্-সভ্য গৃধ্নু বৃত্তিগুলির সঙ্গে—জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য। সেকালের ধর্মের একমাত্র শিক্ষা ছিলো আত্মজয়ের শিক্ষা; একালের ধর্মের ঝোঁক কেবল প্রকৃতি-জয়ের দিকেই। এই দুই জয়যাত্রার পথ বস্তুতপক্ষে পৃথক নয়, তারা একই মহাবর্ত্মের দুই শাখা। বলা যায় বৈ-কি যে রিলিজন নির্যাতিত মানুষের অন্তর থেকে উঠে-আসা প্রতিবাদ, কাজেকাজেই যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামাজিক নির্যাতন শেষ হবে এবং রিলিজনের সাহায্যে যে-শ্রেণী নিজের কায়েমী স্বার্থ বলবৎ রেখেছিলো তার অন্তর্ধান ঘটবে, তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে রিলিজনের প্রয়োজনও ঘুচে যাবে। জোসেফ নীড্‌হাম কিন্তু সন্দিহান; তাঁর মতে

মানুষ শুধু সামাজিক নির্যাতনে ভোগে না, বিশ্বজাগতিক নির্যাতনেও ভোগে ; সমাজ-ব্যবস্থা আমরা পাল্টাতে পারি কিন্তু জগৎ-ব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের সাধ্যের অতীত। আমরা কেমন ক'রে ভুলবো "What we could call cosmic oppression, or creatureliness, the unescapable inclusion of man in space-time, subject to pain, sorrow, sadness and death." (Time *Refreshing River,* p. 65) এই 'জাগতিক নির্যাতনে'র গুরুভার অবিচলিত চিত্তে বহন করবার জন্য, ক্ষমতার ব্যসন ও অধিনায়কত্বের স্পর্ধিত বিলাস নিবৃত্ত করবার জন্য, পরের ব্যক্তিস্বরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখবার মতো সর্বমানবিক সহিষ্ণুতা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য মনঃশক্তির যে গভীর উৎস আবশ্যক তার সন্ধান আমরা পাবো কোথায়? পাবো আমাদেরই চিত্তের সেইসব দুরধিগম্য স্তবকে যার পথ আমরা আজও জানি না, এ-যুগের ভক্তদের নবতীর্থভূমিতেও যে-পথ কারও জানা আছে ব'লে মনে হয় না। রাধাকৃষ্ণণ প্রচলিত রিলিজনগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : "For the first class religion is an attitude of faith and conduct directed to a higher power without. For the second, it is an experience, to which the individual attaches supreme value. For it, religion is more a transforming experience than a notion of God." (*Eastern Religions and Western Thought,* p. 21.) ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্যক্ চারিত্র-বিকাশের অনুকূল নয়—ইতিপূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। মার্ক্সের দুর্নিবার চারিত্র তাঁকে সমস্ত ঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রতি খড়্গহস্ত করেছিলো, এবং সেইসব দার্শনিকের প্রতি ক্ষমাহীন যাঁরা পাকেপ্রকারে ধর্মেরই তল্পিবাহক। নিরীশ্বর অধ্যাত্মসাধনার যে ধারণা উপরের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধেও মার্ক্সের আপত্তি কি সমান প্রবল হ'তো? "Free development of each" কথাটার মধ্যে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের এই পন্থাও কি অন্তর্ভুক্ত নয়? মার্ক্সের নিজের লেখায় এর স্পষ্ট উত্তর মেলে না।

ভাষা ও রাষ্ট্র

বুদ্ধদেব বসু

আমি রাজনৈতিক নই, কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নই, আরাম-কেদারায় বসে'ও রাজনীতির চর্চা আমি করি না। এবং আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি বলে'ই তার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি'—এই হৃদয়াবেগে আমার মন কখনো সাড়া দেয় না।

আমি লেখক, বাঙালি লেখক না-হ'লেও বাংলা ভাষার লেখক। কাজের কথা, বুদ্ধির কথা, এমনকি হয়তো মনের কথাও কখনো-কখনো অন্য ভাষায় বলতে পারি, কিন্তু প্রাণের কথা বাংলায় ছাড়া বলতে পারি না। এবং এই প্রাণ, বা অচেতন মন, তার কম্পনগুলিকে ভাষায় মূর্ত ক'রে তোলাই আমার নিরন্তর প্রয়াস। তার ফলে আমি একটি অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত হ'য়ে আছি সেই কয়েক কোটি মানুষের সঙ্গে, যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাঙালির এবং বাংলা দেশের সঙ্গে এই ভাষাই আমার প্রধান বন্ধন। এমনকি হয়তো একমাত্র।

এর মানে এ-কথা হ'লো না যে আমার মনোলোক থেকে অবাঙালি বাদ পড়েছেন। আমি ইংরেজ নই, য়োরোপীয় নই ; অথচ ইংরেজি ভাষার সাহায্যে পশ্চিমী লেখকদের সঙ্গে নিত্য-নূতন সৌহার্দ্যবন্ধন আবিষ্কার করছি। ঠিক তেমনি, যিনি বাংলা ভাষা শিখবেন, তাঁর জন্মস্থান যেখানেই হোক না, তাঁরই সঙ্গে আমার মানসিক বাণিজ্য চলতে পারবে ; এবং যিনি তাঁর নিজের ভাষায় আমার রচনা অনুবাদ ক'রে নেবেন, তাঁর সঙ্গেও। কিন্তু প্রথম উচ্চারণ মাতৃভাষাতেই হ'তে হবে ; সেখানে লেখক (চিত্রশিল্পী একান্তভাবে তা নন) বিতাড়িত, নির্বাসিত বা দৃশ্যত স্বদেশবিরোধী হ'য়েও স্বদেশের সঙ্গে ক্ষমাহীনভাবে যুক্ত থাকেন। লেখকের মতো এমন অনিচ্ছুক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক আর নেই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়েও এই কথা। আধুনিক জগতে নেশন নামে যে-ধারণা প্রচলিত আছে তার ভিত্তি কোথায় খুঁজতে গেলে ভাষা ছাড়া আর উত্তর পাওয়া যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুজাতি বাসা বেঁধেছে ; সেই বিচিত্র প্রজাসমূহকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ইংরেজি ভাষা। ইংরেজ, স্কচ, ওয়েলশ ও আইরিশে স্থানীয়

ঐতিহ্যগত প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে (বাঁকুড়া ও শ্রীহট্টের বাঙালীতেও প্রভেদ কম নয়), কিন্তু বাইরের জগতের কাছে তারা সকলেই 'ইংরেজ' নামক একটিমাত্র ধারণার মধ্যে গৃহীত হ'তে পারে ঃ ওঅল্টার স্কট, ইএটস, ডিলান টমাস, এঁরা তিনজনেই 'ইংরেজী' সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছেন, এবং আয়র্লণ্ডের পূর্ণস্বাধীনতা লাভের পরেও আইরিশ ও ইংরেজ পরস্পরের কাছে কোনো অর্থেই 'বিদেশী' হ'য়ে যায় নি। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রিক অবস্থা সাম্প্রতিক ইতিহাসে বহুবার বদলেছে, কিন্তু যেহেতু 'অস্ট্রিয়ান' নামক কোনো ভাষা নেই, পৃথিবীর কাছে অস্ট্রিয়া জর্মানদেশেরই অন্তর্গত ; অস্ট্রিয়ার কবি রিলকে বা সুইটজারল্যাণ্ডের কবি স্পিটেলার—এঁরা জর্মন মানসেরই সন্তান ও প্রতিভূ। যে-দেশের স্বকীয় ভাষা নেই বা সে-ভাষা পরিণত নয়, কোনো প্রতিবেশী বড়ো ভাষাকে আত্মসাৎ ক'রেই সে মনের দিক থেকে বাঁচতে পারে। এর আর-একটি উদাহরণ ফরাশি-ভাষী বেলজিয়ম।

বলতে চাচ্ছি যে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রধান বন্ধনই হ'লো ভাষা। ধর্ম এক না হ'তে পারে, ঘরকন্নার অভ্যেসও ভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু যে-প্রজা-সমূহ এক ভাষায় কথা বলে তারাই একটা 'দেশ' বা 'রাষ্ট্রে'র স্বাভাবিক অভিজ্ঞান ; সেই সহজাত ভাষার উপরেই 'রাষ্ট্র' নামক পরিকল্পনার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। এবং 'রাষ্ট্র' ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু ভাষা ছাড়া পারে না।

আমাদের ইংরেজ শাসকরা ভারতীয় ভাষাগুলিকে অবজ্ঞাভরে 'dialect' বা 'vernacular' বলতেন ; কিন্তু (আর বোধহয় তারই প্রতিঘাতে) ইংরেজ আমলের আরম্ভেই বাঙালি তার ভাষা বিষয়ে সচেতন হ'লো, সচেতনভাবে তার ভাষাকে ভালোবাসলো। এ-ঘটনা ভারতের অন্য কোথাও তখন ঘটেনি, এখনো সর্বত্র ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। বাংলার দুর্দান্ত 'সাহেবিয়ানা'র সময়েই বাংলা গদ্যের জন্ম এবং পদ্যের পুনর্জন্ম হ'লো ; য়োরোপের অভিঘাতের ফলে বাঙালির মন ইংরেজি ভাষার মধ্যে আত্মবিলোপ চাইলো না, চাইলো মাতৃভাষার পরিণতিসাধন। এবং এরই ফলে বাঙালির মধ্যে যে-সংহতিবোধ জেগে উঠলো, তা-ই ব্যাপ্ত হ'য়ে ক্রমশ পরিণত হ'লো ভারতীয় জাতীয়তাবাদে, সর্বভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সেখানেই উৎস। বাংলা ভাষা যেখানে-যেখানে বলা হয়, সেই সমস্ত অংশ নিয়েই বাংলাদেশ, এই বিশ্বাসের প্রেরণাতেই সে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করেছিলো, আর দ্বিতীয় বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনাও ভুলতে পারলো না। নিশ্চয়ই, পদ্মার দুই তীরেই, এমন মানুষ অনেক আছেন যাঁদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান বাংলার মনোলোকেরই অংশ। রাষ্ট্রের বদল রাতারাতি হ'তে পারে, কিন্তু রক্তের বদল কত দুঃসাধ্য তার প্রমাণস্বরূপ বাংলা ভাষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাতের উল্লেখ করা যায়।

কোনো দুই দেশ দূরবর্তী হ'য়েও এক ভাষায় কথা বললে তারা আত্মীয় হয়, যেমন উত্তর আমেরিকা ও ইংলণ্ড, স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকা। এবং যদি ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকে, তাহ'লে ভিন্ন রাষ্ট্র হ'লেও তারা সমানুকম্পায়ী না-হ'য়ে পারে না। কিন্তু যেখানে ভৌগোলিক সান্নিধ্য আছে, এবং ভাষা ও রাষ্ট্র দুটোই অভিন্ন সেখানে প্রজাসমূহ আত্মীয় নয়, একাত্ম হ'য়ে ওঠে। পূর্ব ভারতের যেখানে-যেখানে বাংলা বলা হয়, তা সবই মাটির এবং নদীর অণুতে-অণুতে পরস্পরসম্পৃক্ত—সেটাই যথার্থ বাংলাদেশ—রাষ্ট্রনীতির খামখেয়ালে তার যখনই যা নামকরণ হোক না। সেই দেশে বাংলা ভাষা যদি প্রাধান্য না পায় তাহ'লে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা একেবারেই অর্থহীন হ'য়ে পড়ে।

ইংরেজ আমলে যা ছিলো 'vernacular', স্বাধীন ভারতে তার নূতন নাম হয়েছে 'regional' বা 'আঞ্চলিক' ভাষা। এই বিশেষণের অর্থ কী, তা ভেবে পাওয়া শক্ত, কেননা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই 'আঞ্চলিক', কোনো-কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সচল—ইংরেজি, এবং অংশত ফরাশি ছাড়া, আর-কোনো ভাষাকেই জাগতিক বলা যায় না। ইতালিয়ান, নরোয়েজিয়ান বা জাপানি ভাষার প্রচার খুব বেশি নয়, কিন্তু কেউ তাদের 'আঞ্চলিক' ব'লে উল্লেখ করে না, এক সভ্য দেশের ভাষা রূপেই তারা স্বীকৃত ও সম্মানিত। বাংলা, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার স্বাভাবিক মর্যাদাও সেই রকম, কিন্তু এই নূতন নামকরণে তাদের আভিজাত্যই শুধু উপেক্ষিত হয়নি, সত্যেরও অপলাপ ঘটেছে। ভারতের কোন-একটি ভাষাও যদি 'আঞ্চলিক' হয় তাহ'লে প্রত্যেক ভাষাই তা-ই ; সারা ভারত স্বাভাবিকভাবে কোনো-একটি ভাষাও বলে না, এবং এই ভাষাগুলি যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা কোনো-এক ক্ষেত্রেও অন্যদের তুলনায় অত্যধিক নয়। অথচ 'আঞ্চলিক' বললেই অধিকার সঙ্কুচিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, শুধু ভারতের রঙ্গমঞ্চে নয়, এমনকি সেই ভাষার আপন সীমানারই মধ্যে। পাছে এই আশঙ্কা রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়, সে-কথা ভেবেই বাঙালির মন আজ বিক্ষুব্ধ। বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব বিষয়ে প্রথম কথা হ'লো এই ঃ তাহ'লে বাংলা ভাষার অবস্থা কী হবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেখিয়ে বলা যায় যে ভারতবাসীকে নেশনে পরিণত করার জন্য সারা দেশে একটা সাধারণ ভাষা চালাতেই হবে—প্রয়োজন হয় তো কিছুটা জুলুম ক'রে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মার্কিনদেশের ভৌগোলিক আয়তনে আর জাতিগত মিশ্রণে মিল থাকলেও অন্য কিছুতে মিল নেই। মার্কিন দেশ নতুন ; মুষ্টিমেয় 'ইণ্ডিয়ান' বাদ দিয়ে তার সমগ্র প্রজাবৃন্দ মাত্র কয়েক পুরুষ আগে বিভিন্ন বিদেশ থেকে এসেছিলো, এবং যন্ত্রবহুল মার্কিন সভ্যতার বিশেষ ক্ষমতাই এই যে নানা দেশ থেকে প্রজা গ্রহণ ক'রে সকলকেই এক অভিন্ন মার্কিন ছাঁচে ঢালাই ক'রে নিতে

তার দেরি হয় না। ভারত সুপ্রাচীন, তার উপর বিভিন্ন জাতিগত ও স্থানগত বৈচিত্র্যকে সে কখনো অস্বীকার করেনি, বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য ফুটিয়ে তুলেছে। এখানেই ভারতের প্রতিভার ও সাধনার বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার আয়তন ভারতের প্রায় দ্বিগুণ ; সেই বিস্তীর্ণ মহাদেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে মোটের উপর একই রকম জীবনের ধারা দেখতে পাওয়া যায় ঃ একই রকম খাওয়া, পরা, দোকান, রাস্তা, ব্যবহার, আমোদ-প্রমোদ। কিন্তু ভারতে প্রত্যেক তিন শো বা চার শো মাইল পর-পরই জীবনের গড়ন বদলে যাচ্ছে, আর প্রত্যেকটি ছোটো-ছোটো বৈশিষ্ট্যের পিছনে বহু শতকের ইতিহাস সঞ্চিত হ'য়ে আছে। যে-বিশেষ বলে আমেরিকায় এই সমীকরণ সম্ভব হ'লো, সারা দেশে একই ভাষার প্রচলনও তারই অন্যতম ফল। পক্ষান্তরে, আমাদের বিভিন্ন ভাষা, এবং বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার, এগুলোই ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি, তার চরিত্রলক্ষণ। ভারতকে তার ভবিষ্যৎ বিবর্তনের পথে সফলভাবে নিয়ে যেতে হ'লে এই বৈচিত্র্যের ছন্দকে স্বীকার ক'রে নেয়া চাই।

অর্থাৎ সারা ভারত এক রাষ্ট্র হ'লেও কার্যত আমরা এক-একটি সুনির্দিষ্ট ভাষা ও ঐতিহ্যের মধ্যে বসবাস করি, অনেকটা য়োরোপের ভিন্ন-ভিন্ন দেশের মতো। ইংরেজ, জর্মন, ফরাশি যেমন আলাদা, অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ ইতিহাসের পটভূমিও ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, পঞ্জাবি, গুজরাতি, বাঙালি ইত্যাদিকেও সেইরকম ধারণা করলে ভুল হয় না। য়োরোপীয় বা ভারতীয় সংস্কৃতি নামক একটা সমগ্রকে আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশের ব্যক্তিস্বরূপও সুস্পষ্ট। ক্যাথলিক ধর্ম ও লাতিন ভাষা বা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার বন্ধনে য়োরোপ অথবা ভারতবর্ষ অতীতে যে-ভাবে এক হ'তে পেরেছিলো, আজকের দিনে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আজকের দিনে কোনো আদর্শ নেই, যা কোটি-কোটি মানুষ একবাক্যে মেনে নিতে পারে। ভারতে শেষ সুযোগ পেয়েছিলো ইংরেজরা, তাদের সভ্যতা অনেক বিষয়ে উন্নত ছিলো, এবং ভারতের উপকূলে আধুনিক জগৎকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তারাই নিয়ে এসেছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতবাসীকে তাদের নিজ-নিজ ভাষা আর জীবনধারা ভুলিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রথিত ক'রে ফেলতে তারা যে পারলো না তার কারণ তাদের অক্ষমতা নয়, ভারতের প্রতিভা। আর আজকের দিনে সে-রকম কোনো কল্পনারও আর স্থান নেই, বড়ো বেশি দেরি হ'য়ে গেছে তার পক্ষে, চারদিকেই আত্মচেতনা তীব্র।

তথাকথিত প্রাদেশিকতা ভুলে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় ব'লে অনুভব করার উপদেশ আজকাল শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে বাঙালি বা মরাঠি ব'লে ভাবা যদি প্রাদেশিকতা হয়, নিজেকে ভারতীয় বা ইংরেজ বা চৈনিক ব'লে ভাবাও কি তাই নয়—এই আজকের দিনে, যখন এক পৃথিবীতে এক মানুষের আসন রচিত

হচ্ছে দিকে-দিকে? কিন্তু যেহেতু 'য়োরোপীয়' বা 'ভারতীয়' নামক কোনো ভাষা নেই, তাই ফরাশি, জর্মন, ইংরেজ, রাশিয়ানের মতো আমাদেরও প্রথম পরিচয় হবে তামিল, কানাড়া, মরাঠি, বাঙালি, গুজরাতি ব'লে। সেটা প্রকৃতিরই বিধান ; আমার গায়ের রং কালো ব'লে যেমন নালিশ করা চলে না, এও সেই রকম। এবং এই বৈচিত্র্যের অর্থ বিরোধ নয়, বিচ্ছেদ নয় ; এই বৈচিত্র্যই ভারতের ঐতিহ্য ও ভবিতব্য, তার চিন্ময় সম্পদ। বিভিন্ন পক্ষের বৈশিষ্ট্য লোপ ক'রে দিয়ে মিতালি গ'ড়ে ওঠে না ; চারিত্রিক ঐশ্বর্য বিকশিত হ'লেই সত্যিকার মিলন সম্ভব হয়। বন্ধুকে ভালোবাসি ব'লে তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাসা বাঁধতে চাই না, নিজ-নিজ পারিবারিক বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকলেই বন্ধুতা সফল হ'তে পারে। এ-কথা সকলের পক্ষেই সমান সত্য ; বিহারি, আসামি, উড়িয়া, মলয়ালি যে-কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হ'লে তাতে ভারতেরই অঙ্গহানি হবে। আজ ভারতের প্রত্যেক ভাষা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, চায় আত্মবিকাশের চরম অধিকার, নিজেকে ফলিয়ে তুলতে চায় বৃহত্তম কর্ম-জীবনে। সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত ক'রে রাজ্যের সীমানা কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে চাইলে মানুষের মর্মস্থলে আঘাত করা হয়। এ-সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার সুবিধের কথাটা বড়ো ক'রে ভাবলে চলবে না ; কেননা রাষ্ট্র একটা যন্ত্র হ'লেও তার অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয়—তারা মানুষ—পাঠ্য বইয়ের কাল্পনিক 'economic man' বা 'political man' নয়—রক্তমাংস-হৃদয়-মন-সম্পন্ন জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তারা শুধু খেয়ে প'রে বাঁচতে চায় না, শুধু কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচতে চায় না, চায় প্রকাশিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে, দুঃখ পেতে, ত্যাগ করতে। তাদের যে শুধু খিদে পায় আর খিদে মিটলেই ঘুম পায় তা নয়, তারা চিন্তা করে, অনুভব করে, সংগ্রাম করে ; আদর্শ আছে তাদের, সেই আদর্শ উপলব্ধি করার চেষ্টাও আছে। তাদের সেই আন্তরিক জীবনে বিঘ্ন ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ অন্য কিছুতেই হ'তে পারে না।

যামিনী রায়

বিষ্ণু দে

যামিনী রায়ের চিত্রাবলী এতই চিত্রগুণে শুদ্ধ, যে তাঁর বিষয়ে ভাষায় লেখা সক্ষম হলেও মূলত ব্যর্থ হতে বাধ্য। সচরাচর এই চিত্রগুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আক্রমণে কাবু দেখা যায়। তাই আমরা গল্প না পেলে চিত্রকে দুর্বোধ্য তো বলিই, তার সামাজিক সত্তাও দেখতে পাই না। মাতিসের মতো যামিনী রায়ের দীর্ঘ চিত্রসাধনার বিষয়ে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে আমরা হয়তো তাঁর বিশেষ দু-একটি ধরনের ছবি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তাঁর কীর্তির সামগ্রিক উৎকর্ষ উপলব্ধি আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

কারণ মাতিসের সঙ্গেই তাঁর শিল্পস্বভাবের কিছুটা তুলনা সম্ভব হলেও, এক হিসাবে তাঁর বিকাশের বহুবিধ ঐশ্বর্যের তুলনা মেলে খানিকটা পিকাসোরই সঙ্গে, যদিচ পিকাসোর বুদ্ধিখর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর অস্থির কৌতূহল বা পিকাসোর মায়ামমতাহীন গড়ে ভাঙা ও ভেঙে গড়া এক স্বতন্ত্র শিল্পস্বভাবের ইতিহাস।

বাঁকুড়ার এক অন্তর্বর্তী গ্রামে তাঁর জন্ম। লোকসংস্কৃতির অবশেষে ও অপেক্ষাকৃত আঞ্চলিক সচ্ছলতার মধ্যে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর শৈশব তাঁর জীবনের বিকাশে নিরর্থক নয়। শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীণ পটভূমিতেই আরম্ভ। এরই স্মৃতি তাঁকে ভুলতে দেয় নি কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্পমার্গের অসারতা। তাঁর নিজের হাতের অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও। কারণ ইওরোপের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতিতে যামিনী রায়ের কৃতিত্ব ইওরোপের বাইরে অভূতপূর্ব। অবশ্য এই ইওরোপীয় রীতির যুগে তাঁর বিস্তৃত কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছে, বিশেষ করে দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও মুখের টাইপের জ্ঞান তাঁর তুলিতে মজ্জাগত হয়ে গেল এই পোর্ট্রেটের যুগেই। এবং রেখাসংক্ষেপের দখলও এসে গেল এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সুনাম ও পসারের মধ্যে যামিনী রায়ের মানসিক যন্ত্রণা মোড় ফিরল, সন্ধিক্ষণের বিপ্লবী দিকে, ব্যক্তিগত স্টাইল বা রীতির সামাজিক শিকড়ের অন্বেষায়। প্রথমত রূপান্তরের তাগিদ তাঁর এল তাঁর তৎকালীন শিল্পসাফল্য এবং তাঁর দর্শক-ক্রেতা

বাবুসমাজের সম্বন্ধের মধ্যে মানসিক অসারতা বা উভয়ত প্রাণবন্ত শিল্পপ্রেরণার অভাব উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত তিনি দেখলেন যে ঐ পূর্বোক্ত কারণেই আমাদের জেবলী বা উন্মূল শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতিতে ইওরোপের ওস্তাদের ঐতিহ্য চালান করা ব্যর্থ চেষ্টা। তাছাড়া এদেশের কড়া রৌদ্রের আলোয় ছায়াবর্ণাঢ্য প্রথাসিদ্ধ তৈলাঙ্কনের অর্থহীনতাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হল।

তখন থেকে তাঁর তপশ্চর্যা, সারল্যের অভিযানে অবিশ্রাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথমদিকেই তাঁর সাফল্য দেখা যায়,—বহুর মধ্যে একটি ধরনের উদাহরণই দেওয়া যাক, তাঁর সাঁওতাল মেয়েদের বা পুরুষদের মনোরম ছবিগুলি, কিংবা কৃশ বাংলার মা, বাহুতে ছেলে। যামিনী রায় তখনও তেল-রং ব্যবহার করেন, কিন্তু লঘু মসৃণ টানে। এ সময়েই দেখা যায় তাঁর ছবিতে রংগুলির পারস্পরিক সমান চাপের দিকে একটা ঝোঁক। দেখা যায় আকারগত এবং রেখাগত শুদ্ধতা এবং রঙের একটা ভাবব্যঞ্জক গঠনমূলক ব্যবহার।

অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য চিত্রকর হয় আকারের ভাস্কর্যমূলক সমস্যায় কম-বেশি ভাবিত থাকেন (সেজান্ থেকে পিকাসোর অনেক কাজ অবধি) নয়তো রঙের লিপিমূলক ঐশ্বর্যবিস্তারে ঝোঁক দেন (ইম্প্রেশনিস্ট থেকে মাতিসের অনেক কাজ অবধি)। যামিনী রায় চিত্রের গঠনময়তা আর ভাস্কর্যে কঠিন স্পর্শসহতা কখনও এক ভাবেন নি, আবার বর্ণাঢ্য রেখার স্পষ্টতাও তিনি কখনও হারান নি বর্ণের বিলাসে। ভারতবর্ষের শিল্পের ঐতিহ্যে তিনি দরবারী মিনিয়েচর রীতিবিলাসকে কোনোদিনই মূলধারা ভাবেন নি।

তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উচ্ছল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিত ঋজুতায়, তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙিন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরস্থ জালিধূসরের সারল্যে, যে ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হয়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা। এই ধরনের ছবিগুলি আঁকা তুলির একটানে, ধূসর পটভূমিতে, ভূসোরঙে ; যামিনী রায়ের চোখের এবং কব্জির ধ্রুব নিশ্চিত শক্তিতে এই সব ছবিতে আসে বিষয়বস্তুর গঠনবেদ্যতা—তা সে মা হোক বা শিশু হোক বা বৃদ্ধ মানুষ বা হরিণ বা বাংলার বিধবা মেয়ে। এবং সেটা আসে পরিপ্রেক্ষিতের স্তরবিন্যাসে নয়, আসে শুধু অধরা ধূসরের পটে কৃষ্ণ রেখার ধৃতসীমার সবল টানের চাক্ষুস ব্যাপ্তিতে। এই সব রেখা-শরীরের দেহভার হয়তো যাঁরা শুধু পারসীক মিনিয়েচর দেখে কাটান বা যাঁরা তথাকথিত নব্য-ভারতীয় ছবির ভক্ত তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে, যেমন যাবে তাঁদের

কাছে যাঁরা শুধু ক্যামেরার চড়া ছায়াতপে অভ্যস্ত, যে কড়া শাদা-কালোর তুলনাবৃত্তিতে চোখ খোলার মুহূর্তে মানবচক্ষুর পক্ষপাতহীন ধূসরিমার কোনো স্থান নেই।

যামিনী রায়ের প্রতিভা অবশ্য এই সিদ্ধিতে বিরাম মানে নি। যাঁরা তাঁর তুলির অবিরাম রেখার সঙ্গে কালীঘাটের জের-টানা রেখার তুলনা করে সন্তোষ পান যেন তাঁদেরই অধিকতর হতভম্ব করতে তিনি শেষ করলেন বিরাট দেয়ালচিত্রের একটি গোটা সারি। রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার কঠিন মাধুরীতে এই চিত্রমালার চৈত্যপ্রমাণ মূর্তিগুলিতে এক নতুন সৌন্দর্যের উন্মেষ। বলাই বাহুল্য, যে-কোনো গুণী শিল্পীর মতো যামিনী রায় সর্বদাই পাঠ নিতে প্রস্তুত, এবং বাংলার পট বা পাটা, রেমব্রাণ্ট বা ভানগখ কিছুই তিনি তুচ্ছ করেন নি। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচনক্ষম সজ্ঞান শিল্পী এবং তাঁর রুচি ক্ষণকালের জন্যও তাঁর তুলিকে ছাড়ে নি, অন্যপক্ষে লোক-শিল্পীরা প্রায় অভ্যাসিক কারিগর এবং সুরুচির সমান মাত্রা সচেতনতা না থাকাই স্বাভাবিক। এই বড় বড় ছবিগুলিতে চৈত্যমাত্রিক বলিষ্ঠ আকার যেমন মুখ্য তেমনি এদের আলংকারিক সৌষ্ঠবও অবিচ্ছেদ্য। এই সার্থকতা সম্ভব শিল্পীর হাতের অসামান্য দক্ষতায়, তাঁর চিত্তের একাগ্র অনুসন্ধিৎসায় এবং একান্ত শিল্পীদায়িত্ব-বোধে আর দেশের লোকের ভালোবাসার উৎসে নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে ডোবাতে পারলেই। এই ছবিগুলিতে ঘনতা পটসন্ততিতে বা স্থানযোজনায় এমনভাবে বিন্যস্ত যে শিল্পীর গঠনসুনম্যতার কর্তৃত্ব আপাতদৃষ্টিতেও স্পষ্ট অথচ তাঁর মূর্তিগুলি বা চিত্রদেহগুলি চিত্রগতই, ভাস্কর্যগত নয় এবং এ ভেদেই তাঁর শিল্পসিদ্ধির আরেক প্রমাণ।

কিন্তু যামিনী রায় একানেও থামেন নি। যেন রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার পরিচিত রসাভাসে পাছে তাঁর পরীক্ষা বহির্মুখ থেকে যায়—আসলে অবশ্য এ পরীক্ষা তাঁর মানসের গভীর আবেগবহ দ্বন্দ্বময় প্রেরণাই—তাই শুদ্ধির খোঁজে তিনি খুঁজলেন পুরাণের বাইরে, তৈরি অনুসঙ্গের বাইরে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। বাউরি, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী, সাধারণ জীবনযাত্রারত মেয়ে-পুরুষ এরা হল তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু। শুদ্ধ চিত্রসাধনায় তারা অবশ্যই নির্বিশেষ, সাধারণ, কিন্তু তবু তারা টাইপ, প্রতিভূ মানুষ সব। তাদের মুখ ভিন্ন, শরীর ভিন্ন, ভঙ্গি ভিন্ন এবং বাঙালির কাছে তারা চেনা, আত্মীয়। তাই তারা মনকে এত নাড়া দিয়ে যায়, শুদ্ধ ছবির বেষ্টনীতে প্রত্যক্ষ জীবনের রসাভাসে—মহৎ শিল্পের আপাতবৈপরীত্যগুণে খণ্ডিত সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধের শিল্পগত ডায়ালেক্‌টিকে। বুর্জোয়া স্বার্থে ইওরোপের শিল্পে যে মানুষে মানুষে ভেদের উপরেই ঝোঁক পড়েছিল গত কয়েকশত বছর ধরে, সে ঝোঁক তিনি শুধু নেতিতে ভাঙেন নি, ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কিছুটা সাহায্যে তাঁর সমাধান শ্রেণী-উত্তীর্ণ না হলেও কিছুটা আস্তিকও বটে।

শিল্পের সীমা যামিনী রায় সর্বদাই মানেন, সেখানেই তাঁর শিল্প-সাধনার মুক্তি। আধুনিক পশ্চিমা শিল্পবিদ্রোহীদের কথা তিনি প্লেটোর মতোই মানেন—জ্যামিতির আকারে, ঘন, গোলনলিকা ও উপবৃত্তই হচ্ছে প্রাথমিক রূপাকার। তবে, তারপরে, তিনি বলবেন যে শিল্প কিন্তু প্রাথমিক রূপাকার নয়, অন্তত মানুষের কাছে। মানুষের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের রসায়িত আকারের রূপায়ণ, দর্শনের বা স্মৃতির দৃশ্যের রূপান্তর বা নির্মাণ—অর্থাৎ মানবিক, সামাজিক। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর মৌলিক বস্তুপরিচয় অস্বীকার করেন না। পাবলো পিকাসোর মননী নেতিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় সব সম্বন্ধপাত ভেঙে যায়। পশ্চিম ইওরোপের বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম ক্ষণে সেটাই সংগত, পুনর্নির্মাণের, পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে। এদেশে বুর্জোয়া যুগ আরম্ভে অপ্রকৃত ও বিকাশে অসম্পূর্ণ। গ্লানি তাই বিস্তর, পুনর্নির্মাণে লাভ শুধু দ্রুত-মুমূর্ষু লোকসংস্কৃতির বিড়ম্বিত ঐতিহ্যের অবশিষ্ট সুযোগটুকু।

যামিনী রায় সেই ক্ষীণ সুযোগ তাঁর শিল্প সাধনায় সার্থক করেছেন। আমাদের শিল্পীদের মধ্যে ইওরোপকে চিত্রে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁরই সমধিক, এবং তিনিই বুঝেছেন আমাদের দুশো বছরের মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া যুগের প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর ক্ষমতার উৎস এবং হয়তো এইখানেই অসম্পূর্ণতার দোটানায় কিছুটা বা তাঁর অতীতের স্বপ্নাতীতও তাঁর ইউটোপিয়া। নিজের সাধনার একক ও প্রবল তীব্রতায় তিনি হয়তো ক্লাইভ হেস্টিংস ডালহৌসি থেকে কংগ্রেস অবধি, রামমোহন থেকে বাংলার প্রগতিতাত্ত্বিক অবধি যে নববাবুবিলাস তাকে একটু বেশি অস্বীকার করেছেন, ভাঙা-সেতুর প্রশ্নটা বড় করেন নি, মানেন নি ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে। বেলিন্‌স্কি একবার বলেছিলেন যে রুশ মহাকবি পুশকিন অর্ধেকটা জাতীয় কবি। কথাটা তখন সত্যই ছিল, আজকেই শুধু দেশের মানুষের সামগ্রিকতায় জাতির অখণ্ডতায় রুশদেশের সেই পুশকিনকেই বলা যায় জাতীয় কবি। রুশ বুর্জোয়ার তুলনায় বাংলার অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া আরও বিচ্ছিন্ন, তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সার্বভৌমত্ব আজো ইতিহাসের ভবিষ্যতে নিহিত, কর্মের ভাবী সিদ্ধির পটে সম্ভাবনায়। রুশদেশে রোমান্টিক বিদ্রোহী পুশকিনের চেয়েও কথাটা মাউন্ট-ব্যাটেন-প্যাটেল যুগে এখানে আমাদের পক্ষে আরো কঠিনভাবে সত্য—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহী যদিচ আস্তিক প্রতিভার অসামান্য ব্যাপ্তি সত্ত্বেও।

সম্ভবত মহৎ শিল্পীর আবশ্যিক একাগ্রতায় এই সমাধানের জটিলতার প্রশ্নে ঝোঁক কম পড়ে। সে যাই হোক, যামিনী রায়ের এইসব চাষী মজুর বাউল ফকির, লালপাখি হাতে নীল চাষার ছেলে, কামার, লাঠি হাতে বা টোকা মাথায় কৃষক, গৃহস্থ, বৃদ্ধা প্রবীণ ও নবীন, কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা, মায়েরা—এরা সবাই দেশের চেনা মানুষ, যামিনী রায়ের দীর্ঘ পরিচয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের মমতার শুদ্ধ রূপান্তর। এবং

এসব ছবিতে রঙের সেই প্রয়োগ যাতে চোখ পটের উপরে ঘুরে মরে না বস্তুর গোটা রূপের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ যোগবিয়োগে। যামিনী রায় এই সিদ্ধি অর্জেছেন তাঁর বৈচিত্র্যের সীমায়নে এবং বিশেষ করে প্রাণময় রেখাগণ্ডির মধ্যে রংগুলির সমলেপ চাপে এবং পারস্পরিক সংগতিতে ; তার দ্বারা তাঁর ছবি একটা সামগ্রিক সাযুজ্য লাভ করে, এমন একটা সত্তা যা স্পষ্টত ন্যস্ত এবং চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎবোধ্য, সান্ধ্য আলোকছটায় প্রশান্ত স্বচ্ছ সীমাসংহত একটা সমগ্র নিসর্গদৃশ্যের মতো।

এই একদৃষ্টিভাত রূপ যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ অবশ্যই মূলত তাঁর রীতিবিন্যস্ত রিয়ালিসম্ বা বাস্তবিকতা, যা তিনি অর্জন করেছেন প্রাকৃতবাদের বা সাংবাদিকতার বিসর্জনে, সম্ভব হয়েছে কারণ তাঁর ছবিতে প্রতি অংশ প্রাণ পায় প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতিসংস্থানে, মামুলি চিত্রের ভারসাম্যের বা বাদপ্রতিবাদের জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক কৌশলের রসাভাসে ততটা নয় যতটা সমগ্রোৎসারী সক্রিয় অঙ্গাঙ্গিতায়, রঙেরই স্বকীয় গুণের সচল সম্বন্ধপাতে, যা তাঁর অনবদ্য রেখাকর্তৃত্বের সঙ্গে হাতবাঁধা।

প্রাচ্যশিল্পে এই রং ব্যবহার খুব প্রচলিত রীতি নয়। ভারতীয় চিত্রে এ আমরা কদাচিৎ দেখি, কিছুটা হয়তো বাশোলীচিত্রে এবং কিছুটা অজন্তায়। কিন্তু অজন্তা ভারতশিল্পে একটা দুর্লভ এবং অসাধারণ কীর্তি ; অজন্তা, বলা যায়, স্থাপত্যচিত্র। তাছাড়া অজন্তায় পাওয়া যায় তার পরিমাণ বা আকার সত্ত্বেও মধ্যযুগের পুঁথি সচিত্রকরণের গাল্পিক চলমানতা। যামিনী রায়ের ছবি যেন স্থানসন্ততিতে কাটা কাটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসা স্নায়ুতে গাঁথা মানুষের রূপ। তাছাড়া অজন্তার ওস্তাদদের পাথরের গায়ে যে উপরভাসা বর্ণাভাস আনতে হয়েছিল তাও তাঁকে আনতে হয় নি।

যামিনী রায় যেসব নানারকম টেকনিক প্রয়োগ করেন বা তিনি কিভাবে টেম্পেরা বা তেলরং তৈরী করেন সেসব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে আপাত-বর্ণলয়হীন টেম্পেরা রঙে তৈলচিত্রের ভাস্বরতা ও গভীরতা আনবার অপূর্ব নৈপুণ্যে, যাঁরা তাঁর রেলওয়ে লাইনের বা বাগবাজারের গলি বা বাঁকুড়ার বাড়ি বা দক্ষিণেশ্বরের ছবি দেখেছেন তাঁরাই অবাক না হয়ে পারেন না। এবং এ প্রসঙ্গে সচরাচর অবহেলিত জমি তৈরির প্রয়োজনীয় কাজেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। রঙের ও কাপড়ের বা কাঠের বা বোর্ডের এই বিজ্ঞান তাঁর নখদর্পণে বলেই তাঁর নৈসর্গিক ছবিগুলি এত আশ্চর্য সুন্দর। তিনি অবশ্য এগুলিকে তাঁর খেলা বা ব্যায়াম মনে করেন, যদিচ যে-কোনো ইংরেজ চিত্রকর এরকম কৃতিত্বে খুশিই হতেন।

এ ছাড়াও যামিনী রায়ের বহু ছবি আছে ঃ গরু, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, হাতি—দীপ্তবর্ণ ; শিশুর মতো সরল কিন্তু যে নিশ্চিত সরলতা চরম বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ

কলাকুশলীরই আয়ত্তে। তাঁর বাইবেল-পুরাণঘটিত ছবিতে এই কুশলীপনার সর্বপটীয়সী প্রতিভা স্পষ্ট। খৃষ্টঘটিত এই চিত্রগুলিতে তাঁর বৈষ্ণব চিত্রেরই কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা, আবার বাইজানটীয় ও রুশ আইকনের সমতুল্য তীব্র আততিও তাতে মেলে।

বাগবাজারের নোংরা গলিতে তাঁর বাড়িতে যাওয়া একটা আনন্দের উৎসব ছিল। এখন তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে যাওয়াও আনন্দের ব্যাপার, আমাদের ভবিষ্যতের সুখীজগতের শান্তিময় একটা সপ্তবর্ণ আভাস।

যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তাই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনোজগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময় ; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মাতিসের কথায় এই অক্ষম পরিচিতির আরম্ভ, তাই দিয়ে শেষ করি। লুই আরাগঁ বলেছেন, মাতিস হচ্ছেন এ শতকের ফ্রান্সের তথা সুখের বা আনন্দেরই চিত্রকর। এক শতাব্দী ধরে এই আনন্দ নাকি ইওরোপে একটা নতুন ধারণা। একশো বছরে নাকি এই তারাটি আজ (১৯৪৮) মানব-আকাশে ধ্রুব হয়ে উঠেছে। এবং মাতিসের চিত্রাবলী নিশ্চয়ই এই আনন্দের যুক্তি ও প্রবল সমর্থন। মনে হতে পারে চিত্রিত বা কল্পিত এই আনন্দের ধ্যানে দর্শনে আনন্দের জন্য লড়াই থেকে লোকে নিরুদ্ধ হবে, আরাগঁ কিন্তু তা অস্বীকার করেন। তাই তিনি মাতিসকে মনে করেন সার্ত্র-মার্কা জ্বরের যম, মনে করেন অতীতের জীর্ণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আজকের আনন্দে কর্মিষ্ঠ মিছিলে মাতিস যেন একটা বিরাট নিশান।

যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন আনন্দের চিত্রলোক আমাদেরও যেন সেই নিশান নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়। মাতিস বলেছিলেন, শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চাই। যামিনী রায় চান ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই পরোক্ষ প্রেরণা।

সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব

বিনয় ঘোষ

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রণ ও সংঘাত, এবং গ্রহণ-বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের কয়েকটি এই ধরনের রীতির এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিষয় আমরা বিচার করব। কিন্তু তা করার আগে সংস্কৃতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা দরকার।

যে-কোনো জাতির যে-কোনো দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি (Persistence), সৃষ্টি (Invention) ও লয় (Loss) বলে অভিহিত করেছেন। অতীত কালের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আমরা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলি, সহজে ছাড়তে পারি না, এমনকি সজ্ঞানে চেষ্টা করেও তার প্রভাবমুক্ত হতে ব্যর্থ হই। মনের অবচেতন গুহায় সেগুলি লুকিয়ে থাকে, সুযোগ মতো বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অভ্যাস আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ধ্যানধারণা, উৎসব পার্বণ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে, অতীত সংস্কৃতির অনেক মৃত উপাদানের জীর্ণ কংকালের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, মানুষের মানসলোক একটা প্রাচীন গোরস্থানের মতো, যেখানে অতীতকালের বহু মৃত ধ্যানধারণার ভূতপ্রেত যেকোনো সময় দৌরাত্ম করার জন্য যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে। যেমন 'গুরুবাদ' বহুকালের অতীত সংস্কৃতির একটি উপাদান হলেও, আধুনিককালে সাধু-পীরদের আস্তানা থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যন্ত তার প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। তাবিচ-কবচের আধিপত্য বিজ্ঞানের যুগে অবশ্যই কমেছে ও কমছে, কিন্তু আজও তা কেন একেবারে লোপ পায়নি ভাবলে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে। সংস্কৃতির এই দীর্ঘস্থিতির বৈশিষ্ট্যকে 'পার্সিস্টেন্স' বলা হয়।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, নূতনের উদ্ভাবন, আবিষ্কার বা সৃষ্টি। যুগে-যুগে সমাজের তাগিদে নূতন-নূতন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয়, এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নূতন ধারার গড়ন শুরু হয়। নূতন-পুরাতন উপাদানের

মিল-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নূতন-নূতন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। ক-খ-গ উপাদানের সঙ্গে যখন নূতন ঘ-ঙ উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন পূর্বের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায়, এবং তার ফলে উপাদানান্তর্গত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয়, এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে এইজন্যই মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে, কেবল একটা সমষ্টি থেকে দু-একটি উপকরণের যোগবিয়োগ হয় না। নূতন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক অনাবশ্যকীয় উপাদান লোপ পেয়ে যায়। এই লয়শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক, এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

সাংস্কৃতিক স্থিতিরই একটা বড় দিক হল 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতির কালিক প্রবাহ হল ঐতিহ্য। তা ছাড়া, সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রবাহও আছে, যাকে 'ডিফিউসন' বলা হয়। সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনের গতি কালিক বলে 'ভার্টিক্যাল', এবং 'ডিফিউসনের' গতি ভৌগোলিক বলে 'হরাইজণ্টাল'। সংস্কৃতির গভীরতা হল 'ট্র্যাডিশন', এবং প্রসারতা হল 'ডিফিউসন'। একটির গতি কাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ, তা হল 'ডিফিউসনের' বা প্রসারণের ব্যাপার। কিন্তু বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বণিক গোপ সদগোপ মাহিষ্য কৈবর্ত, অথবা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায়, সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেইজন্য সাংস্কৃতিক প্রসারণ বা diffusionকে বলেন 'inter-societal transmission of culture in space', এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা traditionকে বলেন 'intra-societal transmission of culture in time'.

উদ্ভাবন যেমন সংস্কৃতির ধর্ম, প্রসারণ তেমনি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। সামাজিক বা ঐতিহাসিক অবস্থান্তরের জন্য যখন নূতন কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব হয়, তখন তার প্রসারের গতিপথ যদি কোনো কারণে রুদ্ধ হয়ে যায়, অথবা সমান গতিতে সমাজের সর্বস্তরে না প্রসারিত হতে পারে, তাহলে সংকট দেখা দেয়। যদি ভৌগোলিক কারণে, সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের জন্য নব্যসংস্কৃতির প্রসারে বাধা সৃষ্টি হয়, এবং কেন্দ্রবহির্ভূত কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি সেই কারণে অনুন্নত থাকে তাহলে তাকে বিজ্ঞানীরা 'মার্জিন্যাল কালচার' বা 'প্রান্তীয় সংস্কৃতি' বলেন।

> Cultures are retarded because of their peripheral or marginal position in geography. (Kroeber)

সংস্কৃতির ডিফিউসন বা প্রসারণের গতি হল, কেন্দ্র বা 'সেন্টার' থেকে 'মার্জিন' বা প্রান্তের দিকে। কিন্তু এই গতির কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কেন্দ্র থেকে বাইরের প্রান্তের ব্যবধান যত বেশি হবে, সংস্কৃতির প্রসার হতেও যে তত বিলম্ব হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাধারণত তাই হবার কথা, কিন্তু তা নাও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি অঞ্চল দূরের অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি অনগ্রসর। যেমন, কলকাতা শহরের সীমানা থেকে পাঁচ-সাত-দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার বহু গ্রামাঞ্চল বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক বেশি অনুন্নত। তাছাড়া, কলকাতা শহরের মধ্যেই এমন অনেক পাড়া আছে যেখানে শহরের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ পড়েনি দেখা যায়। কোনো উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের সীমানার মধ্যে এই ধরনের কোনো অনুন্নত অঞ্চল থাকলে তাকে 'ইণ্টার্নালি মার্জিন্যাল' বলা হয়। কারণ

> Some cultures remain retarded even though they are situated within the sphere of higher productive centres, and therefore they are called *internally marginal*.

সংস্কৃতির এই 'internal marginality' বা আন্তর্প্রান্তিকতা যানবাহন ও চলাচল-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঘটতে পারে, আবার সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্য এবং জাতিবর্ণগত দূরত্বের জন্যও ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন, বাংলার সংস্কৃতির এই প্রান্তীয়তার বা মার্জিন্যালিটির সমস্যা খুব বড় সমস্যা। বাইরের ও ভিতরের, দুই ধরনের প্রান্তীয়তাই বাংলার সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব (Spatial isolation and distance) এবং ভিতরের প্রান্তীয়তার কারণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান (Social isolation and distance)। এই দুই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান দূর করতে না পারলে, বাংলা দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরেও ভৌগোলিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, এবং তা না প্রতিষ্ঠিত হলে জাতীয় উন্নয়নের কাজকর্ম পদে-পদে ব্যাহত হবে।

কমবেশি সব যুগেই দেখা যায়, যুগসংস্কৃতির কতগুলি বড়-বড় কেন্দ্র থাকে। মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহদের দরবার ও শাসনকেন্দ্রই ছিল প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র। বাংলা দেশে যেমন ছিল গৌড়, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি। তার বাইরে ছিল চিরপ্রবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা। দরবারী সংস্কৃতি বা 'কোর্ট-কালচার' এবং এই

গ্রামীণ সংস্কৃতি, যা প্রধানত 'ফোক-কালচার', দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হত। রাজদরবার বা রাজধানী থেকে বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে কোর্ট-কালচার যে কদাচ বিচ্ছুরিত হত না তা নয়। হত বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছুরণ প্রায় দৈবঘটনার সামিল ছিল বলা যায়। তার কারণ, একালের মতো সেকালে যানবাহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার আদৌ কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই যোগাযোগের অভাবজনিত বিচ্ছিন্নতার জন্যই বাংলার গ্রাম্যসমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বনির্ভরতা। আধুনিক কালেও দেখা যায়, সেই রাজধানীই যুগসংস্কৃতির প্রধানকেন্দ্র বা হেডকোয়ার্টার হয়ে রয়েছে, তবে যানবাহনের ও যোগাযোগের প্রসারের ফলে আরও অনেক সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র গড়ে উঠেছে বাইরে। এইসব উপকেন্দ্র থেকে সংস্কৃতিধারা শাখাপ্রশাখা মেলে ক্রমে পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এবং গত প্রায় একশো বছরের উপর রেলগাড়ি ও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর অটোমোবিলের চলাচলের পরেও, পশ্চিমবঙ্গে প্রান্তীয় সংস্কৃতি-অঞ্চল এত বেশি সংখ্যায় আজও রয়েছে, যা বাস্তবিকই ভয়াবহ বলে মনে হয়। কলকাতা শহর থেকে পঁচিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখনও এমন সব গ্রাম আছে যেখানে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন চিঠি বিলি হয়, এবং ডুলিতে করে লোকে চলাফেরা করে। হাওড়া জেলাতেই এরকম বহু গ্রাম আজও রয়েছে। এইসব গ্রামের অতি-বৃদ্ধদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে মনে হয় যেন সভ্যতার আদিকালের কোনো প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। কলকাতা বা হাওড়া শহর কেন্দ্র করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল 'রেডিয়াস' নিয়ে যদি একটা বৃত্ত টানা যায়, তাহলে বড়-বড় কয়েকটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের মধ্যেই এই ধরনের কয়েকটি প্রান্তীয় অঞ্চল দেখা যাবে। এগুলি অবশ্য ভৌগোলিক প্রান্তীয়তার নিদর্শন। অটোমোবিলের যুগে এই প্রান্তীয়তা ধীরে-ধীরে লুপ্ত হবার কথা, কিন্তু বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অচলতা আজও অটোর স্বতঃস্ফূর্ত গতি একেবারে ভাঙতে পারেনি। তা ভাঙতে না পারলে, এবং গ্রাম শহর-নগরের মতো সচল ও গতিশীল না হলে, জাতির সংস্কৃতি কখনও জনসাধারণের সম্পদ হবে না, মুষ্টিমেয়র ভোগবিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকবে। তার চেয়েও ক্ষতিকর ফল হবে এই (এবং যা অধিকাংশ প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলে হয়েছে দেখা যায়) যে, নগর-শহরের পাঁচমিশালির সংস্কৃতির তলানিটুকু চুঁইয়ে এসে প্রান্তীয় অঞ্চলের জড়ত্বকে আরও বেশি বিষিয়ে তুলবে। নাগরিক সংস্কৃতির ভালটুকুর বদলে মন্দটুকুই তার ভাগ্যে জুটবে, এবং সেই মন্দের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হয়ে উঠবে তার জড়জীবন। বাংলাদেশের প্রান্তীয় গ্রামাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই একথা উপলব্ধি করতে পারবেন।

উন্নত সংস্কৃতিকেন্দ্রের বাইরের এই ভৌগোলিক প্রান্তীয়তা ছাড়াও বাংলার সংস্কৃতির ভিতরের প্রান্তীয়তা কম নেই। বাইরের তুলনায় ভিতরের এই ব্যবধান আরও

অনেকগুণ বেশি ভয়াবহ। বাইরের প্রান্তীয়তার কারণ ভৌগোলিক দূরত্ব, কিন্তু কোনো সংস্কৃতিবৃত্তের ভিতরের প্রান্তীয়তার প্রধান কারণ 'সামাজিক দূরত্ব' (Social distance)। ভৌগোলিক দূরত্ব যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে অপসারিত করা সম্ভব ও সহজ, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব সহজে দূর করা যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচে গেলে এবং সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণের বা 'হরাইজণ্টাল ডিফিউসনে'র গতি বাড়লে, বিভিন্ন লোকস্তরের সামাজিক দূরত্বও ধীরে-ধীরে কমতে থাকে, কিন্তু সেই কমা না-কমার ব্যাপার অনেকাংশে নির্ভর করে দূরত্বের ধরনের উপর। বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেন যে সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারণ তার ঊর্ধ্বাধ বা 'ভার্টিক্যাল' গভীরতাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিলম্বিত তালে করে, কারণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও জাতিবর্ণবিন্যাসের উপর সংস্কৃতির ঊর্ধ্বাধ প্রসারণ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নূতন সংস্কৃতির ঐহিক ও মানসিক উপাদান যখন কেন্দ্র থেকে প্রান্তের দিকে প্রসারিত হতে থাকে, তখন সেই যুগের সমাজের সচেতন উপরের জনস্তরের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে, তার নিচে খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এইজন্যই দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকই 'সমসাময়িক' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

The fact is that only a handful of people in any age are its true contemporaries. Only sluggishly do the mass of people respond to the currents that are sweeping through the ruling classes or the intellectual elite ; if this is mainly true even today, it was more so before universal literacy had quickened the space of communication. (Lewis Mumford).

প্রত্যেক যুগে মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর লোকই তাঁদের কালের গতিশীল সংস্কৃতির মুখপাত্র হন, এবং তাঁদেরই কেবল সেই যুগের বিচারে 'সমসাময়িক' বলা যায়। নূতন যুগের আবির্ভাবকালে সংস্কৃতিকর্মের বেশির ভাগ উদ্যম তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার শতাংশের একাংশও বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। তার কারণ, সংস্কৃতির বাহনগুলির বিকাশ আগের যুগে তো হয়ইনি, আধুনিক জনশিক্ষার যুগেও তার বিকাশ নানাকারণে ব্যাহত হয়েছে। যুগে-যুগে যুগ-সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তকশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোকসমাজের ব্যবধান তাই ক্রমে দুস্তর হয়েছে। প্রাচীন যুগের চেয়ে মধ্যযুগে ব্যবধান বেড়েছে, এবং তার চেয়ে আরও অনেক বেশি বেড়েছে আধুনিক যুগে। তার কারণ, সংস্কৃতির অগ্রগতির বেগ যত বেড়েছে, সমাজের শ্রেণীগত দূরত্ব ও জাতিবর্ণগত দূরত্বের সেই অনুপাতে অবসান হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার যত বেড়েছে, সামাজিক গভীরতা সেই অনুপাতে

বাড়েনি। ভাবগত ও বাস্তব উপাদানগত সংস্কৃতিসম্পদ থেকে বৃহত্তর জনসমাজ তাই ক্রমেই বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলার সমাজে আধুনিক যুগসংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসারও ব্রিটিশ আমলে ব্যাহত হয়েছে, তার কারণ, স্বাভাবিক গতিতে সংস্কৃতির টেক্‌নোলজিক্যাল উপাদানের বিকাশের পথে (যেমন যানবাহন, কলকারখানা, শহর-নগর ইত্যাদি) তাঁরা নানারকমের অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের সঙ্গে একালের নাগরিকসমাজের ব্যবধান ক্রমে বেড়েছে, এবং বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির আঞ্চলিক বৃত্তগুলি যুগ-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে বিকৃতি, অবনতি, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। 'ট্রাইবাল' যুগ থেকে মধ্যযুগের সংস্কৃতির অনেক উপাদান আধুনিক যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যেও স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে রয়েছে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের অন্যতম সাংস্কৃতিক লক্ষণ হল, মনের বিকেন্দ্রণ (delocalisation of mind)। আধুনিক লোকমানসের বিকাশের স্বাভাবিক গতি এই বিকেন্দ্রণের দিকে, কিন্তু এর কোনও চিহ্ন বাংলার গ্রাম্যসমাজে আজও বিশেষ দেখা যায় না।

বাংলার সমাজে (এবং ভারতীয় সমাজেও) সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক বৈষম্য। এই বৈষম্যই আমাদের দেশে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ বললে অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক যুগের শ্রেণীগত দূরত্বের সঙ্গে এই জাতিবর্ণগত দূরত্ব মিলিত হয়ে এমন একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা পাশ্চাত্ত্য বা অন্য কোনো সমাজে বিরল বলা চলে। সংস্কৃতির 'ভার্টিক্যাল' প্রসারের পথে এই প্রবল অন্তরায় যতদিন না অপসারিত করা সম্ভব হবে, ততদিন কেবল সংস্কৃতির 'হরাইজন্টাল' প্রসারে সমস্যার সমাধান হবে না। বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণে জাতিবর্ণসম্প্রদায়ের এই সামাজিক দূরত্বই সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক কারণরূপে কাজ করেছে। মানসিক বিকেন্দ্রণের মতো, বিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতি হল সামাজিক দূরত্বলোপের দিকে (Social de-distantiation)। সংস্কৃতিবিচারের দিক থেকে এই সামাজিক স্তরীয় দূরত্বের গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মত হল,

> Another important example of social distance is the vertical distance between hierarchical unequals...This is reflected in an enormous number of behaviour patterns developed by hierarchically stratified societies...In the sociology of culture the problem of vertical distance and distantiation is, of course, paramount. It is important to see that vertical distantiation may concern, not only the mutual relationship of two groups, but also

the relationship between a person or group and inanimate objects of cultural significance. (Karl Mannheim).

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-উপজাতির সামাজিক স্তরবিন্যাস এত দৃঢ় ও গভীর যে সেখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা কোনো নিটোল রূপ সহজে নজরে পড়ে না। তার মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারা-উপধারা ও উপাদান মিশ্রিত হয়েছে। জাতিবর্ণ-ভেদে একই উৎসবের ও একই বস্তুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের তারতম্য আছে দেখা যায়। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য তো আছেই। গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি বাঁধাধরা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বোঝায়, এরকম একটা কেতাবী ধারণা আমাদের অনেকের মনে আছে। কিন্তু সরজমিনে যাঁরা সেই সংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণে অগ্রসর হবেন, তাঁরাই তার জটিলতায় ও বৈচিত্র্যে বিস্মিত হবেন। এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম্য-সমাজের জাতিবর্ণগত স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন জনস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক শ্রেণীদূরত্বকেও এই সামাজিক দূরত্ব ছাড়িয়ে গেছে। এমন অনেক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আজও আছে যেখানকার বসতিবিন্যাসের মধ্যে বর্ণপ্রাধান্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণীপ্রাধান্য (যা শহরে দেখা যায়) বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত শহরের মতো বসতিবিন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত নয়। একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্রের বাস এক-অঞ্চলে। পরিষ্কার বোঝা যায়, জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণীদূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি দুস্তর। এই সামাজিক দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে একটা দুস্তর মানসিক দূরত্বও রচিত হয়েছে। গ্রাম্য উৎসব-পার্বণের বাইরের মেলামেশায়, অথবা গ্রাম্য জীবনের সরল প্রীতির সম্পর্কের আবরণে অনেক সময় এই সামাজিক দূরত্ব ঢাকা থাকে। কিন্তু হাজার মেলামেশাতেও যে গ্রামের বিভিন্ন জনস্তরের মানসিক দূরত্ব ঘুচে যায়নি তা যে-কেউ গ্রামের মধ্যে পা দিলেই বুঝতে পারবেন। বৈজ্ঞানিক অর্থে এই সামাজিক দূরত্বকে 'মানসিক ব্যবধান' বললেও ভুল হয় না। একজন বিখ্যাত মানস-বিজ্ঞানী সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই 'সামাজিক দূরত্বে'র প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাহাজ ক্রমে বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। বন্দরের শহরটিও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এমন সময় গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিদিক। মনে হল, শহরটা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে অনেক দূরে সরে গেল। একেই বলে 'ডিস্ট্যান্টিয়েশন'।

This is 'distantiation', for the town ramains spatially near ; it becomes more distant only in a psychological sense. (E. Bullough).

কুলগত বর্ণগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত অজস্র সংস্কারের কুয়াশা বিভিন্ন জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়কে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। একই গ্রামে বা একই অঞ্চলে অনেক কাছাকাছি বংশানুক্রমে বাস করেও মনের দিক থেকে তারা পরস্পরকে কাছে টানতে পারেনি। বাংলার গ্রাম্যসমাজের ও গ্রামীণ সংস্কৃতির (এবং সাধারণভাবে ভারতীয় সমাজেরও) এটা একটা কঠিন জটিল সমস্যা। স্থানিক দূরত্ব না থাকলেও যে এই মানসিক দূরত্ব সহজে ঘুচবে, তা মনে হয় না। তা যদি ঘুচত, তাহলে একই গ্রামে ও অঞ্চলে উন্নত জাতিবর্ণের পাশাপাশি অসংখ্য অনুন্নত উপজাতি-বর্ণের অস্তিত্ব থাকত না।

এখানে সংস্কৃতিবিজ্ঞানের দিক থেকে একটি বড় প্রশ্ন অনেকের মনে জাগবে। প্রশ্নটি হল ঃ সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসার হলেই কি তার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর ? এই প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হল ঃ সংস্কৃতির অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে উর্ধ্বাধ প্রসারের সম্পর্ক কি? সংস্কৃতিবিজ্ঞানে 'ডিফিউসনে'র প্রত্যয়টি অনুভূমিক প্রসারের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদানের ভৌগোলিক বিস্তরণই 'ডিফিউসন'। যান্ত্রিক যানবাহনের উন্নতি ও বিজ্ঞানের প্রগতির উপর এই ভৌগোলিক বিস্তার নির্ভরশীল। সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ও দূর প্রান্তে সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্রমবিস্তার হতে পারে, কিন্তু যে সমাজের 'ভার্টিক্যাল মোবিলিটি' কম এবং স্তরীয় দূরত্ব খুব বেশি, সেই সমাজে তার দূরপ্রসারী কোনো প্রতিক্রিয়া না হবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং কেবল যান্ত্রিক যানবাহনের সাহায্যে সাংস্কৃতিক উপকরণ জনসমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলে চলবে না। তার ফলে সমাজের উর্ধ্বাধ গতি খানিকটা বাড়বে ঠিকই, কিন্তু এতটা বাড়বে না যাতে দীর্ঘকালস্থায়ী সামাজিক দূরত্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানসিক ব্যবধানের অবসান ঘটতে পারে। সেই ব্যবধান দূর করতে হলে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। যান্ত্রিক যানবাহনের সঙ্গে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানেরও বিস্তার হতে থাকে, যদি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানাদর্শের আলোক শহর-নগরের মূলকেন্দ্র থেকে সুদূর প্রান্তবর্তী গ্রামের সর্বনিম্ন জনস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়, তাহলে সংস্কৃতির অনুভূমিক গতির সঙ্গে উর্ধ্বাধ গতিও বাড়তে পারে এবং তার সামগ্রিক সুসমঞ্জস রূপায়ণও সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সংস্কৃতির রূপায়ণে ভৌগোলিক প্রসার এবং সামাজিক ও মানসিক দূরত্বের সমস্যা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক রূপায়ণের আরও একটি উল্লেখনীয় দিক আছে, যা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সেই দিকটা হল, দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার বাহক দুটি বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য বা কাছাকাছি বসবাসের ফলে, দুই সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাতের ও মিলন-মিশ্রণের দিক।

দুই সংস্কৃতির সান্নিধ্যজাত এই মিলনমিশ্রণ ও সমন্বয়কে বিজ্ঞানীরা বলেন 'অ্যাকালচারেশন'।

> We mean by acculturation the processes whereby societies of different cultures are modified through fairly close and long-continued contact, but without complete blending of the two cultures. (Gillin and Gillin : *Cultural Sociology*)

'অ্যাকালচারেশনে'র সঙ্গে 'ডিফিউসনে'র সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ আবশ্যক। কিন্তু 'ডিফিউসনে'র জন্য সান্নিধ্যের বা পাশাপাশি অবস্থানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। একটা নূতন আইডিয়া বা আদর্শ, অথবা সংস্কৃতির কোনো নূতন টেকনোলজিক্যাল উপাদান এক কেন্দ্র থেকে বহুদূর কেন্দ্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতিমিশ্রণ ও সমন্বয় তিন রকমে হতে পারে ঃ ১। দুটি ভিন্ন জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং তার ফলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে ; ২। ভিন্‌দেশাগত লোকেরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য ঘটাতে পারে ; ৩। বিদেশীরা দেশ জয় করে বিজেতাদের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতেও পারে। সাধারণত এই তিন উপায়ে ভিন্ন সংস্কৃতির সান্নিধ্য ও মিলন-মিশ্রণ ঘটা সম্ভব হতে পারে।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ইতিহাসে এই মিলন-মিশ্রণের বা 'অ্যাকাল-চারেশনে'র গুরুত্ব খুব বেশি। ভারত-সংস্কৃতির ইতিহাসেও এর গুরুত্ব কম নয়। প্রাগিতিহাসের দিগন্তরেখা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত। পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ডাচ্-ফরাসী-ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্য, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে বাংলাদেশে। তা ছাড়া, নানা উপজাতির ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শের নিদর্শনও বাংলার সংস্কৃতিতে কম নেই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংঘাতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল বাঙালী খ্রীষ্টানরা। বাঙালী মুসলমানদের সাধারণ জনস্তরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণের নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি লোকায়ত স্তরে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট আছে দেখা যায়। বাংলার বহু লোকদেবতা ও পীরগাজী এই 'অ্যাকালচারেশনে'র সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিরূপে গ্রামে-গ্রামে বিরাজ করছেন। বাংলা দেশের সাঁওতাল, মুণ্ডা, বাউরী প্রভৃতি অনেক উপজাতির সংস্কৃতির মধ্যে উন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। এমনকি বৈষ্ণব-শাক্ত, শৈব-তান্ত্রিক প্রভৃতি ধর্মপন্থীরা এক-একটি অঞ্চলে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। সাংস্কৃতিক লেনদেন খুব বেশি পরিমাণে

বাংলা দেশে হয়েছে বলে এখানে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব সাধারণ মানুষকে তেমন অনুদার ও সংকীর্ণচিত্ত করতে পারেনি। সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু 'অ্যাকালচারেশনে'র বৈচিত্র্য সেই দূরত্বাবসানে বা 'সোশ্যাল ডি-ডিস্ট্যান্টিয়েশনে' বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। 'অ্যাকালচারেশনে'র ধর্মই তাই। যে-কোনো দেশের সাংস্কৃতিক 'প্যাটার্ন' ও 'কম্‌প্লেক্সে'র উপর যদি ঘন ঘন ভিন্ন সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাত হতে থাকে, তাহলে সে-দেশের সং স্কৃতি সহজে জড়ত্বলাভ করতে পারে না। বাংলার সংস্কৃতি এই কারণে, জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়গত সামাজিক দূরত্ব ও মানসিক ব্যবধানের মধ্যেও, দীর্ঘকাল ধরে তার সজীবতা কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এই সজীবতা চিরস্থায়ী নয়। সামাজিক দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে লুপ্ত না হলে, তার দেনা চক্রবৃদ্ধি-হারে তাকে শুধতে হবে। অতীতের লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, অথবা সমাজের উচ্চশ্রেণীর উন্নতি-প্রগতির আওয়াজ, কোনো কিছুতেই তার অনিবার্য স্থবিরত্ব রোধ করা সম্ভব হবে না। কেবল ফাঁকা আওয়াজ এবং তার সঙ্গে দিকভ্রান্ত ব্যর্থ প্রয়াসই সার হবে। দিনে দিনে সংস্কৃতির মধ্যে নানারকমের অসঙ্গতি, বিরোধ ও বিশ্রী বিকৃতি দেখা দেবে, যা বর্তমানে কিছু-কিছু দেখা দিচ্ছে, এবং সমাজ শরীরের সর্বত্র তার বিষাক্ত প্রক্রিয়াও শুরু হবে। সমাজকল্যাণের জন্য তাই বাংলার যুগসংস্কৃতির অনুভূমিক ও উর্ধ্বাধ প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, এবং সেই প্রসারের পথে ভৌগোলিক ও সামাজিক দূরত্বের সমস্ত অন্তরায় দূর করা আবশ্যক। তা না হলে অনিবার্য সংস্কৃতিসংকট সমগ্র বাংলার সমাজকে এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না।

চার্বাক ও লোকায়ত

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১ ॥ রকমারি সমস্যা

চার্বাক নিয়ে অনেক সমস্যা আছে।

চার্বাক মানে কি? চার্বাক কি কোনো ব্যক্তির নাম, নাকি কোন সম্প্রদায়ের নাম?

সাবেক কালের ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যায় লেখা একালের নানা বইতে চার্বাক শব্দের প্রধানত দু'রকম মানে দাঁড় করাবার চেষ্টা দেখা যায়।

এক : 'চারু বাক্' থেকে চার্বাক।

দুই : 'চর্ব' (অর্থাৎ চর্বণ) থেকে চার্বাক।

কিন্তু হাঙ্গামা আছে। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনোটাই টেঁকে না।

'চারু + বাক্' থেকে 'চারুবাক্' হবার কথা, চার্বাক নয়। অবশ্য মাঝখানের 'উ'-কারটা লুপ্ত হতে পারে। তাহলেও কিন্তু কথাটা হবে 'চার্‌বাক্' বা 'চার্বাক্', অর্থাৎ শব্দটির শেষে 'ক'-এ হসন্ত বা 'ক্' হবার কথা। অথচ ভারতীয় দর্শনের সব বইতেই শব্দটি 'অ'-কারান্ত। কোথাওই 'চার্বাক্' লেখা নেই ; সর্বত্রই চার্বাক।

তাহলে কি 'চর্ব' থেকে চার্বাক? বলা হয়, 'চর্বণ করে যে'—এই অর্থে চার্বাক। কিন্তু ব্যাকরণ অনুসারে 'চর্বণ করে যে'—এই অর্থে 'চার্বক' শব্দ নিষ্পন্ন হবার কথা, চার্বাক নয়। মাঝখানে একটা 'আ'-কার আসবে কোথা থেকে?

অবশ্য ব্যাকরণের কূটকচাল নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমাদের আলোচনা দর্শন বা মতাদর্শ নিয়ে। সেদিক থেকে কিন্তু বিশেষ করে নজর দেবার মতো একটা ব্যাপার এখানে আছে। ব্যাকরণের বিচারে চার্বাক শব্দের ওই দুরকম মানে দাঁড় করাবার চেষ্টায় গলদ থাকলেও, মতাদর্শ বিচারের দিক থেকে কোনোটাই নিরর্থক নয়। দুরকম চেষ্টার পিছনেই বরং একই উৎসাহ।

কিসের উৎসাহ? ঠেস দেবার বা খোঁচা দেবার উৎসাহ। কিছুটা সাধু ভাষায় যাকে বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। চালু কথায় প্রোপাগাণ্ডা।

চারু থেকে চার্বাক। অর্থাৎ যে-সব কথা—বা যার বা যাদের কথা—দেশ সুন্দর, চারু ; মনের মতো কথা, মনকে সহজে টানবার মতো কথা। কিন্তু তারিফ নয়, বিদ্রূপ। আসল বক্তব্যটা এই যে কথাগুলো নেহাতই আপাত মনোরম বা আপাত-সুন্দর। কী রকম কথা? খাও, দাও, ফুর্তি করো, পরকাল-পরলোক নিয়ে মাথা-ব্যথার কোনো কারণ নেই ; কেননা এসব নেহাতই লোক-ঠকানে গাল-গল্প। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাৎপর্যটা খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন : 'মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভোগের দিকে। দর্শনের সিদ্ধান্ত গভীর চিন্তার পর জ্ঞাত সত্য হিসাবে যদি এই সব প্রবৃত্তির সাফাই গাওয়া হয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত বহু নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী! চার্বাকের অদৃষ্টে সেই বাহবা জুটিয়াছিল। ... প্রবৃত্তির উপাসনার সহায়ক তাহার উক্তি মধুর—শ্রুতি-সুখকর—সেইজন্য চারু।' কতো অনায়াসে মতটাকে হেয় করবার আয়োজন! চার্বাক শব্দ থেকেই বোঝা যায়, মতটার মধ্যে মহত্তর আদর্শের বালাই নেই ; বরং একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। কিংবা, চার্বাকের সম্বন্ধে বেশ কড়া হুঁশিয়ারি। ওসব মন-ভোলানো কথায় কান দিলে ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হবার আশঙ্কা।

চর্ব থেকে চার্বাক। এই ধরনের মানে দাঁড় করানোর পিছনেও একই উৎসাহ। খানা-পিনাটুকুই বুঝি পরম পুরুষার্থ। এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না এবং অপরকে বুঝতে দিতে চায় না বলেই নাম চার্বাক। অতএব সাবধান! এই মত একেবারে সর্বনেশে মত, সরাসরি উচ্ছন্নে পাঠাবার উপদেশ।

তাহলে, ব্যাকরণের বিচারে টিঁকুক আর নাই টিঁকুক, দুরকম মানে দাঁড় করাবার পিছনে একই উৎসাহ। একই বিদ্বেষ। বিদ্বেষটা শুধু একালের লেখাতেই নয়। বহু শতাব্দী ধরে বহু গ্রন্থে এই বিদ্বেষের পরিচয়। রাশিরাশি নজির আছে।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে এতো বিদ্বেষ? নিশ্চয়ই একটা দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে। কিন্তু দার্শনিক মতের কথা ভাবতে গেলে মানুষের কথাও ভাবতে হয়—যে বা যারা ওই মতের প্রবর্তক বা সমর্থক। দার্শনিক মত হাওয়ায় গজায় না অর্থাৎ চার্বাক বলতে একটা দার্শনিক মত বোঝালেও চার্বাক-মতানুযায়ী মানুষের কথাও ভাবা দরকার।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে : চার্বাক কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম, নাকি কোনো সম্প্রদায়ের নাম—যে সম্প্রদায়ের সকলেই চার্বাকপন্থী?

ব্যক্তির নাম মনে করলে অবশ্যই অনেক প্রশ্ন উঠবে। কোথাকার লোক? কবেকার লোক? কেননা, দেশটা ছোটো নয়। দেশের ইতিহাসও সুদীর্ঘ। তাই স্থান-কাল বাদ দিয়ে কারুর পরিচয়ই পর্যাপ্ত হয় না। আবার, চার্বাক যদি ব্যক্তিবিশেষের নাম না হয়ে সম্প্রদায় নাম বলেই বিবেচিত হয়, তাহলেও রকমারি প্রশ্ন থেকে সহজে

রেহাই পাওয়া যাবে না। কোথাকার সম্প্রদায়? কবেকার সম্প্রদায়? তার কি কোনো শাখা-প্রশাখা বা উপসম্প্রদায় ছিলো?

প্রশ্নগুলো অবশ্যই অবান্তর নয়। এগুলো একেবারে এড়িয়ে যেতে গেলে চার্বাকের আলোচনা অনেকাংশে অবাস্তব হবার আশঙ্কা। কিন্তু শুরুতেই এসবের বিচারে এগুতে গেলে খানিকটা ফেঁসে যাবারও ভয় থাকে। তার কারণ ছোটো করে বলে রাখা ভালো।

প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করা দরকার, প্রশ্নগুলোর নির্ভুল উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের গবেষণা আরো গভীর হলে ভবিষ্যতে এসব সমস্যার কোনো কিনারা হবে কিনা তা নিয়ে এখুনি মাথা ঘামিয়েও লাভ নেই।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে হাল-আমলের বিদ্বান্‌রা সমস্যাগুলোর আলোচনা করেননি। অনেকেই করেছেন। অনেক রকম আলোচনা। এবং বিদ্বান্‌ হিসাবে তাঁদের অনেকের নাম এমনই শ্রদ্ধেয়, যাঁদের কথা উড়িয়ে দেওয়া বেশ কিছুটা দুঃসাহসের ব্যাপার। কিন্তু মুস্কিল এই যে তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও মিল নেই : একের কথা অপরে অনেক সময় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, অনেক সময় একেবারে বরবাদ করে দিতে চেয়েছেন। তার একটা কারণও আছে। তাঁদের মন্তব্য সব সময় ঠিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তর মতো নয়, বা সিদ্ধান্ত হিসেবে এগুলি ঠিক বৈজ্ঞানিক মর্যাদার দাবিদার নয়। প্রায়ই বেশ কিছুটা জল্পনা-কল্পনার মতো। যৎসামান্য তথ্য থেকে বড়োসড়ো কথা প্রমাণ করার উৎসাহও চোখে পড়ে। তথ্য নিয়েও হাঙ্গামা আছে। প্রায়ই যে-কথা চার্বাক সংক্রান্ত তথ্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হয়ত তথ্যই নয়! তথ্য-বিকৃতি কখনো বা নেহাতই বিরুদ্ধ প্রচার। যাকে বলে প্রোপাগাণ্ডা। পরে দেখবো, চার্বাকদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার বহর কতখানি, আর তার পিছনে আসল উৎসাহটাও কেন অতি প্রবল। হাঙ্গামা আরো আছে। পুরোনো পুঁথিপত্রে চার্বাক প্রসঙ্গে যে-সব কথা লেখা আছে, তার মধ্যে অনেক সময় অন্তত আপাতদৃষ্টিতে মিল খুঁজে পাওয়াও কঠিন।

এইসব নানা কারণে প্রাচীন চার্বাক নিয়ে আধুনিক বিদ্বান্‌দের বিবিধ ও বিচিত্র সিদ্ধান্ত। প্রায়ই পরস্পর-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তও। এই কারণে শুধু তাঁদের বিদ্যার নজির থেকেই সিদ্ধান্তের সার্থকতা অনুমান করা নিরাপদ নয়।

সোজা কথায় অনেক তর্ক আছে। তর্ক আরো বাড়ানো যায়। কিন্তু শুরুতেই সে-সবের আলোচনা তুলতে গেলে সমস্যাগুলো আরো ঘোলাটে হবার ভয়। যেটুকু মোটের উপর সুনিশ্চিত এবং বিশেষ করে আজকের দিনে চার্বাক নিয়ে আলোচনা যেটা আসল তাগিদ তাও রকমারি বিতর্কের আর পুঁথি-বিচারের অলিগলিতে হারিয়ে যাবার ভয়।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা করা যাক। চার্বাক মানে কী, চার্বাক কোনো ব্যক্তির নাম না সম্প্রদায়ের নাম—এই সব প্রশ্ন নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও, অন্তত একটি বিষয়ে তর্ক তোলার বড়ো একটা সুযোগ নেই।

কী বিষয়ে?

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে প্রসিদ্ধ ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে একটি প্রথা প্রায় অবিচল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রথা অনুসারে চার্বাক বলতে আমরা একরকম আপসহীন বস্তুবাদী দর্শন বা তার প্রবক্তা বস্তুবাদী দার্শনিক বুঝতে বাধ্য। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে কেন বলছি এবং তার আগে এই দার্শনিক মতের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় কিনা—এসব কথা তোলবার আগে দার্শনিক পরিভাষা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা সেরে নেওয়া ভালো।

২ ॥ পরিভাষা প্রসঙ্গে : বস্তুবাদ ও ভাববাদ

প্রচলিত অভিধান অনুসারে, ইংরেজী *materialism* বা মেটিরিয়ালিজম-এর প্রতিশব্দ জড়বাদ। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে জড়বাদ শব্দের প্রচলন নেই, অন্তত উল্লেখযোগ্য দার্শনিকদের রচনায় শব্দটি বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

তাহলে অভিধানকারদের বিচারে জড়বাদ শব্দ কেন?

ম্যাটার বা *matter* থেকে মেটিরিয়ালিজম। যে মতে ম্যাটারই পরম সত্য বা আদি-কারণ বা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মূল উপাদান তারই নাম মেটিরিয়ালিজম। অভিধানকারেরা ম্যাটার অর্থে জড়—অতএব মেটিরিয়ালিজম অর্থে জড়বাদ—শব্দ গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য 'সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র', 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' 'বেদান্তসার' প্রভৃতি তুলনায় পরবর্তীকালের রচনায় জড় শব্দ চোখে পড়ে। যা নিছক অচেতন বা ঐকান্তিক অর্থে চেতন-বিরুদ্ধ—তাই-ই জড়। পাথরের টুকরো বা মাটির ঢেলার মতো। অনেক সময়, জড় মানে স্থাণু, নিশ্চল, গতিহীন।

কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, আমাদের দার্শনিক সাহিত্যে ম্যাটার-এর প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ জড় নয় ; ভূত। যেমন চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত। মেটিরিয়ালিজম-এর প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ তাই ভূতচৈতন্য-বাদ অর্থাৎ যে-মতে ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। এই মতের সমর্থকেরা দাবি করেন : মাটি, জল, আগুন ও বাতাস বলে চার রকম

ভূতবস্তুই পারমার্থিক সত্য, যদিও অবশ্য অনেকে তার সঙ্গে আকাশ নামের পঞ্চম ভূত স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

এখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতকে সত্য বলে স্বীকার করাটুকুই মেটিরিয়ালিজম-এর পরিচায়ক নয়। অনেকের বিচারে পঞ্চভূত অবশ্যই বাস্তব ; তাছাড়াও আত্মা ও ঈশ্বর মানবার প্রয়োজন আছে। মেটিরিয়ালিজম-এর দাবি কিন্তু ভূতবস্তুই পরম সত্য, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। অতএব আত্মা প্রভৃতি কোনো স্বতন্ত্র পদার্থের কথা অবান্তর। ভূতচৈতন্য-বাদ আখ্যা থেকেই বোঝা যায় ; অন্তত ভারতীয় দর্শনে বিতর্কটা প্রধানতই চৈতন্যের উৎপত্তি নিয়ে। নিছক দেহকে পঞ্চভূতাত্মক বলে স্বীকার করেও অনেকে দেহ-অতিরিক্ত বা দেহ ছাড়াও আত্মার অস্তিত্ব মানেন। তার সবচেয়ে বড়ো নজির হলো ঃ চৈতন্য। চৈতন্য একান্তই আত্ম-ধর্ম, মত-বিশেষে আত্ম-স্বরূপ। চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত থেকেই তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। ভূত-চৈতন্যবাদীর দাবী চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত থেকেই চৈতন্যের ব্যাখ্যা সম্ভব ঃ অতএব আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছুর প্রসঙ্গ অবান্তর।

ভারতীয় দার্শনিকদের প্রথা অনুসরণ করে রাহুল সাংকৃত্যায়ন মেটিরিয়ালিজম অর্থে ভৌতিকবাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রচলিত বাংলা লেখায় শব্দটা স্বীকৃত হয়নি। তার একটা বড়ো কারণ বোধহয় এই যে, চলতি বাংলায় ভৌতিক শব্দের অর্থ একেবারে আলাদা। যেমন ঃ ভৌতিক রহস্য, ভৌতিক কাণ্ড, ভুতুড়ে ব্যাপার। অথচ, আজকালকার লেখায় জড়বাদ শব্দটিরও তেমন চল হয়নি। তার বদলে মেটিরিয়ালিজম অর্থে সাধারণত বস্তুবাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়। দার্শনিক বিচারে এই প্রতিশব্দ নিখুঁত কিনা—এ নিয়ে অবশ্যই তর্কের অবকাশ থাকে। কিন্তু আপাতত সে-বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সাধারণ পাঠক যদি বস্তুবাদ শব্দেই অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে সাধারণপাঠ্য বইতে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেবল মনে রাখতে হবে, এই প্রসঙ্গে বস্তু শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত—ইংরেজী ম্যাটার-এর প্রতিশব্দ।

বস্তুবাদের আধুনিক প্রবক্তাদের বিচারে, মেটিরিয়ালিজম-এর প্রধান প্রতিপক্ষ আইডিয়ালিজম বা *idealism*। তাঁরা দাবি করেন, সামগ্রিকভাবে দর্শনের ইতিহাসের মূল বিতর্ক বলতে 'মেটিরিয়ালিজম-বনাম-আইডিয়ালিজম'। আইডিয়ালিজম অনুসারে, চেতনা বা চৈতন্য-স্বরূপ পদার্থই প্রকৃত জগৎ কারণ বা পারমার্থিক সত্য। চলতি কথায়, এই চেতন-পদার্থের জন্য আত্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি রকমারি শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রবক্তারা চেতন-পদার্থকেই পারমার্থিক সত্য বলে গ্রহণ করলেও প্রচলিত অর্থে আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি মানেন না। তাঁদের মত বিজ্ঞানবাদ নামে খ্যাত, কেননা বিজ্ঞান শব্দের

পারিভাষিক অর্থ হলো চিত্ত, চৈতন্য ইত্যাদি। বিজ্ঞানবাদ অনুসারে 'শুধুমাত্র বিজ্ঞান'—সংস্কৃতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা—পারমার্থিক সত্য।

ভারতীয় দর্শনের প্রথা অনুসরণ করে রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন আইডিয়ালিজম-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বিজ্ঞানবাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা লেখায় সাধারণভাবে প্রতিশব্দটি স্বীকৃত হয়নি। তার কারণ, চলতি বাংলায় বিজ্ঞান শব্দের মানে একেবারে আলাদা। ইংরেজীতে যাকে বলে সায়েন্স, *science*। এই অর্থেই আমরা আজকাল পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা বলি।

আজকালকার বাংলা লেখায় আইডিয়ালিজম-এর প্রতিশব্দ হিসেবে যে কথাটির বহুল প্রচলন তা হলো ভাববাদ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, 'ভাব' শব্দেরও নানা অর্থ আছে। অনেক সময় অস্তিত্ববাচক অর্থে—অর্থাৎ 'অভাব' শব্দের বিপরীত অর্থে—ভাব শব্দ ব্যবহৃত। সাবেকী ভারতীয় দর্শনে এই অর্থে ভাব-পদার্থ ও অভাব-পদার্থ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। অবশ্য চিত্ত, চিত্ত-বৃত্তি, চিন্তা, ভাবনা প্রভৃতি অর্থেও ভাব শব্দের প্রচলন আছে। অতএব, আজকালকার প্রথা অনুসারে আইডিয়ালিজম অর্থে ভাববাদ শব্দ ব্যবহারে বাধা নেই। কেবল মনে রাখা দরকার, এই প্রসঙ্গে ভাব শব্দ চেতনা-বাচক। অর্থাৎ ভাববাদের মূল কথা হলো, কোনো-না-কোনো অর্থে চেতন-পদার্থই বা মানস-ব্যাপারই পারমার্থিক সত্য ; অতএব পরিদৃশ্যমান পদার্থরাশি বা বস্তুজগৎ অপ্রধান বা চৈতন্য-নির্ভর ; তার অন্তত কোনো স্বাধীন বা নিজস্ব সত্তা মানা যায় না।

৩॥ চার্বাক ও চরম বস্তুবাদ

তাহলে, আজকালকার প্রথা অনুসরণ করে মেটিরিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজম অর্থে আমরা বস্তুবাদ ও ভাববাদ শব্দ ব্যবহার করবো।

এই কথা মনে রেখে চার্বাকের আলোচনায় ফেরা যাক।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে চার্বাক প্রসঙ্গে অবশ্যই অনেক অনিশ্চয়তা আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে আমাদের দার্শনিক সাহিত্যে একটি প্রথা প্রায় অবিচল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রথা অনুসারে, চার্বাক বলতে আমরা একরকম আপসহীন বা প্রখর বস্তুবাদী দর্শন—বা তারই প্রবক্তাদের—বুঝতে বাধ্য। অষ্টম শতক থেকে বলছি, কেননা তার আগেকার কোনো উল্লেখযোগ্য দার্শনিক গ্রন্থে চার্বাক শব্দ আমার চোখে পড়েনি, একান্তই কোথাও আছে কিনা সুধীজনেরা তা অনুসন্ধান করবেন। অবশ্য মহাভারতে চার্বাক নামে এক রাক্ষসের

কথা আছে। কিন্তু মহাভারতের চার্বাক-কাহিনী আলাদা করে আলোচনা করবো। আপাতত দুটি কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই।

এক ঃ বস্তুবাদী দর্শনটিকে চার্বাক আখ্যা দেবার প্রথা আনুমানিক অষ্টম শতক থেকে গড়ে উঠলেও দার্শনিক মতটির পরিচয় ও প্রচলন ঢের পুরোনো। আগেকার কালে অন্য নামে প্রসিদ্ধি ছিলো। প্রসিদ্ধিটি কেন পালটালো, তাও নিশ্চয়ই ভাববার কথা।

দুই ঃ প্রায় অষ্টম শতক থেকে চার্বাক বলতে যাঁরা প্রখর বস্তুবাদ বুঝতে অভ্যস্ত, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা সত্যিই দিক্‌পাল-বিশেষ। তাই আধুনিক বিদ্বান্‌দের পক্ষে তাঁদের মন্তব্য উড়িয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা না-হোক অন্তত অতি-বড়ো দুঃসাহসের পরিচায়ক হবে।

কথাটা বিশেষ করে বলে রাখার একটা কারণ আছে। সম্প্রতিকালে 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' নামে একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদকেরা অবশ্যই স্বীকার করেছেন, গ্রন্থটিতে চার্বাক নামে প্রসিদ্ধ বস্তুবাদী দর্শনের সমর্থন নেই। তবুও নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে তাঁরা অনুমান করতে চেয়েছেন যে গ্রন্থটির লেখক হয়তো চার্বাকদেরই কোনো-এক অধুনা-অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত উপসম্প্রদায়ের প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তী বিদ্বান্‌দের মধ্যে অনেকেই দেখাতে চেয়েছেন, এ-হেন উপসম্প্রদায়ের কথা বস্তুতপক্ষে কাল্পনিক, পক্ষান্তরে গ্রন্থকারের প্রকৃত প্রবণতা চরম ভাববাদের বা অন্তত সংশয়বাদের প্রতিই। তবুও এ. এল. ব্যাশম (A. L. Basham) একথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে—এবং মনে হয় বইটি না-পড়েই—সরাসরি ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে বস্তুবাদের সমর্থনে রচিত অধুনালভ্য একমাত্র গ্রন্থ বলতে এই 'তত্ত্বোপপ্লবহিসিংহ'। এ-হেন কথা ঘোষণা করতে গেলে কমলশীল, জয়ন্তভট্ট, গুণরত্ন, মাধবাচার্য প্রভৃতি অনেকের মন্তব্যই অগ্রাহ্য করতে হয়। কেননা এঁরা সকলেই চার্বাক বলতে চরম বস্তুবাদ বুঝেছিলেন, অথচ 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র শুরুতেই বস্তুবাদের অসারতা উল্লিখিত। অথচ, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এঁদের স্থান এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এঁরা সকলে একবাক্যে যে-কথা বলেছেন তা বাতিল করলে ভারতীয় দর্শনের আলোচনাই অচল হবার আশঙ্কা।

'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ'-র আলোচনা পরে স্বতন্ত্রভাবে করাই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থটি সহজপাঠ্য নয়। গ্রন্থকারের প্রকৃত দার্শনিক জ্ঞাতিত্ব নিরূপণও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এখানে অন্যান্য যে দার্শনিকদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের কিছুটা পরিচয় প্রাসঙ্গিক হবে।

ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে কমলশীল ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর গুরুর নাম শান্তরক্ষিত। অনেকের মতে শান্তরক্ষিতের জন্ম সেকালের বৃহৎবঙ্গে। আনুমানিক অষ্টম শতকে

শান্তরক্ষিতকে অনুসরণ করে কমলশীলও তিব্বতে যান এবং তিব্বতেই উভয়ের মৃত্যু হয়। স্বীয় দার্শনিক মতের সমর্থনে শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় প্রথা অনুসারে পরমত খণ্ডন না-করে স্বীয় মত স্থাপিত হয় না। অতএব শান্তরক্ষিত সেকালে প্রচলিত প্রধান দার্শনিক মত খণ্ডন করেন। শান্তরক্ষিতের গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কমলশীল একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন ; এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কমলশীলের 'পঞ্জিকা' নামে খ্যাত। ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' এবং কমল শীলের 'পঞ্জিকা' আধুনিক বিদ্বান্‌দের পক্ষে অপরিহার্য ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ ভারতে যে-সব দার্শনিক মতের প্রসিদ্ধি ছিলো সেগুলি সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যের জন্যে আমরা অনেকাংশেই এই দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে বাধ্য।

প্রসিদ্ধ মতগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই চরম বস্তুবাদ। এবং কমলশীলের 'পঞ্জিকা'য় এই বস্তুবাদ সুস্পষ্টভাবেই চার্বাক নামে উল্লিখিত। শুধু তাই নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি চার্বাকমতের প্রবক্তা হিসাবে পুরন্দর নামে জনৈক দার্শনিকের নামও উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থান্তরেও পুরন্দর 'চার্বাক-মতে গ্রন্থকর্তা' হিসেবে উল্লিখিত। পুরন্দর নামে এই দার্শনিকটি কমলশীলের কিছুটা পূর্ববর্তী বলেই সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তাঁর কালনির্ণয় করতে চেয়েছেন।

কমলশীলের কথা থেকে শুরু করেছি, কেননা তাঁর আগেকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো দার্শনিকের রচনায় প্রখর বস্তুবাদ অর্থে চার্বাক শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ চোখে পড়ে না। এমনকি তাঁর গুরু শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ'-তেও নয়। কিন্তু কেন? প্রশ্নটা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। উত্তরের সন্ধান করার আগে অন্যান্য যে-কজন দার্শনিকের নাম বলেছি তাঁদের পরিচয় সংক্ষেপে দেখা যাক।

জয়ন্তভট্ট ছিলেন ন্যায় (বা ন্যায়-বৈশেষিক) সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত প্রতিনিধি। খ্রীস্টীয় নবম শতক নাগাদ, কাশ্মীরের কোনো এক কারাগারে বসে তিনি রচনা করেন 'ন্যায়মঞ্জরী'। জয়ন্তর কেন কয়েদ হয়েছিলো তা সুনিশ্চিতভাবে জানা নেই। কিংবদন্তী আছে, যুদ্ধের খরচ জোটাবার জন্যে কাশ্মীররাজ মন্দিরের বিগ্রহ গলিয়ে সোনারূপো সংগ্রহের প্রস্তাব করলে জয়ন্ত বাধা দেন ; তাই কয়েদ হয়। এজাতীয় কিংবদন্তীর মূলে যাই থাকুক না কেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জয়ন্তর পাণ্ডিত্য যেমন প্রগাঢ়, যুক্তি ও বিচার যেমন প্রখর তেমনি আশ্চর্য তাঁর লেখার কায়দা বা রচনা-কৌশল। এই রচনা-কৌশলের বন্যায় তিনি যেন বিপক্ষমতকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যান। বিপক্ষমত বলতে চরম বস্তুবাদও এবং জয়ন্ত তার জন্যে সুস্পষ্টভাবেই চার্বাক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং তার সঙ্গে রকমারি বিশেষণ যোগ করে মতটি নিয়ে হাসি-তামাসাও করেছেন। কোথাও তিনি চার্বাক-কে 'বরাক' বলে

উল্লেখ করেছেন। বরাক মানে চলতি কথায় আমরা যাকে বলি হাবাগোবা। কোথাও আবার চার্বাক-কে 'ধূর্ত' বলে বর্ণনা করেছেন ; চলতি কথায় আমরা যেমন তুখোড় প্রতারকদের কথা বলে থাকে। কোথাও আবার ঠাট্টা করে বিপক্ষ দার্শনিকের বর্ণনায় 'সুশিক্ষিততর' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন এবং অনেকেই মনে করেন যে এখানে বিপক্ষ বলতে চার্বাকই।

শুধু চার্বাক প্রসঙ্গেই নয় ; অন্যান্য বিপক্ষমতের প্রতিনিধিদের বেলাতেও জয়ন্তর রচনায় এজাতীয় নানা বিদ্রূপ, নানা বিশেষণ। অন্যান্যদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু চার্বাক প্রসঙ্গে তাঁর এজাতীয় বিবিধ বিদ্রূপাত্মক বিশেষণে বিভ্রান্ত হয়ে আধুনিক বিদ্বান্‌দের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র জয়ন্তভট্টর রচনার নজির থেকেই অনুমান করতে চেয়েছেন, ঐতিহাসিকভাবে চার্বাকদের মধ্যেও দুরকম সম্প্রদায় ছিলো। একটির নাম ধূর্ত চার্বাক, অপরটির নাম সুশিক্ষিত চার্বাক।

এজাতীয় মত আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও স্বীকৃতি লাভ করেছে বলেই পরে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে হবে। আপাতত মন্তব্য শুধু এই যে জয়ন্তভট্ট চার্বাক প্রসঙ্গে এক জায়গায় 'ধূর্ত' এবং আর এক জায়গায় 'সুশিক্ষিততরাঃ' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন বলেই যদি দুটি স্বতন্ত্র চার্বাক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হয়, তাহলে 'বরাক' চার্বাক নামের অপর একটি বা তৃতীয় সম্প্রদায়ের কল্পনায় বাধা কী? কেননা, একই গ্রন্থে একই লেখক বলেছেন, 'চার্বাকাস্তু বরাকাঃ'। যাই হোক, জয়ন্ত ঠাট্টা করে চার্বাকদের প্রসঙ্গে বরাক বা ধূর্ত বা সুশিক্ষিততর প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করলেও এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর লেখায় চার্বাক শব্দ চরম বস্তুবাদেরই নিদর্শক।

গুণরত্নর রচনাতেও তাই-ই। গুণরত্ন ছিলেন আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত দার্শনিক। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে জৈন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইএর নাম 'তর্করহস্যদীপিকা'। আসলে এটি একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে হরিভদ্র 'ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়' বলে একটি বই লেখেন ; তারই ব্যাখ্যায় গুণরত্ন রচনা করেন 'তর্করহস্যদীপিকা'। হরিভদ্রর গ্রন্থের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, সেকালের ছটি প্রখ্যাত দার্শনিক মতের বিচারমূলক পর্যালোচনাই তার বিষয়বস্তু। উদ্দেশ্য অবশ্য এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে জৈন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ। 'তর্করহস্যদীপিকা'-তেও গুণরত্ন একই কথা আরো বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ অন্যান্য মত বিশদভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন জৈনদের মতটিই সবচেয়ে সেরা। এই অন্যান্য মতের মধ্যে চরম বস্তুবাদও। অর্থাৎ জৈন মতের সমর্থনে গুণরত্নও চরম বস্তুবাদের বিস্তৃত বিচারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এবং তাঁর রচনায় এই বস্তুবাদ চার্বাক নামেই অভিহিত।

বিভিন্ন দার্শনিক মতের পর্যালোচনা হিসেবে অবশ্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাধবাচার্যর 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'। চতুর্দশ শতকে তিনি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি ছাড়াও দর্শনে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। প্রকৃতপক্ষে, রাজনীতি ও দর্শন—উভয় বিষয়ে অমন প্রগাঢ় অনুরাগের সমন্বয় ইতিহাসে দুর্লভ। রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠের মোহান্ত হন। প্রচলিত মতে, আরো কয়েকটি মঠের মতো এই মঠটি স্বয়ং শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত বলেই সুবিদিত। শঙ্করাচার্য-সমর্থিত দার্শনিক মতটির নাম অদ্বৈত বেদান্ত। মাধবাচার্য এই মতেরই প্রবল সমর্থক। অদ্বৈত বেদান্তই যে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত—সেই কথাটি প্রতিপন্ন করার উৎসাহেই তিনি 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' রচনা করেন। পরিকল্পনাটা এই যে, সেকালে প্রচলিত আরো পনেরো রকম দার্শনিক মত বিচারমূলকভাবে খণ্ডন করে অদ্বৈত বেদান্তর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম যে-মতটি খণ্ডন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন তা প্রখর বস্তুবাদই। এবং মাধবাচার্য চার্বাক নামেই তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম তাই 'চার্বাকদর্শন'।

তাহলে আনুমানিক অষ্টম শতকের কমলশীল থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতকের মাধবাচার্য পর্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রসিদ্ধ দার্শনিক চার্বাক বলতে এক প্রখর বস্তুবাদী দর্শনই বুঝেছিলেন এবং স্বমতসমর্থনে এই মতটি খণ্ডন করার তাগিদ বোধ করেছিলেন।

আসলে চার্বাক বলতে যে আমরা এক প্রখর বস্তুবাদী দর্শন বুঝতে বাধ্য—এই কথা পরবর্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যে এমনই প্রসিদ্ধ যে তা প্রায় সহজ-বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। এমন কি, দার্শনিক সাহিত্যের বাঁধ পেরিয়ে প্রথাটির প্রভাব নাট্যসাহিত্যেও উপচে পড়ে। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণমিশ্র 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে একটি রূপক নাটক রচনা করেন। তার একটি চরিত্র বস্তুবাদ। চরিত্রটির নাম চার্বাক। প্রসঙ্গত, আনুমানিক একাদশ শতকেই রামানুজ 'ব্রহ্মসূত্র'-র ভাষ্য রচনা করেন। ভাষ্যে বস্তুবাদী দর্শন চার্বাক নামেই অভিহিত।

৪ ৷৷ চার্বাক ও লোকায়ত

কিন্তু প্রথাটি অমন প্রসিদ্ধ হলে তার সমর্থনে এতো রকম নজির দেখাবার আয়োজন কেন? কারণ আছে এবং কারণটা খতিয়ে দেখাও দরকার।

আসলে, ভারতীয় চিন্তা-ইতিহাস বস্তুবাদী দর্শনটির পরিচয় খুবই প্রাচীন। এতো প্রাচীন যে দর্শনটির আদিপর্ব খুঁজতে গেলে বুদ্ধ-পূর্ব কোনো যুগ পর্যন্ত—হয়তো খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত—পিছু হটতে হয়। এই বস্তুবাদী দর্শনের চার্বাক নামকরণটা

কিন্তু তুলনায় অর্বাচীন—আনুমানিক খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক থেকে নামটি খুব চালু হয়েছিলো। তারই কিছু নিদর্শন হিসেবে কমলশীল থেকে মাধবাচার্য পর্যন্ত কয়েকজন প্রখ্যাত দার্শনিকের কথা উল্লেখ করেছি।

অথচ এঁদের আগেও দর্শনটি নিয়ে বিপক্ষের যথেষ্ট মাথাব্যথা ছিলো। কিন্তু তাঁরা নামান্তরে এটির উল্লেখ করতেন। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম লোকায়ত। এবার তারই কিছুটা পরিচয় দেখা যাক।

বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের কথা থেকে শুরু করেছি। তাঁর 'পঞ্জিকা' শান্তরক্ষিত-রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ'-র ব্যাখ্যা। স্বমত-সমর্থনে শান্তরক্ষিতের পক্ষেও চরম বস্তুবাদ খণ্ডনের প্রয়োজন ছিলো এবং তিনি তার আয়োজনও করেছিলেন। 'তত্ত্বসংগ্রহ'-র পাঠকেরা জানেন, সে আয়োজন যথেষ্ট বিস্তৃত। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা আছে। তাঁর রচনায় বস্তুবাদী দর্শনটির নাম 'চার্বাক' নয় ; তার বদলে শান্তরক্ষিত ব্যবহার করেছেন 'লোকায়ত' শব্দ।

মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর কথা উল্লেখ করেছি। চরম বস্তুবাদী মতটির জন্য তিনি একাধিকবার চার্বাক শব্দই ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' অবশ্যই প্রচলিত অর্থে ভাষ্যগ্রন্থ নয়। কিন্তু স্বীয় মতের আকর-গ্রন্থ হিসেবে তিনি প্রায়ই 'ন্যায়সূত্র' এবং তারই ব্যাখ্যায় রচিত বাৎস্যায়নের ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন। 'ন্যায়সূত্র' এবং 'বাৎস্যায়ন-ভাষ্য'তেও চরম বস্তুবাদ খণ্ডনের নানা যুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু 'চার্বাক' শব্দ চোখে পড়ে না। অবশ্য 'লোকায়ত' নামও নয়। তার বদলে মতটির সারাংশ হিসাবে প্রধানতই 'ভূতচৈতন্যবাদ' শব্দই ব্যবহৃত—অর্থাৎ যে-মতে ভূত পদার্থ বা ম্যাটার (*matter*) থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। ন্যায়দর্শনের আকর-গ্রন্থে 'লোকায়ত' শব্দের অভাব অবশ্য কিছুটা আশ্চর্য মনে হয়, কেননা 'ন্যায়সূত্র' রচনার অনেককাল আগে থাকতেই ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে 'লোকায়ত' শব্দর বহুল প্রচলন অবিসংবাদিত।

কিন্তু আপাতত আমাদের আলোচনা চার্বাক শব্দ নিয়ে। এবং দ্রষ্টব্য এই যে খ্রীস্টীয় নবম শতকের মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টর কাছে চরম বস্তুবাদী দর্শনটির নাম হিসেবে চার্বাক শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক হলেও ন্যায়-দর্শনের আকর-গ্রন্থে নামটি একান্তই অবিদিত।

জৈন দার্শনিক গুণরত্নর কথা বলেছি। কিন্তু তাঁর 'তর্করহস্যদীপিকা' হরিভদ্র রচিত 'ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়'-এর ব্যাখ্যা। হরিভদ্রও স্বীয় গ্রন্থে বস্তুবাদী দর্শনটি খণ্ডন করার সাধ্যমত প্রয়াস করেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে মতটির নাম চার্বাক নয় ; 'লোকায়ত'। অর্থাৎ, হরিভদ্রর লোকায়ত-খণ্ডনই ভাষ্যকার গুণরত্নর রচনায় চার্বাক-খণ্ডন নামে পুনরুল্লিখিত।

পরিশেষে মাধবাচার্যর কথা উল্লেখ করেছি। শঙ্করাচার্যর পরম অনুগামী এই দার্শনিকটি গ্রন্থারম্ভেই চার্বাকদর্শন নাম দিয়েই চরম বস্তুবাদ বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। শঙ্করাচার্যর স্বীয় গ্রন্থে একই বস্তুবাদ খণ্ডনের চেষ্টা চোখে পড়ে। কিন্তু চার্বাক নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কোনো প্রমাণ নেই ; অন্তত তাঁর প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ 'বেদান্তভাষ্য'র কোথাও চার্বাক শব্দ চোখে পড়ে না। বস্তুবাদী মতটিকে শঙ্করাচার্য একাধিকবার 'লোকায়ত' নামেই উল্লেখ করেছেন।

৫ ॥ বস্তুবাদী দর্শন ও ইতর জনগণ

তাহলে, এই চরম বস্তুবাদী দর্শনটির নামকরণ নিয়ে একরকম প্রথা-পরিবর্তন চোখে পড়ে। এককালে নাম ছিলো লোকায়ত—মনে হয়, সুদীর্ঘকাল ধরে এই নামেই দর্শনটির প্রধান পরিচয় ছিলো। কিন্তু আনুমানিক অষ্টম বা নবম শতক থেকে নাম হলো চার্বাক। তার পর ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে এই চার্বাক নামই প্রায় স্থায়ী হয়ে গেলো।

এইভাবে নাম বদলের পিছনে অবশ্যই কোন পর্যাপ্ত কারণ থাকবার কথা। ঐতিহাসিক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কারণ সম্বন্ধে হয়তো কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবুও তা খোঁজ করা দরকার। কিন্তু সে আলোচনা তোলবার আগে আর একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সাবেকী দার্শনিকেরা সত্যিই কি স্বীকার করেছেন, 'চার্বাক' ও 'লোকায়ত' একই দার্শনিক মতের দুটো পাল্টা নাম?

এই ব্যাপারে যাতে কোনো অনিশ্চয়তার অবকাশ না থাকে সে-বিষয়ে অন্তত মাধবাচার্য তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের মনে রাখতে বলেছেন, ওই চার্বাকদর্শনেরই অপর এক এবং বেশ জুৎসই নাম হলো লোকায়ত ঃ 'তস্য চার্বাকমতস্য লোকায়তম্ ইতি অন্বর্থম্ অপরং নামধেয়ম্'।

এখানে 'অন্বর্থম্' কথাটার বাংলা করেছি জুৎসই। কেননা মাধবাচার্যর মন্তব্য এই যে লোকায়ত শব্দটিকে ভেঙে দেখলে বোঝা যাবে চার্বাক মতের এই রকম নামান্তর হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু জুৎসই কেন?

আসলে, চার্বাক মতেরই নামান্তর যে লোকায়ত—এই কথাটি মনে করিয়ে দেবার সময় মাধবাচার্য মতটির বিরুদ্ধে বেশ কিছুটা খোঁচা দেবার বা মতটিকে পাঠকদের কাছে খেলো প্রতিপন্ন করবার একটা কায়দাও করে নিয়েছেন। খোঁচাটা ঠিক কী রকম?

প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে একরকম দার্শনিক ছড়া চালু ছিলো। কার রচনা তা জানা নেই। বিদগ্ধ কোনো গ্রন্থের অংশও নয়। তবুও লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। একে বলে লোকগাথা। লোকগাথার পিছনে দীর্ঘকালের রেশ থাকলে অনেক সময় বলা হয় প্রামাণিক লোকগাথা।

চার্বাকদের নামে চালু বেশ কিছু প্রামাণিক লোকগাথার প্রসিদ্ধি আছে। এ-হেন একটি লোকগাথা হলো,

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচর।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥

অর্থাৎ, সোজা কথায়, যতোদিন বেঁচে আছো ততোদিন সুখভোগ করে নাও। মরণ থেকে কারুরই রেহাই নেই। লাশটা পোড়াবার পর আবার ফেরবার কায়দা কী হতে পারে?

মাধবাচার্য এই লোকগাথাটি উদ্ধৃত করেছেন। এবং মন্তব্য করেছেন, ইতর জনগণের কাছে এই তো হলো মনের মতো কথা। ফলে পুরুষার্থ বলতে তাদের কাছে শুধু অর্থ আর কাম। স্বভাবতই তারা পরকাল-পরলোক সব কিছু অগ্রাহ্য করে চার্বাকমতই অনুসরণ করে। এই কারণেই চার্বাকমতের আর এক 'জুৎসই' নাম হলো লোকায়ত—অর্থাৎ ইতর জনসাধারণের মতামত যে-মতে সাধারণ লোকের স্বাভাবিক রুচি।

মন্তব্যটা অবশ্যই একরকম গালি-গালাজ। তবুও এর থেকে কয়েকটা কথা অনুমান না-করে উপায় নেই।

এক : চার্বাক এবং লোকায়ত—একই মতের বিকল্প নামমাত্র। সোজা কথায়, চার্বাক-ও যা, লোকায়তও তাই।

দুই : দর্শনটি ঐকান্তিক অর্থেই ইহলোক-সর্বস্ব। এই মতে পরকাল-পরলোক প্রভৃতির কোনো স্থান নেই। মাধবাচার্য এবং অন্যান্য দার্শনিকেরাও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত দিয়ে গড়া এই পৃথিবীই একমাত্র সত্য। সোজা কথায়, চরম বস্তুবাদী দর্শন।

তিন : জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এর জুৎসই নাম লোকায়ত। চার্বাক-এরই নামান্তর যে লোকায়ত একদা শুধু মাধবাচার্যই মনে করিয়ে দেন নি। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের জৈন দার্শনিক গুণরত্নও বলেছেন, "তৎ-নামানি চার্বাক লোকায়ত ইতি-আদীনি"—তার নাম চার্বাক, লোকায়ত ইত্যাদি। এবং মাধবাচার্যর মতোই লোকায়ত নামের ব্যাখ্যায় গুণরত্নও বেশ কিছুটা ঠেস দিয়ে বলেছেন, "লোকা

নির্বিচারাঃ সামান্যা লোকাঃ তৎবদ্ আচরন্তি স্ম ইতি লোকায়াতা লোকায়তিকা ইতি অপি।"—অর্থাৎ, সহজ কথায়, বিচার-বিহীন সাধারণ মানুষ এই মত অনুসারে আচরণ করে বলেই লোকায়ত বা লোকায়তিক শব্দের ব্যবহার।

ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে দর্শনটির বিরুদ্ধে গাল-মন্দর অবশ্যই অন্ত নেই। তাই মাধবাচার্য এবং গুণরত্নর লেখায় চার্বাকমতের বিরুদ্ধে ওই খোঁচা দেবার আয়োজনটুকু তাঁদের বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু উপরের কথাগুলি থেকে ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের এক চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতি অনুমান করতে প্রলোভন হয়।

আমাদের দেশে বস্তুবাদী দর্শন এবং জনসাধারণের দর্শন বোঝার বা বোঝাবার জন্যে দুটি স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হয়নি। দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে একই শব্দ। লোকায়ত। লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শন। লোকায়ত মানে জনগণের দর্শনও।

'লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ'। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই নাম লোকায়ত। ব্যাখ্যা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, 'লোকায়ত মত লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ওই নাম পাইয়াছে।' সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো : 'জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়'। এই প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'-এর নজির দেখিয়েছেন ; গ্রন্থটিতে লোকায়ত শব্দ এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত।

দেশের আত্মবাদী বা অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে অবশ্যই দর্শনটিকে ভালো চোখে দেখবার কথা নয়। এ-হেন দর্শনের প্রতি সহজাতভাবে আকৃষ্ট জনসাধারণকেও নয়। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'ইতর জনগণ বা প্রাকৃতজন এবং লোকায়তিকেরা চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকেই আত্মা বলে মনে করে'। অর্থাৎ, তাঁদের মতে দেহ ছাড়া (বা দেহাতিরিক্ত) আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু মানবার দরকার নেই এবং আত্মায় আস্থাবানেরা যেহেতু চৈতন্য নামের লক্ষণটিকে দেহাতিরিক্ত আত্মার অমোঘ প্রমাণ বলে ঘোষণা করে থাকেন, সেইহেতু লোকায়তিকেরা বলেন এই চৈতন্য আসলে দেহেরই গুণ বা দেহেরই ধর্ম—দেহধর্ম।

বিশেষত এই কারণে ভারতীয় দর্শনে মতটির বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কের যেন অবধি নেই। কিন্তু অজস্র নজির দেখিয়েও লোকায়তিকদের এই সহজ দাবিটি সত্যিই খণ্ডন করা সম্ভব হয়েছে কিনা, তা নিয়ে আমাদের পক্ষে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে।

যে কথা হচ্ছিল তারই জের টেনে কয়েকটা মন্তব্যের প্রলোভন হয়। লোকায়ত বলতে শুধু ইতর জনগণের দর্শনই নয়। বস্তুবাদী দর্শনও। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের বিতর্কটা প্রধানতই আত্মা নিয়ে। দেহাতিরিক্ত আত্মা অস্বীকার করাটাই চরম বস্তুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুবাদীরা অবশ্য পরলোক-পরকালও অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তার প্রধান যুক্তি এই যে পরলোকগামী আত্মা বলেই যদি কিছু না-থাকে তাহলে পরলোকের কল্পনাও অবান্তর। এই অর্থেই বস্তুবাদ ইহলোক-সর্বস্ব দর্শন।

শঙ্করাচার্যর মন্তব্য অনুসারে আত্মার বর্জন থেকেই বোঝা যায় লোকায়ত শুধু জনসাধারণের দর্শন নয়, বস্তুবাদী দর্শনও। অন্যেরাও বারবার বলেছেন, লোকায়ত মানে চরম বস্তুবাদ। এই কারণে 'সেন্ট-পিটাসবার্গ অভিধানে' লোকায়ত-র সরাসরি অর্থ দেওয়া হয়েছে মেটিরিয়ালিজম বা বস্তুবাদ। মনিয়ার-উইলিয়ামস্-এর অভিধানে পুংলিঙ্গে শব্দটির অর্থ বস্তুবাদী দার্শনিক, ক্লীবলিঙ্গে নিরীশ্বর বস্তুবাদী দর্শন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন তর্করত্ন, রাধাকৃষ্ণণ, প্রমুখের রচনাতেও লোকায়ত মানে ইহলোক-সর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন। এই অর্থগ্রহণের পক্ষে তুচ্চি (Tucci) প্রাচীন রচনার নজিরও দেখাতে চেয়েছেন। প্রাচীন পালি-সাহিত্যের টীকাকার বুদ্ধঘোষ 'আয়ত' শব্দকে 'আয়তন' বা ভিত্তি অর্থে গ্রহণ করেছেন ; অতএব যে দর্শনের ভিত্তি বলতে লোক বা ইহলোক, তারই নাম লোকায়ত। জৈন দার্শনিকদের মধ্যে কথাটা আরো সরাসরি বলার আয়োজন চোখে পড়ে। 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'-এ হরিভদ্র বলছেন, 'এতাবানেব লোকোঽয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ'—যতোটুকু নিছক ইন্দ্রিয়-গোচর সেটুকুকেই বলে 'লোক'। ভাষ্যকার মণিভদ্র ব্যাখ্যা করেছেন, লোক অর্থে পদার্থসার্থ বা পদার্থসমূহ। স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে পদার্থ হিসাবে কোনো রকম অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক কিছুর স্থান নেই।

তাহলে দুটি কথা মানতে হবে। এক ঃ লোকায়ত মানে সাধারণ লোকের সহজাত বা স্বাভাবিক মত-প্রবণতা বা দর্শন। দুই ঃ লোকায়ত মানে ইহলোক-সর্বস্ব বস্তুবাদী দর্শন।

আধুনিক অগ্রণী বিদ্বান্‌দের রচনায় উভয় অর্থই স্বীকৃত। কিন্তু দুই অর্থের সমন্বয়ের প্রয়াস তুলনায় বিরল। বোধহয় রুচিকরও নয়। অন্তত বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তো নয়ই। আজকের দিনে জনগণকে নিছক 'ইতরজন' বা ছোটলোক বলে অবজ্ঞা করার সুযোগ ক্রমশই সীমিত হয়ে আসেছে। এবং বস্তুবাদী দর্শনেই তাদের আস্থা দিনের পর দিন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি তাদের এই আকর্ষণের কারণটাও অনেকের কাছেই অপ্রীতিকর। শুধু তাত্ত্বিক কৌতূহল নিবৃত্তির ব্যাপার নয়, সংগ্রামের অস্ত্রও। মতাদর্শগত সংগ্রাম। মান্ধাতার আমল থেকে নানারূপে সজ্জিত এবং নানা কৌশলে প্রচারিত ভাববাদী দর্শনের ঘোর কাটিয়ে ওঠবার আজ সচেতন আয়োজন। কেননা, আজকের জাগ্রত জনগণের কাছে ওই ভাববাদী

বা অধ্যাত্মবাদী দর্শনটিও শুধুমাত্র নির্মল তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিণাম নয়। যুগযুগান্তর ধরে এই দর্শনও মতাদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তা বিপক্ষের হাতে। জনগণের উপর যারা শুধু দাসত্বের দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেয়েছে তাদের হাতে। সোজা কথায়, আধ্যাত্মবাদী দর্শনের পিছনে লোকবঞ্চনার এক আয়োজনও থেকেছে।

৬ ॥ লোক ঠকানোর প্রতিরোধে

কথাগুলো বড়ো বেশি আধুনিক ও উগ্র বক্তৃতার মতো শোনালো? প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে এসব বক্তৃতা কেন?

কারণ আছে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মহলেও এ জাতীয় কথা উঠেছিলো। অবশ্যই আধুনিক অর্থে নয়, আধুনিক পরিভাষাতেও নয়। তবু উঠেছিলো। একথা অনুমান করার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে।

একটু আগেই দেখেছি, জৈন দার্শনিক হরিভদ্র বলেছেন, যেটুকু নিছক ইন্দ্রিয়গোচর শুধু সেইটুকুই হলো 'লোক' এবং এই 'লোক'ই যাদের কাছে একমাত্র সত্য তারাই লোকায়তিক। সোজা কথায় লোকায়ত মতে প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থই একমাত্র সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ-গোচর পদার্থকে সত্য বলে স্বীকার করার কারণ কী? ভাষ্যকার মণিভদ্র এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন। 'এবম্ অমী অপি ধর্মছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনপ্রবণাঃ যৎকিংচিৎ অনুমানাদিদার্ঢ্যম্ আদর্শ্য ব্যর্থং মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্য ভোগাভোগপ্রলোভনয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি, মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি।' অর্থাৎ, লোকায়তিকদের মতে প্রত্যক্ষ-পরায়ণতা ধর্মপ্রবঞ্চনার প্রতিষেধক, কেননা অনুমান, আগম (শাস্ত্র) প্রভৃতির নজির দেখিয়ে পরবঞ্চনপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তেরা সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অন্ধ মোহের সঞ্চার করে, এই কারণেই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ স্বীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়।

মণিভদ্রর এই ব্যাখ্যা যদি স্বীকার্য হয় তাহলে মানতে হবে সেকালের লোকায়তিকেরাও দার্শনিক মতকে একেবারে নির্ভেজাল তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিচায়ক বলে মেনে নেননি। দার্শনিক মতের সঙ্গে রাজনীতির এরকম যোগাযোগ তাঁদের চেতনারও অগোচর ছিলো না। মণিভদ্রর এই মন্তব্য কি আজকের দিনের বস্তুবাদীর রচনাতেও স্থান পেতে পারতো?

মণিভদ্রর মন্তব্যকে মনগড়া মনে করারও কারণ নেই। চার্বাক বা লোকায়তিকদের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ লোকগাথা আছে। 'সর্বদর্শন-

সংগ্রহ' গ্রন্থে মাধবাচার্য বেশ কয়েকটি এজাতীয় লোকগাথা উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলির মূল কথাও মোটের উপর একই। কিছু ধূর্ত মানুষ লোক-ঠকিয়ে উপার্জন করবার উদ্দেশ্যে রকমারি ধর্মকর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিধান দিয়ে থাকেন এবং এসব যে নেহাতই লোক-ঠকানে ব্যাপার প্রত্যক্ষপ্রামাণ থেকেই তা সহজে বোঝা যায়। লোকগাথাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং আধুনিক বস্তুবাদীর রচনাতেও অনায়াসেই এগুলির স্থান হতে পারে। অতএব এখানেও সেগুলির পুনরুদ্ধৃতি অবান্তর হবে না।

> ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
> নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥
> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
> বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা ॥
> পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
> স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥
> মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
> নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েৎ শিখাম্ ॥
> গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
> গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা ॥
> স্বর্গাস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ু স্তত্র দানতঃ।
> প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥
> যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥
> যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
> কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥

রাজা রামমোহন রায়

ভবতোষ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতপথিক'। যেরকম ভারতপথিক ছিলেন কবীর বা দাদূ সেরকম রামমোহনও ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তার পথ অবলম্বন করে সমসাময়িক দেশবাসীর দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আস্বাদ তখনকার দিনে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এবং অল্প সংখ্যক আরো কোনো কোনো শিক্ষার্থী পেতে আরম্ভ করেছে। এই নূতন আস্বাদের চমৎকারিতায় যারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছে ভারতীয় চিন্তাধারার সম্পদ আবার জোর দিয়ে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন ছিল। রামমোহন এই কাজের ভার নিয়েছিলেন নিজের অন্তরের আগ্রহে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সমাজসংস্কার ইত্যাদি নানা দিকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহন শুধু ভারতবর্ষের শাশ্বত পথের পথিকই ছিলেন না—যে পথে নিজে চলেছেন সে পথে অন্যকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে পথ ছিল না সেখানে নূতন পথ খুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতপথিক রামমোহন বহু বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক, অনেক নূতন বিষয়ে আমাদের পথিকৃৎ।

স্বাভাবিক কারণেই দার্শনিক রামমোহন, আত্মীয় সভা, ইউনিটারিয়ান সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ ও বেদান্ত কলেজের স্থাপয়িতা রামমোহন এবং সমাজসংস্কারক রামমোহনের দিকেই পরবর্তী কালের দৃষ্টি পড়েছে বেশি করে। স্কুলের ছাত্রও রামমোহনের নাম শুনলে ব্রাহ্মসমাজ ও সতীদাহ-নিবারণ-প্রচেষ্টার উল্লেখ করতে পারে। রামমোহনের রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধে চিন্তাধারার সঙ্গে শিক্ষিত জনসাধারণের পরিচয় কম। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের বৃত্তি ইত্যাদির জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদনের জন্য রামমোহন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তাও অনেকেই জানেন। কিন্তু দুবছর ইংলণ্ডে থাকার সময়ে ভারতবর্ষের—বিশেষত পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা অনেক সময় আমাদের বর্তমান যুগের আলোচনাতে অবহেলিত হয়।

অথচ, রামমোহনের রচনাবলী পড়লে এটা সহজেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার বিশ্লেষণে এই ভারতপথিক অবিসম্বাদিত পথিকৃত। তথ্য সন্ধান ও বিশ্লেষণের যে দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, সে দরজা দিয়ে তাঁর পরে বহুদিন

কেউ প্রবেশ করেন নি। উনিশ শতকের শেষ ভাগে যখন নওরোজী, রমেশ দত্ত ও রানাডের হাতে ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনা নূতন জীবন লাভ করল তখন দেখা গেল যে, রামমোহনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পঞ্চাশ বছর পরের চিন্তাধারার সাদৃশ্য অনেকখানি। দীর্ঘ ব্যবধানে চিন্তাধারার ইতিহাসে ধারাবাহিকতা অনায়াসেই ব্যাহত হতে পারত। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয় যে, রামমোহন থেকে দাদাভাই নওরোজীর বিবর্তন কোথাও বেশি অসঙ্গত মনে হয় না।

রামমোহনের আগে কোনো ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কিছু রচনা করেছিলেন বলে জানা নেই। প্রথম যুগের সংবাদপত্রে, বিশেষত 'সমাচারদর্পণে', অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকত। আর্থিক বিষয়ে বহু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকত বিশেষ প্রবন্ধ—'কৃষিকর্মের বৃদ্ধি', 'এতদ্দেশের বাণিজ্য', 'ক্রোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজ লোকের এদেশে চাষবাস বিষয়ক', 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'চরকাকাট্‌নির দরখাস্ত' ইত্যাদি নামাঙ্কিত প্রবন্ধের অনেকগুলিই রামমোহনের নিবন্ধগুলির আগেই প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনো সুসম্বদ্ধ তাত্ত্বিক বা বিশ্লেষণী আলোচনা ছিল না। পরবর্তী যুগে ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে যে কয়েকটি অর্থনীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, কিংবা তারও পরে 'সোমপ্রকাশ'-এর অসংখ্য আলোচনাতে যে সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, রামমোহনের যুগে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় রামমোহনের কোনো ভারতীয় পূর্বসূরী ছিলেন না, এবং তাঁর উত্তরসূরীরা আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর মৃত্যুর প্রায় চার দশক পরে। পথিক ও পথিকৃৎ রামমোহন তাঁর নিজের যুগে একাকিত্বে বিশিষ্ট।

অর্থনীতি বিষয়ে রামমোহনের যে রচনাগুলি আমরা পাই সেগুলি সবই ১৮৩১ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৮৩২-এর জুলাই মাস, এই এক বৎসর সময়ের মধ্যে লেখা। তখনকার নিয়ম অনুসারে প্রতি কুড়ি বৎসর পরে পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ নূতন করে পার্লামেণ্টে পাশ করিয়ে নিতে হত—যে আইন দিয়ে সনদ নূতন করা হত তার নাম ছিল 'চার্টার অ্যাক্ট'। ১৮৩৩ সালে নূতন চার্টার অ্যাক্ট পাশ করাবার আগে পার্লামেণ্ট থেকে একটি 'সিলেক্ট কমিটি' নিযুক্ত হয়—গত কুড়ি বছরের কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সনদে কি কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে অভিমত দেবার জন্য। রামমোহন তখন লণ্ডনে উপস্থিত এবং তিনি সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহন নিজে গিয়েছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে শ্রীমতী কলেট ও শ্রীমতী কার্পেণ্টার দুরকম মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অর্থনীতির গবেষকের সৌভাগ্যে রামমোহন কমিটির কাছে তাঁদের প্রেরিত দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর লিখিত উত্তর পাঠিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে

পাঠিয়েছিলেন কয়েকটি পরিশিষ্ট প্রবন্ধ। এই প্রশ্নোত্তর ও নিবন্ধগুলি থেকেই আজকালকার পাঠক রামমোহনের অর্থনীতিচিন্তার স্বরূপ পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

এই প্রশ্নোত্তর ও নিবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩২ সালেই। এর কোনো-কোনোটি পরে পত্রপত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়, যেমন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। ১৯৪৭-এ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশ করেন। আরো সাম্প্রতিক কালে, ১৯৬৫ সালে, কলকাতার 'সোশিয়ো-ইকনমিক-রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট' এইসব লেখা একত্র করে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সম্পাদনায় 'রামমোহন রায় অন ইণ্ডিয়ান ইকনমি' প্রকাশ করেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই সংগ্রহটির উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করা হয়েছে—এবং যেসব উদ্ধৃতি বাংলা অনুবাদে দেওয়া হয়েছে তার মূল ইংরেজী এই সংগ্রহেই পাওয়া যাবে। এগুলি ছাড়া দু-একটি অন্য লেখারও খবর পাওয়া যায়—যেমন ১৮২৮ সালে জমিদারদের 'লাখেরাজ' সম্পত্তিগুলিকে কোম্পানির দখলে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্রগুলি। রামমোহনের লেখার সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেট-রচিত রামমোহনের জীবনীগ্রন্থের পরিশিষ্টে। এই দীর্ঘ তালিকাতে অর্থনীতিসংক্রান্ত রচনার সংখ্যা খুব কম।

সিলেক্ট কমিটির কাছে যে প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য-সংবলিত পরিশিষ্ট পাঠানো হয়েছিল সেগুলি হল : ১. ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর, ১৯ অগস্ট ১৮৩১ ; ২. রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিশিষ্ট, ১৯ অগস্ট ১৮৩১ ; ৩. বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ; ৪. ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ; ৫. বিচার ও রাজস্ব সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮৩২ ; ৬. লবণের একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর, ১৯ মার্চ ১৮৩২ ; এবং ৭. ভারতে ইয়োরোপীয়দের বসবাস সম্বন্ধে নিবন্ধ, ১৪ জুলাই, ১৮৩২। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের মতে রামমোহন সিলেক্ট কমিটিতে মৌখিক সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনো মুদ্রিত বা লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নূতন চার্টার অ্যাক্ট আইনে পরিণত হয় ১৮৩৩-এর ২০ অগস্ট। এই নূতন আইনের অনেক ব্যবস্থাই রামমোহনের মনঃপূত হয় নি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য লিখে যাবার সময় তিনি পেলেন না। অল্পদিন পরেই, ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা রামমোহনের অর্থনৈতিক মতামতের মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও সমকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর জন্ম-বৎসর সম্বন্ধে মতভেদের মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি ১৭৭২ সালটিকেই গ্রহণ করি (১৭৭৪ হলে, সব হিসাব দু'বছর কম হবে), তা হলে দেখি যে, আমাদের দেশে

রাজস্বব্যবস্থা নিয়ে যখন নানা রকমের পরীক্ষা চলেছে, তখন রামমোহন কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হচ্ছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ফলাফল যখন দেখা যাচ্ছিল, রামমোহন তখন তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বৃদ্ধি করছেন। ১৭৭০ সালের (বাংলা সন ১১৭৬) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' অসংখ্য শিশুমৃত্যুর ফলে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে পূর্বভারতে পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে জমিদারদের দেয় রাজস্ব হিসাবে যে টাকা স্থায়ীভাবে স্থির করে দিলেন, সেটা তখনকার প্রজাদের দেয় মোট খাজনার প্রায় দশ ভাগের নয় ভাগ। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল যে, জমির জন্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা এবং নীট লাভ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেল যে, জমিদাররা প্রজা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, খাজনা আদায় হচ্ছে না, বাকি রাজস্বের দায় জমিদারি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ১৭৯৯ সালে 'সপ্তম' ('হফ্‌তম') আইন তৈরি করে জমিদারদের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হল, যাতে তাঁরা সহজে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারেন।

এই অবস্থাটা ছিল সাময়িক। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং তার ফলে চাষ-আবাদের প্রসারের ফলে জমিদাররা খাজনা বাড়াবার সুযোগ পেলেন। ১৮১২ সালে 'পঞ্চম' আইন পাশ করে জমিদারদের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হল এবং দশ বছর পরে, ১৮২২-এ, কোম্পানির সরকার রায়তদের সঙ্গত খাজনা স্থির করে দেবার অধিকার গ্রহণ করলেন। কিন্তু রায়তের উপরে চাপ বেড়ে চলল বছরের পর বছর।

রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূমিরাজস্ব বিভাগে কাজ করেন প্রায় দশ বছর। যতদূর জানা যায়, ডিগবি নামক একজন কালেক্টরের অধীনে তিনি কাজ আরম্ভ করেন হাজারিবাগ জেলার সদর রামগড়ে ১৮০৫ সালে—এবং পরে ডিগবির সঙ্গেই ভাগলপুর ও রংপুরে কাজ করেন ১৮১৫ পর্যন্ত। প্রথমে ছিলেন মুনসি, পরে সেরেস্তাদার এবং তারও পরে দেওয়ানের কাজে রংপুর জেলাতেই তার দীর্ঘতম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ডিগবির কাছে রামমোহন ইংরেজী শেখেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই বিদেশী ভাষাতে এবং ভাষার মাধ্যমে নানা বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। ১৮১৬ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত কলকাতা শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক হিসাবে সমাজসংস্কারে, শিক্ষা-প্রসারে, ভারতীয় দর্শন-চর্চায়, নূতন ধর্ম-সংস্থাপনে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য হয়ে উঠল। এ-সবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি-চর্চা তিনি কিভাবে করেছিলেন তার কোনো নিদর্শন নেই, কিন্তু দু-একটি অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

রাজা রামমোহন রায় যখন ডিগবির কাছে ইংরেজী শিখতেন তখন অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)-এর 'ওয়েল্‌থ্ অভ্ নেশন্‌স্' প্রায় ত্রিশ বছরের পুরানো বই,

কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের অবশ্যপাঠ্য। মলথস (১৭৬৬-১৮৩৪) এবং রিকার্ডো (১৭২২-১৮২৩) ছিলেন রামমোহনের সমসাময়িক। মলথসের জনসংখ্যা সম্বন্ধে বই প্রকাশিত হয় ১৭৯৮-তে এবং অর্থনীতির উপরে বইটি বেরোয় ১৮২০-তে; রিকার্ডোর প্রধান বই প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। এসব লেখার সঙ্গে রামমোহন পরিচিত ছিলেন কি না তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই—কারণ গবেষকের পাদটীকা-কণ্টকিত রচনা তাঁকে করতে হয়নি এবং তাই অন্য কোনো লেখার উল্লেখও করতে হয় নি। কিন্তু, করনীতি বা মূলধন সঞ্চয় সম্বন্ধে যে দু-একটি মন্তব্য তিনি করেছেন এবং ইংলণ্ডের শিল্পজ্ঞান ও মূলধনের অংশভাগী হয়ে উত্তর-আমেরিকার উন্নতি সম্বন্ধে যে কথাগুলি মাঝে মাঝে বলেছেন তাতে মনে হয় স্মিথ ও রিকার্ডোর লেখার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এটাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ এবং সামাজিক রীতি-নীতি-সম্ভূত জনসংখ্যা-বৃদ্ধি এবং মহামারী ইত্যাদি কারণে সংখ্যাহ্রাস সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তিনি করেছিলেন সেটা মলথসেরই প্রতিধ্বনি।

১৮১৩ সালে কোম্পানির সনদ নূতন করে মঞ্জুর করার আগে ইংলণ্ডে একটি তথ্যানুসন্ধানী কমিটি নিয়োগ করা হয়—এই কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে (১৮১২) ভারতের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছিল। এই রিপোর্ট রামমোহন নিশ্চয় সযত্নে পড়েছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহন যেসব মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে মনে হয় ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত কোলব্রুকের 'হাজব্যানড্রি ইন বেঙ্গল' বইটিও তিনি পড়েছিলেন। ইংলণ্ডে বাসকালে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২)-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়েছিল এবং সম্ভবত সাক্ষাৎ আলোচনাও হয়েছিল। বেন্থামের লেখা চিঠিতে জেমস্ মিল-এর (১৭৭৩-১৮৩৬) উল্লেখ আছে—মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তাঁর অর্থনীতি সম্বন্ধে বই রামমোহন পড়েছিলেন, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ও শিল্প-মালিকদের স্থায়ী বসবাস সম্বন্ধে রামমোহনের মতবাদে দ্বারকানাথ ঠাকুরের কিছু প্রভাব থাকতে পারে। এ বিষয়ে ১৮২৯-এ দ্বারকানাথ যা লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গে ১৮৩১-এর রামমোহনের নিবন্ধের সাদৃশ্য অনেকখানি।

যে অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে রামমোহনের মতবাদ গঠিত হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় দিক ভূমিরাজস্ব ও কৃষিব্যবস্থা-সম্পর্কিত। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১৮৩০ সালে ভারতের কুটিরশিল্প অবনতির পথে, কিন্তু আধুনিক শিল্প তখনো আরম্ভ হয় নি। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব ততদিনে প্রায় ষাট বছর ধরে চলেছে এবং বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে ইংলণ্ডের অগ্রগতি তখন চমকপ্রদ। ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদির আমদানি ইংরেজ সরকার তখন বন্ধ করেছেন উঁচু হারে শুল্ক বসিয়ে—অন্য দিকে ভারতের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় তখন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।

রেলপথ তখনো বহুদূরে—স্টীমার আসতেও কয়েক বছর দেরি। বহির্বাণিজ্য অবশ্য বাড়ছিল—বছরে পাঁচ বা ছয় কোটি টাকার রপ্তানি বা আমদানি তখনকার দিনের পক্ষে খুব কম ছিল না। আমদানি-রপ্তানির কাজে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়েরাও লিপ্ত হয়ে উঠলেন—কেউ বিদেশী বণিকের মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ন রূপে, কেউ বা সরাসরি। দেশের অভ্যন্তর থেকে বন্দর পর্যন্ত এবং বন্দর থেকে বিদেশে চালান পর্যন্ত জিনিসের চলাচল সহজ করবার জন্য প্রয়োজন হল ব্যাঙ্কের এবং এজেন্সি হাউসের। বিদেশী ব্যাঙ্কের ধরনে দেশি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হল, যেমন ১৮২৯এ প্রতিষ্ঠিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক'। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বেশি দিন চলে নি, কিন্তু ১৮০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' এখনো জীবিত আছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে—১৯২১-এ তিনটি 'প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক'কে যুক্ত করে ইম্পীরিয়্যাল ব্যাঙ্ক গঠিত হয় এবং ১৯৫৫-তে সেই ব্যাঙ্কেরই নূতন নামকরণ হয় 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'।

সহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতায়, যে নবজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠল তারা হল কোম্পানির সরকারের চাকুরিয়া, নূতন ধরনের ব্যবসায়ী এবং গ্রামের জমিদারির 'অনুপস্থিত' সহরবাসী মালিক। রামমোহন এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যেই পড়েছিলেন, অন্ততঃ ১৮১৬ সালের পর থেকে—যখন তিনি জমিদারি সম্পত্তি ক্রয় করে, রংপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতাতে বসবাস আরম্ভ করলেন। তাঁর লেখাতে আমদানি রপ্তানি, সরকারি ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উল্লেখ থাকলেও, প্রধানত তিনি ভূমি ও কৃষির সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, এই আলোচনাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কৃষকপ্রজার অনুকূলে, জমিদারের নানা প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জমিদারের দেয় রাজস্ব কমাবার প্রস্তাব তিনি অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সহানুভূতি কোন্ দিকে ছিল সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর প্রতিবেদনে রামমোহন তখনকার দিনের শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন, অনেক খুঁটিনাটি সহ। তাঁর দেওয়া হিসাব অনুসারে, কলকাতাতে তখন মিস্ত্রি-জাতীয় শ্রমিকের আয় ছিল মাসে দশ টাকা থেকে বারো টাকা, এবং সাধারণ শ্রমিকের সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা। অন্য সহরে এর চেয়ে কম, এবং গ্রামাঞ্চলে আরো অনেক কম। জিনিসপত্র অবশ্য সস্তা ছিল, কিন্তু রামমোহনের অভিজ্ঞতায় বঙ্গদেশের দরিদ্র শ্রেণী ভাত আর নুন ছাড়া আর কোনো আহার্য প্রায় পেতই না। একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের দিনে প্রায় আধসের থেকে তিন পোয়া চাল প্রয়োজন হোত। বাড়ি ছিল মাটি, খড় এবং নলখাগড়া দিয়ে তৈরি। পরিধেয় বস্ত্র ছিল নামমাত্র। শিক্ষা ধনীশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে নানা প্রকার সংস্কার থাকা সত্ত্বেও তারা সরল ও নীতিপরায়ণ ছিল।

এই বর্ণনার পটভূমিকায় রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তের দুর্গতির চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। জমিদারেরা তখন প্রজার খাজনা বাড়াতে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং কৃষকদের যে-সব অধিকার ১৭৯৩ সালের আগে সর্বত্র মেনে চলা হত সেগুলিও খর্ব করেছিলেন। যে-সব চাষী নিজের গ্রামের জমি চিরাচরিত ভাবে চাষ করত সেই-সব 'খুদকাশ্‌ত্‌' চাষীর অধিকার সংরক্ষণের আশা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু জমিদারেরা সে আশা সফল করেন নি। রায়ত খাজনা দিতে দেরি করলে কিভাবে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা হতো তার বর্ণনা রামমোহন দিয়েছিলেন। আর বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে জমিদারেরা চাষীর উৎপন্ন ফসলের দামের অর্ধেক নিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন, বাকি অর্ধেক থেকে চাষীকে বীজ ও কৃষির জন্য সব ব্যয় নির্বাহ করে জীবনযাত্রার সম্বল খুঁজতে হত। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য-নির্ধারণে চাষী সুবিচার পেত না। এই ব্যবস্থায় চাষীর পক্ষে জীবন ধারণই শক্ত ছিল, সঞ্চয়ের তো কথাই ওঠে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করবার সময়ে আশা করা হয়েছিল যে, প্রথমত, জমিদারেরা পতিত জমিতে কৃষি সম্প্রসারণ করে উৎপাদন বাড়াবেন এবং নিজেরাও লাভবান হবেন, দ্বিতীয়ত, যে-সব জমিতে চাষ হচ্ছিল, সেগুলিরও উন্নতি করা হবে ; তৃতীয়ত, জমিদারেরা রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হবেন ; এবং চতুর্থত, কোম্পানি সরকারের রাজস্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকবেন। রামমোহন দেখালেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য যদিও সফল হয়েছিল, প্রথম দুইটি উদ্দেশ্য চার দশকের মধ্যেই বিফল প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি আরও বললেন যে, কৃষির যেটুকু উন্নতি ও সম্প্রসারণ হয়েছিল তার কৃতিত্ব জমিদারের নয়, কিন্তু তার থেকে লাভটা পুরোপুরি ভাবেই জমিদারের ভোগে এসেছিল—কৃষক বা সরকার এই লাভের অংশ পান নি।

এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে রামমোহনের মত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মতে ভূমিব্যবস্থায় তিন পক্ষেরই অধিকার সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন—শান্তিরক্ষা ইত্যাদির বিনিময়ে রাজস্ব-প্রাপ্তিতে সরকারের অধিকার ; স্থিরীকৃত রাজস্ব দেবার বিনিময়ে জমিদারের খাজনা আদায়ের অধিকার ; এবং জমি চাষ করে উৎপন্ন আয়ের পর্যাপ্ত অংশ লাভে চাষীর অধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই তৃতীয় অধিকারটি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন তীব্র ভাষায় বলেছিলেন—'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, যে অধিকার জমিদারকে দেওয়া হয়েছিল, সে রকম অধিকার প্রজারা কেন পাবে না, তাদের দেয় খাজনা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হবে না কেন, কেনই বা সহৃদয় সরকার এখনো রায়তের খাজনা বর্তমানে প্রদত্ত পরিমাণ অনুসারে স্থির করে দেবেন না, কেন ভবিষ্যতে খাজনা-বৃদ্ধি শক্ত-হাতে নিষিদ্ধ করা হবে না।'

রামমোহন যা চেয়েছিলেন তা অবশ্য তখন করা হয় নি—এবং কখনোই করা হয় নি। খাজনা বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় রামমোহনের মৃত্যুর ছাবিবশ বছর পরে ১৮৫৯-এ—এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করা হয় তারও প্রায় ৩৬ বছর পরে। রায়তের খাজনা বৃদ্ধির হার কমানোর চেষ্টা অবশ্য অনেক হয়েছিল, কিন্তু জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো প্রজার সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবার প্রস্তাব পরে কেউ গ্রহণ করেন নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে গ্রন্থকারের নামহীন একটি বড় বই বেরোয় বঙ্গদেশের জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে। এই বইটিতে রামমোহনের প্রস্তাব সমর্থন করা হয়েছিল, কিন্তু এ-প্রস্তাব নিয়ে আর বেশি অগ্রসর কেউ হয় নি। এর একটা সংগত কারণ ছিল, যেটা রামমোহনের সময়ে ঠিক পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি। রায়তকে কোনো রকমের স্থায়ী স্বত্ব দিলে পরিণামে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে আইন অনুসারে যিনি রায়ত, তিনি আবার তাঁর নীচে অন্য রায়ত সৃষ্টি করেছেন এবং কখনো কখনো এই ভাবে ধাপে ধাপে বহু স্তরের প্রজার সৃষ্টি হয়েছে (উনিশ শতকের শেষে বাখরগঞ্জ জেলায় প্রায় পঞ্চাশ ধরনের রায়ত বা প্রজা ছিল)। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত জমি যে চাষ করে সেই সর্বনিম্নস্তরের চাষীকে রামমোহন-প্রস্তাবিত স্থায়ী খাজনার সুবিধা যদি দিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক স্তরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এর প্রশাসনিক জটিলতা যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। তাই পরবর্তী কালের ভূমিনীতি-নির্ধারকেরা প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে আরো অনেক ধাপের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যোগ না করে, কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থাটাকে তুলে দেওয়াই সহজ ও সংগত মনে করলেন। এতে রামমোহনের কৃতিত্ব কমে নি—যুক্তির দিক থেকে তাঁর বক্তব্যে কোনো ফাঁক নেই ; আর ১৮৩১ সালে বসে ভবিষ্যতের ভূমিব্যবস্থা কী রূপ নেবে তা বুঝতে না পারাও অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব তদানীন্তন অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে।

প্রজার দেয় খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে, জমিদারদের দেয় রাজস্বও অনেক ক্ষেত্রে কমানো উচিত, এবং পূর্বাঞ্চলের বাইরে যে-সব এলাকায় প্রজারা সরকারকে সরাসরি খাজনা দিত তাদের দেয় টাকাও কমানো সংগত ঃ জমিদারের উপরে রাজস্বের বোঝা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি ছিল তার প্রমাণ হিসাবে বর্ধমানের জমিদারির উল্লেখ করেছিলেন—১৮৩০ সালেও বর্ধমান-রাজের আদায়ী খাজনার পরিমাণ ছিল ৪৮ লক্ষ টাকার অনধিক এবং সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের নজির অবশ্য অন্যত্র প্রযোজ্য ছিল না—যখন এটা জানা ছিল যে, নানা কারণে কোম্পানির দেওয়ান এই জমিদারির রাজস্ব একটু বেশি করেই ধার্য করেছিলেন।

রায়তের দেয় খাজনা যদি আর না বাড়ানো হয় এবং জমিদারের দেয় রাজস্ব যদি কিছুটা কমানো হয়, তা হলে কোম্পানি-সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি পড়তে পারে, এ কথা রামমোহন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানির সনদ কুড়ি বছরের জন্য নূতন করে মঞ্জুর করা হল তখন কোম্পানির ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির প্রশাসনিক ('টেরিটোরিয়াল') আয়-ব্যয় ও ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক করতে বলা হয়েছিল। রামমোহন যখন সিলেক্ট কমিটির কাছে তাঁর বক্তব্য পাঠাচ্ছেন তখন কোম্পানি-সরকারের দেশ-শাসনের ব্যয় বছরে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা এবং তার মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই ভূমিরাজস্ব থেকে পাওয়া। ভূমি-রাজস্ব কমানো হলে মোট সরকারি আয়ে ঘাটতি পড়ত সরাসরি। রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে, সরকার আয় বাড়াতে পারবেন বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিসের উপর শুল্ক বসিয়ে এবং ব্যয় কমাতে পারবেন ইংরেজ কর্মচারীর জায়গায় ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করে। তখনকার দিনে শুল্ক বসানো হত সাধারণত লবণ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপরে—বেশি রাজস্বের আশায়। রামমোহনই সম্ভবত আমাদের দেশে প্রথম প্রস্তাব করলেন যে, বিলাসদ্রব্যের উপরে কর বসানো হোক। বিলাসদ্রব্যের ব্যবহারীর সংখ্যা কম, কিন্তু তাঁদের আয় অনেক এবং শুল্ক-জনিত মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাঁদের ব্যয় না কমাবারই সম্ভাবনা। আজকের দিনে অর্থনীতির ছাত্র লক্ষ্য করতে পারেন যে, ভারতবর্ষের সরকারি আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ আসে নানাপ্রকার উৎপাদন ও বিক্রয় শুল্ক থেকে। এ ক্ষেত্রে রামমোহন-প্রদর্শিত পথে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি।

রামমোহন অবশ্য বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সরকারি ব্যয় কমানোর উপরে। তাঁর মতে ব্যয় কমানোর সহজতম এবং একান্তভাবে প্রয়োজনীয় উপায় ইংরেজ কর্মচারীর বদলে যথাসম্ভব ভারতীয় নিয়োগ। একটি পরিসংখ্যান তালিকা তৈরি করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ১৮২৭ সালে উঁচু পদের প্রশাসনিক, সামরিক ও চিকিৎসা-বিভাগীয় ১৩০৬ জন ইংরেজ কর্মচারীর জন্য মোট খরচ হয়েছিল দুই কোটি টাকার একটু বেশী—অর্থাৎ, গড়পড়তা প্রতি কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ১৫,৫০০ টাকা। তখনকার দিনের মূল্যমানের তুলনায় একজন কালেক্টরের মাসিক এক হাজার থেকে পনের শত টাকা বেতন খুবই বেশি। পূর্বে উল্লিখিত শ্রমিকের মাসিক সাড়ে তিন টাকা বেতনের সঙ্গে তুলনা না করলেও বলা যায় যে, সমান স্তরের ভারতীয়দের থেকে ইংরেজ কর্মচারীর আয় অনেক বেশি ছিল এবং সমান স্তরের ইংরেজ কর্মচারীরাও তাঁদের স্বদেশে এর চেয়ে অনেক কম টাকা পেতেন।

কালেক্টররা যে কাজের জন্য বেতন পেতেন, রামমোহনের অভিজ্ঞতায় তার প্রায় সবটাই অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে করানো হত। তাঁর মতে মাসিক

তিন শো থেকে চার শো টাকা বেতনের সুযোগ্য ভারতীয় কর্মচারীদের হাতে এই-সব কাজের ভার দিলে কাজ ভালো হবে এবং ব্যয়ও শতকরা আশি ভাগ কমে যাবে। অবশ্য সামরিক বিভাগে বা উঁচু পদগুলিতে ইংরেজ নিয়োগ কমানো সম্ভব হত না, কিন্তু রামমোহন জোর দিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন যে, কালেক্টরের কাজ আর বিচারকের কাজ ভারতীয়দের হাতেই দেওয়া উচিত এবং কালেক্টরদের হাত থেকে বিচারের ক্ষমতা তুলে নেওয়া উচিত।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস রামমোহন-প্রস্তাবিত 'ভারতীয়করণ' তদানীন্তন আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি বলে গ্রহণ করেন—এবং অতি সাম্প্রতিক কালে প্রশাসন ও বিচারকে আলাদা করবার কর্মপন্থা আমরা গ্রহণ করেছি। ইংরেজ কর্মচারীর পেনসন ইত্যাদির আলোচনা করতে গিয়ে রামমোহন এমন আর একটি বিষয়েও আলোকপাত করেন, যেটি পরবর্তী যুগের আলোচনাতে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। রামমোহন তখনকার একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের ও একজন অডিটর-জেনারেলের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে দেখান যে কোম্পানীর ভারতীয় রাজস্ব থেকে বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা ইংলণ্ডে খরচ হত—বোর্ড অভ্ কণ্ট্রোল আর আর ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যয় নির্বাহে, ইংরেজ কর্মচারীর ছুটির বেতন, পেনসন ইত্যাদির খরচ মেটাতে, লণ্ডনে ধার-করা টাকার সুদ দিতে এবং সরকারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। এ ছাড়া অন্য একটি হিসাব অনুসারে ভারতে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁদের পারিবারিক ব্যয়-নির্বাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে বছরে প্রায় দুই কোটি টাকা নিজেদের দেশে পাঠাতেন। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে বিরাট লাভের টাকা দেশে পাঠাতেন কিংবা অবসর গ্রহণের সময় যে বিরাট সঞ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তার হিসাব রামমোহন দেন নি।

পরবর্তী যুগে দাদাভাই নওরোজি প্রমুখ অনেকে এই জাতীয় 'ইকনমিক ড্রেন' বা আর্থিক বহিঃস্রোতের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। নওরোজির বিশ্লেষণ রামমোহনের বিশ্লেষণেরই পুনরুজ্জীবন। ড্রেন-সম্বন্ধীয় যুক্তিতে কিছু ফাঁক থাকলেও এটা রামমোহনের যুগ থেকে আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ঠিকই বলা যেত যে, আমাদের দেয় 'হোম্ চার্জ' এবং বিলাতের অন্যান্য খরচের মধ্যে অনেকটা অংশই পরাধীনতার দাম—নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করতে পারলে এই বহিঃস্রোত অনেকটা কম হতে পারত। অবশ্য, বহির্বাণিজ্যে সমতা রক্ষা বা টাকা ও পাউণ্ডের মধ্যে বিনিময়ের হার সম্বন্ধে আলোচনা রামমোহন করেন নি ; তাঁর যুক্তির সবটা জোরই দেওয়া হয়েছিল ব্যয়সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপরে।

ভূমি-ব্যবস্থা, সরকারী আয়ব্যয়, অযৌক্তিক বিদেশী খরচ—এই-সব আলোচনার পরে রামমোহন প্রস্তাব করলেন যে, ইয়োরোপীয়দের ভারতবর্ষে এসে বসবাস করবার

সুবিধা করে দেওয়া হোক। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ আরো অনেকে তখন এই মতই প্রকাশ করেছিলেন। রামমোহনের যুক্তি ছিল যে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইংরেজ কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নত আধুনিক পন্থা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে ; আনবে তাদের মূলধন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ; সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করবে ; দরকার হলে সরকারকে সামরিক সাহায্য দেবে। এর অসুবিধার দিকটাও তাঁর নজর এড়ায় নি। ইয়োরোপীয় বাসিন্দারা একটা উঁচুস্তরের অধিকার দাবি করে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে, দরিদ্র জনসাধারণকে নানা ভাবে শোষণ করতে পারে এবং এসবের ফলে অনেক রকম আর্থিক ও সামাজিক সংঘর্ষের উৎপত্তি হতে পারে। তিনি এও বলেছিলেন যে, হয়তো পরবর্তী কালে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ভারতীয়েরা এই-সব ইয়োরোপীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা দাবি করতে পারে। অন্য অসুবিধাগুলিকে রামমোহন খুব বেশি গুরুত্ব দেন নি। স্বাধীনতার সম্ভাব্য দাবি সম্বন্ধে কানাডার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতে এরকম দাবি সম্ভবত উঠবে না ; আর যদি ওঠে, তাহলেও এদেশে অনেক 'ইংরেজী ভাষা-ভাষী, খৃষ্টান ইউরোপীয়' থেকে যাবে। রামমোহনের এ সম্বন্ধে লেখা খুঁটিয়ে পড়লে সন্দেহ হয় যে, তাঁর মনের অন্তস্তলে শিক্ষিত ভারতীয় ও স্থায়ী ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা অবাঞ্ছিত ছিল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই।

পরবর্তী যুগে ভারতীয় অর্থনীতিবিদেরা রামমোহনের অনেক প্রস্তাবই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারতে ইংরেজ বসবাস-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কখনো উচ্চারণও করেন নি। তার প্রধান কারণ, উনিশ শতকের শেষে ইয়োরোপীয় 'কলোনাইজেশন'-এর ফলাফলের দৃষ্টান্ত ছিল উত্তর-আমেরিকা নয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকা। বস্তুত, আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অনেকখানিই আফ্রিকার উপনিবেশসমস্যার প্রতিধ্বনি। রামমোহন ভেবেছিলেন, উত্তর-আমেরিকাতে ইংলণ্ডের মূলধন ও শ্রমশিল্প গিয়ে যেভাবে আর্থিক উন্নতি সম্ভব করেছিল এবং যেভাবে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব হয়েছিল সেভাবে ভারতেও দ্রুত উন্নতি আনা সম্ভব হবে। তাঁর আশা ছিল যে স্থায়ী ইয়োরোপীয় বাসিন্দা আর শিক্ষিত ভারতবাসী একজাতি হয়ে যাবে। এটা হয়তো তখনকার দিনের সমাজের উপরতলার শ্রেণীর মনোভাব। আফ্রিকাতে পরে কি হবে সেটা রামমোহন অবশ্য অনুমান করতে পারেন নি, কিন্তু আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের স্থান তখন কোথায় ছিল সেটাও তাঁর নজরে পড়ে নি। সম্ভবত, তাঁর মনে হয়েছিল যে আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের চেয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংরেজের সহযোগী হিসাবে সহজে গৃহীত হবে। এটাও আশ্চর্য যে, স্থায়ী বসবাসকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীর দ্বারা ভারতীয়দের শোষণের সম্ভাবনাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন নি, যদিও নীলকরদের অনাচারের কাহিনী তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়।

রাজা রামমোহনের সমস্ত মতবাদ ও প্রস্তাব কালের বিচারে গ্রহণীয় হয় নি, কিন্তু এটা খুব বড় কথা নয়। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর হাতে ভারতের অর্থনীতি-আলোচনা একটা বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করল। এও উল্লেখযোগ্য যে তাঁর সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ যোগসূত্র ছিল—প্রত্যেকটি প্রস্তাব একসঙ্গে এক চিন্তাধারায় গ্রথিত ছিল। যদি জমিদারের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তা হলে চাষীর খাজনারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। যদি চাষীর খাজনা আর না বাড়ানো হয়, তা হলে জমিদারের দেয় রাজস্ব কিছু কমানো হোক। যদি এর ফলে সরকারি আয়-ব্যয়ে ঘাটতি পড়ে, তা হলে নতুন শুল্ক বসানো হোক এবং ভারতীয় কর্মচারী অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করে ব্যয় কমানো হোক। ব্যয় কমানো হোক দেশের প্রশাসনে, ব্যয় কমানো হোক বিদেশে পেনসন সুদ ইত্যাদির অপচয় হ্রাসে। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি করা হোক দ্রুত হারে এবং এর জন্যে ইংরেজদের এখানে আমন্ত্রণ করা হোক প্রশাসক রূপে নয়, আর্থিক উন্নতির পথপ্রদর্শক স্থায়ী বাসিন্দা রূপে। যুক্তি ধারা চলে এসেছে অবারিত ভাবে, এক ধাপ থেকে আর-এক ধাপে। এখানেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী মনের পরিচয়।

উপসংহারে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই আলোচনায় রামমোহনের যে লেখাগুলির উপরে নির্ভর করা হয়েছে সেগুলি একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু এগুলি আরো সহজপ্রাপ্য হওয়া উচিত। অধ্যাপক সুশোভন সরকার-সম্পাদিত রামমোহনের অর্থনীতি-সংক্রান্ত রচনা-সংগ্রহের সুলভ সংস্করণ আমাদের ছাত্র ও গবেষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। তা ছাড়া, হয়তো অনুসন্ধান করলে এই রচনাগুলি ছাড়াও অন্য রচনা পাওয়া যেতে পারে। ১৮৩১ সালে সহসা প্রায় ষাট বৎসর বয়সে রামমোহন যে সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ রচনাগুলি লেখেন, তার আগে কোনো প্রস্তুতি ছিল না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। এবং লেখাতে যাঁর কার্পণ্য ছিল না, তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে আগেই লিখেছেন এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দেশের এবং ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকায় নানা পণ্ডিতজনের সঙ্গে চিঠিপত্রে, সরকারের কাছে আবেদন ও প্রতিবেদনে রামমোহনের অর্থনৈতিক মতবাদের প্রাক্-১৮৩১ সাক্ষ্য খুঁজলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এ দিকে অনুসন্ধিৎসু গবেষক যাতে অগ্রসর হতে পারেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলি সে সম্বন্ধে অবহিত হবেন এটা আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না। রামমোহনের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকীতে তাঁর স্মরণে সবচেয়ে বড় কাজ হবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সব দিক নিয়ে গবেষণার পথ পূর্ণতর ও প্রশস্ততর করে তোলা ; এর মধ্যে বিশেষ করে প্রয়োজন অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে রামমোহনের দান সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও আলোচনা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৯

সাংবাদিকতা ও কিংবদন্তী

সরোজ আচার্য

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর সাংবাদিকের স্বাধীনতা সমার্থক নয়। কোন দেশেই নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিংবা যাকে বলা হয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তার জন্য লড়াইটা এযাবৎ প্রধানত চলেছে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। এ লড়ায়ের মোটামুটি মানে, স্বাধীনভাবে মতামত এবং সমকালীন ঘটনাবলীর বিবরণ প্রকাশের অধিকার দাবি করেছে খবরের কাগজ। সে অধিকার মোটের উপর স্বীকৃত হয়েছে অনেক দেশে। কিন্তু খবরের কাগজের স্বাধীনতা মানে, সাংবাদিকের, এমন কী সম্পাদকেরও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নয়, এই সোজা কথাটা পরিষ্কারভাবে না বোঝার ফলে অনেক ক্ষোভ এবং অভিযোগ জমে উঠেছে। ক্ষোভ সাংবাদিকের মনে, অভিযোগ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে লড়াই-এ অতীতের বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক-মহারথী রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, তাঁদের নির্ভীক স্বাধীন-চিত্ততার জন্য বহু লাঞ্ছনা সয়ে। কিন্তু সাধারণত আমরা ভুলে যাই যে, এই সব সাংবাদিক যোদ্ধারা লড়েছেন রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে ; সংবাদপত্রের বৈষয়িক কর্তাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকের স্বাধীন মত প্রকাশের দাবির লড়াই সামান্যই হয়েছে। এ লড়াইটা আসলে হল সম্পত্তির 'পবিত্র অধিকার' ভোগীদের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই। খবরের কাগজ জনসাধারণের সেবক হোক বা না হোক, গোড়ার কথা হল খবরের কাগজ আর পাঁচ রকম জিনিসের মতই 'প্রপার্টি' অর্থাৎ সেই প্রপার্টির স্বত্বাধিকার যতক্ষণ সব বিষয়ে শেষ কথা বলতে অধিকারী ততক্ষণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জন স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি বিষয় প্রপার্টির স্বার্থদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এদেশে কিংবা ব্রিটেনে এবং আমেরিকাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন যে সব সাংবাদিকরা তাঁরা অনেকেই ছিলেন একাধারে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং সম্পাদকও ; কাজেই সম্পাদকীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সংবাদপত্রের মালিকানা কর্তৃত্বের নীতিগত বিরোধ এঁদের বেলায় দেখা দেয়নি।

আজকাল দেখা দিয়েছে, কারণ সংবাদপত্র এখন মোটা মূলধনী শিল্প বেতনভুক সাংবাদিক কলকারখানার মজুরদের চেয়ে স্বাধীন নন। সংবাদপত্রের বিষয় বক্তব্য এবং

বাচনভঙ্গী সবই নির্ধারিত হয় বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী—যে নীতির নিয়ন্তা সাংবাদিক প্রায়ই নন।

সম্পাদকীয় স্বাধীনতার প্রবল প্রতিবাদী (১) রাষ্ট্রশক্তি, এবং (২) সংবাদস্বত্ব-স্বামিত্ব। দ্বিতীয়টির প্রাধান্য প্রত্যেক সম্পাদককে মেনে নিতে হয়েছে; না মানতে পারলে সম্পাদকীয় পদ ছাড়তে হয়েছে, নয়তো সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে মূলনীতিগত প্রশ্নে রফা করতে হয়েছে। কিংবদন্তী যাই বলুক, সম্পাদকের স্বাধীনতা পুরোপুরি কখনই স্বীকৃত হয়নি, কোন দেশেই হয়নি। লণ্ডন টাইমসের স্বাধীন-চিত্ততার স্বর্ণ-যুগে সাংবাদিক-যোদ্ধা ডিলেন এবং বার্নেস সম্পাদক হিসেবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়েছিলেন, কিন্তু সে ক্ষমতা তাঁদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন টাইমসের স্বত্বাধিকারী জন ওয়াল্টার (২য়)। বার্নেসকে জন ওয়াল্টার যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন টাইমসের সম্পাদনায় তা ফ্রান্সিস্ উইলিয়মসের ভাষায় "No other employee had ever possessed" (কোন কর্মচারী কোনদিন পায়নি)। স্পষ্ট ভাবে মনে রাখা দরকার, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে খবরের কাগজের স্বত্বাধিকারীদের সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি, বিবেচনা অবিবেচনা এবং মর্জির উপরে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মত একদলীয় শাসনাধীন রাষ্ট্রে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা আরও সীমাবদ্ধ, পুরোপুরি রাষ্ট্রনির্ভর।

কাজেই সম্পাদকীয় স্বাধীনতা যে কেবল খবরের কাগজের ব্যক্তিগত মালিকানা কর্তৃত্বের ফলে সীমাবদ্ধ অথবা একেবারে লুপ্ত হয় এ অভিযোগ সত্যি নয়। কোনও রাজনৈতিকদল কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন যদি কোন খবরের কাগজের মালিক হয় সে ক্ষেত্রেও সম্পাদকের ক্ষমতা এবং দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করবার অধিকার সেই খবরের কাগজের বৈষয়িক কর্তাদের। সম্পাদকের ব্যক্তিগত বিবেক ব্যবহারের কিংবা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, হয় কর্তাদের নির্দেশে সীমাবদ্ধ নয়তো মারাত্মক রকমের অনিশ্চিত। এ রকম অবশ্য হতে পারে—কখন কখন হয়েছেও—যে, সম্পাদক তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্ব গুণে বা অন্য কারণে সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারভোগী কর্তাদের স্বমতে আনতে পেরেছেন; এমনও দেখা গেছে, তবে খুব বেশী নয়, যে অনেকক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীদের মত সম্পূর্ণ অন্যরকম হলেও সম্পাদক তাঁর কাগজে নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পেরেছেন। এ-রকম ঘটনা অবশ্য আজকাল বিরল এবং সংবাদপত্র জগতের প্রচলিত ট্র্যাডিশনের ব্যতিক্রম। ট্র্যাডিশন হল খবরের কাগজের বৈষয়িক-কর্তারা তাঁদের ইচ্ছে মত সম্পাদকীয় রাশ ঢিলে দিতে পারবেন কিংবা টেনে ধরতে পারবেন। স্বত্বাধিকারীদের খুশিমত যেটুকু সম্পাদকীয় স্বাধীনতা মেলে সে হল বিশেষ সুবিধা বা প্রিভিলেজ। এ রকম 'প্রিভিলেজড়', সম্পাদকীয় স্বাধীনতা যে খুবই অনিশ্চিত, সে কথা বলা বাহুল্য। স্পষ্ট ভাষণের 'প্রিভিলেজ' লীয়রের ফুলও (fool) পেয়েছিল, কিন্তু সেও জানত,

স্বাধীনভাবে সে যা খুশি বলতে পারে, প্রভুকে সমালোচনাও করতে পারে ঠিক ততক্ষণ যতক্ষণ লীয়র তাকে চাবুকের ভয় না দেখাচ্ছেন—"Sirrah ! the whip". চাবুকটা অনেকসময় অদৃশ্য বলে সম্পাদকীয় স্বাধীনতার কিংবদন্তী জনসাধারণের মনে অনেক অতিরঞ্জিত ধারণা সৃষ্টি করে।

ব্রিটেনে ডিলেন-বার্নেস এবং এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে সাংবাদিক মহারথীরা এই ধরনের স্বাধীন স্পষ্টবাদিতার প্রিভিলেজ ভোগ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু পেরেছিলেন খবরের কাগজের বৈষয়িক কর্তাদের অনুগ্রহেই। তখন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও সাংবাদিক কর্তব্যে নীতিগত সংকট প্রবল হয়নি কারণ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে লড়াইটা ছিল সংবাদপত্র জগতের কর্তা ও কর্মী সকলেরই মুখ্য চিন্তা। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবি নিয়ে লড়াই-এর যুগে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিকদের স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় অভিন্ন ছিল। তা ছিল বলে সে যুগের সম্পাদকদের এবং সাংবাদিকদের 'প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে' বিরোধের কঠিন সংকটে সচরাচর পড়তে হয়নি।

টাইমসের মালিক জন ওয়াল্টারের কথা আবার উল্লেখ করা যেতে পারে—"he acted on the self effacing assumption that journalism is best left to journalists". (তিনি এই আত্মবিলোপকারী ধারণা মেনে নিয়ে কাজ করেছিলেন যে, সাংবাদিকতা সাংবাদিকদের হাতে ছেড়ে দেয়াই সবচেয়ে ভালো) স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী যুগে এদেশের সংবাদপত্র মালিকেরা অনেকটা এই মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু তা-ও সব সময়ে নয়।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খবরের কাগজ কোন্ পক্ষ নেবে তা নিয়ে সংবাদপত্র মালিকের সঙ্গে মতবিরোধে কোন কোন প্রখ্যাত সম্পাদককে হয় নতি স্বীকার করতে নয়তো সম্পাদকত্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

খবরের কাগজের ব্যক্তিগত মালিকানাই যে সম্পাদকীয় স্বাধীনতার একমাত্র বাধা একথা যথার্থ নয়। একটি দৃষ্টান্ত লণ্ডন ডেইলি হেরাল্ড। এই কাগজের মালিকানার প্রায় অর্ধেক অংশ কিছুকাল আগেও ছিল ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিকারে, আর বড় অংশটা ছিল লর্ড অডহামের। সম্পাদকীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ডেইলি হেরাল্ডের বড় ছোট দুই অংশীদারেরই মতামত সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। ট্রেড ইউনিয়নের কর্তাদের মতে সম্পাদক আর পাঁচজন কর্মচারীর মতোই সব বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। ওদিকে বড়ো অংশীদার অডহামের দাবি হল সম্পাদক হচ্ছেন, "a technician hired to do a production job" (সম্পাদক একজন অভিজ্ঞ কারিগর যাঁকে কাগজ বার করবার কাজে নিযুক্ত করা

হয়েছে)। এদেশেও একজন প্রখ্যাত সম্পাদক কিছুকাল পূর্বে সবিনয়ে ঘোষণা করেন, সম্পাদক কল্পনা এবং সাংবাদিকরা হলো 'লিটারারি কুক'—কর্তাদের রুচি অনুযায়ী ঘটনা, এবং মন্তব্যে কিছু সাহিত্যিক মশলা মিশিয়ে দৈনিক ভোজ রান্নার কারিগর।

আবারও বলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতা একার্থবোধক ধরে নিয়ে সাংবাদিকদের ক্ষমতা সম্পর্কে আজগুবি ধারণা পোষণ করে লাভ নেই। সাংবাদপত্রের বাস্তব বিন্যাসটা ঠিকমতো লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই বিন্যাসে কোন সাংবাদিকের পক্ষে নিয়মমাফিক নির্দেশ অনুযায়ী কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছু করার নেই। নেই বলে অনেকক্ষেত্রে সাংবাদিকের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি বিড়ম্বিত হয়েছে সন্দেহ নেই। এর প্রতিকার কী হতে পারে এবং প্রতিকার সম্ভব কিনা তা নিশ্চয়ই চিন্তা করা প্রয়োজন। তবে সংবাদপত্রের স্বত্ব-স্বামিত্ব যাঁদের তাঁরা তাঁদের স্বার্থ অথবা রুচি অনুযায়ী সংবাদপত্র পরিচালনায় নির্দেশ দানে বিরত হবেন এতটা কী করে আশা করা যায়?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বিরোধটা আগে ছিল প্রধানত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে, এখন বিরোধ সংবাদপত্র সংগঠনের অভ্যন্তরে নীতিগত কর্তৃত্ব নিয়ে। "The issue of independence has taken on a different and in some ways a more complicated form". (সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটা অন্যরূপ নিয়েছে, কোনো কোনো দিক থেকে জটিলও হয়েছে) অবাধে মতামত প্রকাশের বিশেষ সুবিধা বা 'প্রিভিলেজ' কোনো কোনো সম্পাদক ভোগ করতে পেরেছেন এদেশে এবং বিদেশে এককালে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাংবাদিকমাত্রেই কতকগুলি লিখিত এবং অলিখিত বিধিনিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। প্রথম নিয়মটা হল খবরের কাগজে কী লেখা হবে, না হবে, কী ছাপা যাবে, না যাবে সে বিষয়ে সম্পাদকই সর্বময়কর্তা এবং তাঁকে কাগজের বিবেকরক্ষক বলে ধরে নেয়া হয়। সম্পাদকের বিবেকের দৌড় কত দূর হবে সেটা অবশ্য নির্ভর করে সংবাদপত্রের স্বত্ব-স্বামিত্বভোগী কর্তাদের উপর। সে যাই হোক, এটা অন্তত ঠিক যে কেবল সম্পাদক ছাড়া অন্য কোন সাংবাদিকেরই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর রুচি এবং মতামত অনুসারে কাজ করবার অধিকার নেই, থাকা সম্ভবও নয় কারণ কোন্ বিষয়ে কী লেখা এবং ছাপা হবে, না হবে তা এক একটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকদের ভোট নিয়ে ঠিক করতে হলে খবরের কাগজে দিনের দিন হাস্যকর বিপর্যয় কিংবা অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে।

কিংবদন্তী যাই বলুক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে খবরের কাগজ চালানো ব্যাপারে প্রত্যেক সাংবাদিকের নিজের মতামত প্রয়োগের স্বাধীনতা কখনই নয়। এবং কিংবদন্তী যাই বলুক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কার্যকরী অর্থ হল কাগজের মালিকানা যাঁদের কাগজের মতামত ও চরিত্র নির্ধারণের স্বাধীনতাও তাঁদের। সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিক এই 'পবিত্র' স্বাধীনতার অবশ্য অল্পবিস্তর রকমফের ঘটে থাকে। খবরের

কাগজের বৈষয়িক কর্তারা তাঁদের বিশ্বাসভাজন সম্পাদককে কাগজের নীতিনির্ধারণে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে পারেন। আইনের প্রচলিত বিধানও অনেকটা এর সপক্ষে। সম্পাদক যখন খবরের কাগজে যা কিছু ছাপা হয় তার জন্যে দায়ী তখন সম্পাদকের অধিকারটা কাগজপত্রে অন্তত স্বীকার করতেই হয়। সে অধিকার কাগজের বৈষয়িক কর্তারা সম্পাদককে পুরোপুরি ছেড়ে দিলে সম্পাদক হতে পারেন ষোলআনা ডিক্টেটরী ক্ষমতাভোগী অর্থাৎ তাহলে আর কোনো সাংবাদিক নয়, একমাত্র সম্পাদকের মতামত এবং নির্দেশই অভ্রান্ত এবং প্রশ্নাতীত গণ্য হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ-রকম অবস্থাতে ব্যক্তিগতভাবে অন্য সাংবাদিকদের নিজস্ব মতামত এবং বিবেক ব্যবহারের কোন সুযোগ থাকতে পারে না।

অতএব ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ভীরুতা, কপটাচরণ, দাস-মনোভাব ইত্যাদির অভিযোগ আনবার কোনো অর্থই হয় না। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যেমন তাদের কাজ সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ মেনে চলতে হয় সাংবাদিকদেরও তেমনি। অন্য সব প্রতিষ্ঠানেও কাজের নীতি নির্ধারণ এবং দায়ভাগটা সাধারণ কর্মীর ইচ্ছা অনুযায়ী হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে সমানভাবে ভাগ করে দেবার পদ্ধতি সোভিয়েট্ ইউনিয়নেও আবিষ্কৃত হয়নি। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' যেমন কল-কারখানায়, তেমনই খবরের কাগজেও ; কর্তা কখনও স্বয়ং রাষ্ট্রযন্ত্র কখনও বা রাজনৈতিকদল কিংবা সম্পত্তির 'পবিত্র অধিকার' ভিত্তিক ব্যবসায়ী-পরিবার-গোষ্ঠী ইত্যাদি। কাজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, এই স্বাধীনতা ব্যবহার করতে পারেন সংবাদপত্রের বৈষয়িক স্বত্বা-স্বামিত্ব যাঁদের তাঁরাই। আর এঁদের ইচ্ছায় কিংবা অনুগ্রহে এবং এঁদেরই প্রয়োজন মতো সম্পাদকও খবরের কাগজ পরিচালনা ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারেন। এককালে অন্তত সম্পাদকীয় ক্ষমতাই ছিল খবরের কাগজের নীতি ও চরিত্র নির্ধারণ ব্যাপারে প্রায় সর্বেসর্বা। "The great editors of the past had usually been autocrats—great newspapers do not grow under divided authority"—Frances Williams. (আগের কালের বড় বড় সম্পাদকেরা সাধারণত সর্বশক্তিমান স্বেচ্ছা-বিধায়ক ছিলেন—ক্ষমতা ভাগাভাগি হলে উঁচুদরের খবরের কাগজ গড়ে ওঠে না)।

নর্থক্লিফ-বিভারব্রুক-রদারমিয়র প্রমুখ সংবাদপত্র সম্রাটদের আমলে সম্পাদকদের সে প্রিভিলেজ বহুদিন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এদেশেও হচ্ছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এখন মুদ্রা অর্জনের স্বাধীনতা। অর্জিত মুদ্রার কিছু অংশ নিয়ে তুষ্ট থাকাই এখন সাংবাদিক ট্র্যাডিশন।

কিংবদন্তীর যুগেও শুদ্ধ সম্পাদকেরাই স্বাধীনভাবে বিষয় ও বক্তব্য স্থির করবার প্রিভিলেজ অনেকখানি ভোগ করতে পেরেছেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক (leader

writer), বার্তাসম্পাদক ইত্যাদি অন্যান্য সাংবাদিককে সম্পাদকের নির্দেশ মানতেই হয়েছে এবং হয় ; সে নির্দেশ সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের বিচার বিবেচনা যাই হোক না কেন সাংবাদিক তাঁর প্রতিষ্ঠানের নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী কর্তব্য পালন করেছেন এবং করতে বাধ্য। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেন্ট বা ক্যাশিয়ার ব্যাঙ্ক মালিকদের টাকা লেনদেন নীতি ও কাজকর্ম সম্পর্কে নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন বলে জানি না ; কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের মেহনতে তৈরী জিনিসের গুণাগুণ সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে জনস্বার্থে আন্দোলন করেছেন বলে শোনা যায় না। সামাজিক কর্তব্য হিসেবে একরকম করতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো, সেদিক দিয়ে সাংবাদিকেরাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্য, অকর্তব্য নির্ধারণের জন্য আচরণবিধি (code) রচনা এবং সত্যিসত্যি প্রয়োগ করতে পারলে ভালো বৈকি।

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভীরুতা ও কপটতার অভিযোগ তোলা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অসঙ্গত। সম্পাদকীয় স্বাধীনতার মনোহারী কিংবদন্তীর যুগেও সাংবাদিককে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ধামাচাপা দিয়ে এখনকার মতোই যে কাগজের যেমন নীতি এবং নির্দেশ সেই অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে। তার দুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে সাংবাদিক স্বাধীনতার একটি বাস্তব অথচ স্বল্প পরিচিত দিকের উপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ব্রিটেনে যখন প্রথম শ্রমিক সরকার গঠিত হয় সে সময়ে ডেইলি হেরাল্ডের সম্পাদক হন হ্যামিল্টন ফাইফ। ফাইফ অভিজ্ঞ সাংবাদিক। সোস্যালিস্ট মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘকাল নর্থক্লিফ-রদারমিয়ারের কাগজে সম্পাদকতা করেছিলেন। সাংবাদিক বৃত্তিজীবি হিসাবে সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনের সময় তাঁর ব্যক্তিগত মতামত অনুশীলন ও প্রকাশের সুযোগ নিশ্চয়ই ছিল না। সেজন্য ফাইফের বিরুদ্ধে ভীরুতা কপটতা ইত্যাদির অভিযোগও উঠেনি। ফাইফ যখন ডেইলি হেরাল্ডের সম্পাদক তখন ওই কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন যাঁরা কম্যুনিস্ট-পন্থী। ফাইফ বলেন, এঁদের রাজনৈতিক মতামত যাই হোক ডেইলি হেরাল্ডের সম্পাদকীয় নীতি নির্দেশ এঁরা বিশ্বস্তভাবে মেনে চলেছিলেন।

সেই রকম বিভারব্রুকের গোঁড়া টোরী কাগজ ডেইলী এক্সপ্রেসে শ্রমিকদলের প্রখ্যাত বামপন্থী পুস্তিকা-লেখক মাইকেল ফুট সম্পাদকীয় প্রবন্ধকার ছিলেন। সাংবাদিক কর্তব্য সম্বন্ধে এমন কোনো কঠোর নীতি নির্দেশ সম্ভব নয় যার দ্বারা সাংবাদিকের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ না করতে পারলে তাঁর নৈতিক নিন্দা হবে। সাংবাদিক স্বাধীনতার সমস্যা যে অত্যন্ত জটিল এবং তার সমাধান নিছক ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রিভিলেজ আদায় অথবা প্রতিবাদের উপরে নির্ভর করে না, এখানে বক্তব্য সুদ্ধ এইটুকু।

কৃষিসমস্যা ও আমরা

অশোক মিত্র

অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা মিলিয়ে বিজ্ঞান। শুধু অনুভূতির ধাতু দিয়ে যা রচনা সম্ভব তা দর্শন, আর একমাত্র অভিজ্ঞতায় ভর ক'রে এগোতে যদি হয়, তা হ'লে যেখানে পৌঁছবো তা বড় জোর পুরাণবৃত্তান্তে। আমাদের বিশুদ্ধ চিন্তা যে-উপপাদ্যে উত্তীর্ণ করে, তার কানে-কানে তারপর অভিজ্ঞতার কথা বলা ঃ তোমার এইটুকু ঠিক, বাকি অংশ বদলে নিতে হবে, কারণ আমি অন্যরকম দেখেছি। চিন্তা বিনম্র ধৈর্যে ফিরে যায়, পরিশুদ্ধ বিন্যাসে ফিরে আসে, আরেকবার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, সিদ্ধান্তের আরো-একটু রদ-বদল। চিন্তার কাঠামো হয়তো অটুট থাকে, যা বদলে যায় তা বিবৃতির একটি-দুটি পরিষঙ্গ-অনুষঙ্গ। অভিজ্ঞতা থেকে দর্শন, দর্শন থেকে অনুশীলন ; কিছু কিছু সংস্কার প্রাক্তন মোহ-আবরণ ঘুচিয়ে ফেলে, নতুন আবিষ্কার থেকে নতুন চিন্তার সাযুজ্যবন্ধন হয়। চিন্তা এবং পরিচয়ের রসায়নে এমনি ক'রেই বিজ্ঞান গতির আবেগ পায়।

ধনবিজ্ঞানেও তাই। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধনবিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, বিনিয়োগের হারের সঙ্গে আর্থিক প্রগতির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, এখনো অখণ্ডিত। চিরকালই এই অখণ্ডতা বজায় থাকবে ব'লে মনে হয়। বিনিয়োগের পরিমাপ বেশি ব'লেই পূর্ব ইওরোপে-চীনে-জাপানে জাতীয় উপার্জন বৃদ্ধির হার উপলগতি ; আমাদের প্রগতির বেগ স্তিমিত, কারণ আমাদের বিনিয়োগের অঙ্ক তুলনায় অনেকটাই কম। কিন্তু এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির সূত্র ধ'রে কতগুলি নিবন্ধের জন্ম হয়েছে যাদের সব-ক'টিই হয়তো সমাজ তথ্যসম্পন্ন নয়। বিনিয়োগের আনুপাতিক কত অংশ ইস্পাত-যন্ত্রপাতি-সড়ক-বন্দর-বিদ্যুৎ-সেচনে ব্যয়িত হবে, কত অংশ নিত্যকার তাৎক্ষণিক চাহিদার ইন্ধন মেটাতে ব্যয়িত হবে, তা নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের মনে একটা স্পষ্ট-গোছের অঙ্ক কষা ছিল। শুধু তাই নয়, মোট যা যন্ত্রপাতি তৈরি হবে, তার কত পরিমাণ জামাকাপড়-চকোলেট-কলের-গান-হাওয়া-খাওয়ার-মোটরগাড়ি ইত্যাদি তৈরি করার মতো যন্ত্রপাতি, আর কত পরিমাণ আরো-এক দফা নতুন যন্ত্রপাতি করার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিতব্য, সে-বিষয়েও এক আদর্শ গ'ড়ে উঠেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের আশ্চর্য প্রগতি আমাদের মুগ্ধতার উজ্জ্বল আকাশে উত্তীর্ণ করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সূচনা-সময়ের সঙ্গে সে দেশের একেবারে

হালের অবস্থা তুলনা ক'রে বিস্মিত-হতচকিত আমরা, সোভিয়েট পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে অতএব আমাদের উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা : বিনিয়োগের হার যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে চলো, আপাতত আদৌ ঢিলে দিও না ; বিনিয়োগের সাহায্যে যে-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদন-উপকরণ তৈরি হবে, তাদের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োগ কোরো না বরঞ্চ সেই যন্ত্রপাতিগুলির একটা বড়ো অংশ আরো যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করো ; তা হ'লেই দেখতে পাবে কয়েক বছর বাদে কলকারখানা-যন্ত্র-বিদ্যুতে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। এই যন্ত্র-বিদ্যুৎ-পরিবহনের সাহায্যে এবার তোমরা দ্রুততর উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে পারবে, এবং এখন আর-কোনো বাধা নেই যে-কোনরকম জিনিসেরই উৎপাদনে। প্রথম দিকে কৃচ্ছ্রসাধন করো, অন্তিমে অপরূপ ফল পাবে। প্রথম দিকে অশনে-বসনে অভাব ঘটে ঘটুক, পরে তা পুষিয়ে যাবে। অন্য পক্ষে গোড়া থেকেই যদি বিনিয়োগের বৃহদংশ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিয়োগ করো, তা হ'লে দু'এক বছর হয়তো একটু ভালো খাবে-পরবে, কিন্তু তার পরেই টানাটানির ঋতু। যেহেতু ভবিষ্যতের কথা ভাবোনি, নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ বৃদ্ধির দিকে নজর দাওনি, আখেরে মুশকিল। যন্ত্র এবং অন্যবিধ সরঞ্জাম যেহেতু বাড়বে না, উৎপাদন ক্ষমতা তাই মোটামুটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সাচ্ছল্য ভোগ ক'রে-ক'রে অধিকতর সাচ্ছল্যের জন্য জনসাধারণের বাসনা জাগবে, অথচ খাদ্য, পরিধেয়, এবং বিলাসব্যসনের সামগ্রীর উৎপাদন পূর্ববৎ। সুতরাং, পরিণামে যদি দুঃখলগ্ন না-হ'তে চাও, আপাতত নিবৃত্তির মন্ত্র শেখো, বিনিয়োগ বাড়াও, এবং বিনিয়োগের গুরু অংশ প্রতিনিয়ত যন্ত্র-পরিবহন-বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রসারে বিন্যস্ত করো।

সোভিয়েট পরিকল্পনার এই যুক্তিসূত্রে অবশ্যই প্রত্যক্ষ সমস্যার রঞ্জন ছিল। দুটো বিষয় বিশেষ ক'রে লক্ষণীয়। শত্রু এবং শত্রুমন্য দিয়ে ঘেরা ; সোভিয়েট দেশে সে-সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও ইস্পাত এবং কলকব্জার উপর জোর দেওয়ার তাগিদ দেখা দিয়েছিল তাই। তা ছাড়া, বিনিয়োগের মাত্রা যেহেতু বাড়ানো কর্তব্য, সম্ভোগের পরিমাণ যে-ক'রেই-হোক তুলনায় কমিয়ে আনতে হবে। বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং বাইরে থেকে ভোগ্যপণ্য আসার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এ তো হলো শুধু এক দিক। দেশজ পণ্য থেকেও সম্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব : সে-সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম উপায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, এবং ভোগ্যপণ্য তৈরিতে নিযুক্ত হতে পারে এ-ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি পর্যন্ত ভীষণভাবে কমিয়ে নিয়ে আসা। ভোগ্যপণ্য না-থাকেলে লোকেরা উপার্জিত অর্থ সম্ভোগে ব্যয় করতে অক্ষম হবে, বাধ্যত সঞ্চয় বাড়বে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ।

সোভিয়েট সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হয়েছে, ঐ দেশের মানুষ প্রাথমিক কৃচ্ছ্রসাধনার প্রসাদ ইদানিং পেতে শুরু করেছে। শুধু এক-জায়গায় অঙ্ক মেলেনি। ভেবে অবাক হ'তে হয়, কৃষিকর্মের বাইরে সোভিয়েট দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে কুড়িগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ কৃষিউৎপাদন এমনকি দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়নি। এবং কৃষিতে যে-পরিমাণ উৎপাদন বেড়েছে তার সমগ্রাংশই নতুন জমি আবাদ করার ফলে, গড়ে জমির উৎপাদনক্ষমতা সামান্যতমও বাড়েনি। যেহেতু, যন্ত্রের মতো, পরিবহনের মতো, বিদ্যুৎশক্তির মতো, কৃষিজাত পণ্যাদিও প্রগতিসঞ্চারের বড়ো উপকরণ—কাঁচামালের কথাই ধরা যাক শুধু—, সম্প্রতি সোভিয়েট দেশের আর্থিক উন্নতির হার এই কারণে দ্রুত ক'মে আসছে।

কৃষির ব্যাপারে মনে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে দুই ধরনের ভুল অঙ্ক গোড়া থেকেই কষা হয়ে আসছিল। প্রথম ভুল ঘটে কৃষির জন্য প্রয়োজনানুগ বিনিয়োগের হিসেবে। কৃষিকর্মের মোড় ফেরাবার উদ্দেশ্যে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ট্রাক্টর তৈরির উপর। যে-পরিমাণ টাকা ট্রাক্টরশিল্পে ব্যয়িত হয়েছে, তার কণাংশও সার তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়নি। কীটনাশক ঔষধাদি প্রস্তুতের ব্যাপারেও অবহেলা দেখানো হয়েছে, উন্নত বীজ-শস্যের উপকারিতা নিয়েও তেমন মাথাব্যথা দেখা যায়নি। সব-মিলিয়ে, অন্তত ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত, সোভিয়েট দেশে কৃষিখাতে নির্দিষ্ট বিনিয়োগের মোট অঙ্ক অনুপাতে যেমন কম থেকে গেছে, বরাদ্দ অর্থের বণ্টনেও সেরকম একপেশে চিন্তাভাবনা আধিপত্য বিস্তার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পশ্চিম ইওরোপে কৃষিভূমির গড় উৎপাদনক্ষমতা গেলো পঞ্চাশ বছরে পাঁচ-ছয়-সাতগুণ বেড়েছে; এর প্রায় পুরোটাই সম্ভব হয়েছে রাসায়নিক সার, উন্নত বীজশস্য ও কীটনাশক প্রণালী-প্রয়োগে। শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চেভের ক্ষমতায় আসীন হবার আগে পর্যন্ত, সোভিয়েট দেশে কৃষিবিনিয়োগের এ-দিকটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামানো হয়নি।

কৃষিক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমস্যা এক হিসেবে আরো অনেক জটিল। উৎপাদনের প্রক্রিয়া সাধারণত খুব আবেগহীন ব্যাপার। কেউ যদি বাণিজ্যে নামতে চান, কিংবা কোনো কারখানা বসাতে উৎসাহী হন, প্রশস্ত সরল রেখায় তিনি এগোতে পারেন। তাঁর হাতে হয়তো মূলধন আছে, তার কিছু খরচ ক'রে তিনি যন্ত্র কিনবেন, কোনো জায়গা ভাড়া ক'রে সেই যন্ত্র স্থাপন করবেন, কাঁচামাল-রসদের ব্যবস্থা করবেন, এবং সব শেষে কিছু শ্রমিক নিয়োগ করবেন। শ্রমিকরা মজুরি নিয়ে খাটবে, পণ্য উৎপাদন করবে, মালিক পণ্য বিক্রয় ক'রে লাভের ব্যবস্থা করবেন। যদি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হয়, তা হ'লেও খুব একটা ব্যবস্থার রকমফের নেই : রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিকানায় শ্রমিকদের এবার অধিকার জন্মাবে, কিন্তু শিল্পোৎপাদনের চরিত্র

তাতে তেমন বদলাবে না। যন্ত্রের ভূমিকা শিল্পে যতই বাড়ছে, শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়া ততই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসছে। তা ছাড়া, দেশের দু'তিন হাজার বড়ো-বড়ো কারখানার যদি সালতামামি করা যায় দেখা যাবে, উৎপাদিত শিল্পপণ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই কিংবা হয়তো তারো বেশি—এই কারখানাগুলিতে তৈরি হচ্ছে। সুতরাং এই দু'তিন হাজার কারখানার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পারলেই উৎপাদনের প্রগতি অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু কৃষির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্যরকম। কৃষিকর্ম সমস্ত দেশ জুড়ে, হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ পল্লীগ্রামে। একই গ্রামে হয়তো দু'তিনশো কৃষিজীবি, তাঁরা প্রত্যেকেই মনের দিক থেকে সার্বভৌম, ইচ্ছার দিক বিবেচনা করলে পরস্পর অবচ্ছিন্ন। উৎপাদন বাড়াতে হ'লে এঁদের সবাইকেই সমমন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে ঃ একই চেতনার বিদ্যুৎ সকলের মনে এক সঙ্গে প্রবাহিত না-হ'লে ফসল পরিকল্পনা-অনুযায়ী বাড়বে না। এই কাজ তাই দু'হাজার-তিনহাজার চাষীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে সমাধা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত না-হ'লে কৃষি-উৎপাদন খুব বেশিদূর এগোবে ভাবা দুরাশা। সোভিয়েট দেশে প্রধান ভুল ঘটেছিল কৃষিজীবীদের মানসিকতা নিয়ে সমস্ত জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, শোষণের প্রতীক জমিদারদের যেহেতু উচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে, চাষীরা এবার উৎফুল্ল হৃদয়ে রাষ্ট্রভক্তিতদ্‌গত হয়ে ফসল বাড়াবার দিকে মনোনিবেশ করবে। কিন্তু ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে চাষীদের মনে যদি মোহ থাকে, জমিদারি ঘুচিয়ে রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করলেই তা ঘুচবে না। জমি এক দিকে যেমন কৃষিভূমি, অন্যদিকে তেমনি বসতির ভিটেমাটিও ঃ জমি সম্পর্কে তাই অধিকাংশ কৃষিজীবীর মনে এক অদ্ভুত দুর্বলতা, অনেক নিবিড়-হয়ে জড়ো-হওয়া আবেগের ব্যাপ্তি। যে-জমি রাষ্ট্রের, সে জমিতে তারও অধিকার ঃ এ-ধরনের দূরাগত যুক্তিতে অধিকাংশ কৃষকের মন হয়তো সায় দেবে না। সোভিয়েট দেশে সুদীর্ঘ সময় কেটেছে এই সায় পাওয়ার চেষ্টায় ; ইতিমধ্যে উৎপাদনের হার অবশ্যই স্তিমিত থেকে গেছে। চাষীদের মন অসেতুসম্ভব হবার ফলে মনের আদান প্রদানও অবরুদ্ধ থেকেছে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সর্বজ্ঞ নন, কোন গ্রামে কীসের অভাব—সেচের জলের, না কি উন্নত বীজশস্যের, না কি সারের—সব-সময় তাঁদের পক্ষে নির্ভুল জানা মুশকিল। তা ছাড়া বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে সব গ্রামেই কমিউনিস্ট পার্টির সমান প্রভাব না-থাকায় অনেক জায়গাতেই কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের সংযোগ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের প্রয়োজন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায়ই তাই গরমিল থেকে গেছে, যে-গ্রামে যে-সালে সার পৌঁছনো দরকার, সে-গ্রামে সে-বছর হয়তো চকচকে ঝকঝকে ট্রাক্টর পৌঁছেছে, যেখানে সেচের জল দরকার সেখানে হয়তো পৌঁছেছে সার।

কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ ক'রে ভাবা দরকার, যন্ত্রপাতির খাতে বিনিয়োগ অনির্দিষ্টভাবে বাড়িয়ে গেলেই আর্থিক প্রগতি করতলগত আমলকীর মতো হয়ে আসবে না ঃ সোভিয়েট দেশ এটা ঠেকে শিখলো। ইদানীং আমরা চীন দেশ থেকে খুব বেশি খবরাদি পেয়ে থাকি না, কিন্তু যতটুকু পৌঁছয় তা থেকে মনে হয় কৃষি উৎপাদনে সোভিয়েট অসাফল্যের দৃষ্টান্ত চীনেদের সাবধানতা শিখিয়েছে। শুধু বিদ্যুৎ-পরিবহন-যন্ত্রের প্রসারের দিকেই নজর দিলে চলবে না, কৃষিঘটিত বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বাড়াতে হবে, নইলে সোভিয়েট দেশের দশা হবে ঃ মনে হয় এই উপলব্ধি চীন দেশে এসেছে। গোড়াতে অবশ্য ঠিক এ-রকম ছিল না, বরঞ্চ চীনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সোভিয়েট বিনিয়োগ প্রথার আদি দোষগুণ সব-কিছুই উপস্থিত। কিন্তু সম্ভবত ১৯৫৯-৬০ সালের খাদ্যাভাবের প্রত্যক্ষ ফলে, চীন-পরিকল্পনায় গোঁড়ামি ইদানীং অনেকটাই কমেছে। নতুন যে-সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে কৃষি-বিনিয়োগের তুলনামূলক হার বেশ-কিছু বাড়ানো। সার, কীটনাশক ঔষধ, উন্নত বীজশস্য, উন্নত রোপণ-প্রণালী প্রভৃতি ব্যাপারেও চীনেদের মনোনিবেশ বেড়েছে, নতুন ধরনের হাল-লাঙল-কাস্তে-খুরপি নিয়েও প্রচুর আলাপ-আলোচনা চলছে। সব-মিলিয়ে মনে হয়, কৃষি-উন্নয়ন প্রণালীর সমস্যাদি কেন্দ্র ক'রেই উপস্থিত চীনেদের বিনিয়োগ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় 'ভারি শিল্প' তার উপর আগের মতো আর জোর দেওয়া হচ্ছে না। ট্রাক্টরের উপযোগিতা নিয়ে এখনো যদিও গম্ভীর-রাশভারি প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, কৃষির ক্ষেত্রে ট্রাক্টরকে পাশে সরিয়ে রেখে যে অন্য-ধরনের বিনিয়োগ সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়, সে-স্বীকৃতি অন্তত এসেছে।

কিন্তু এ তো গেল স্রেফ কৃষি-প্রণালীর কথা ; রুশদের যেমন ছিল, চীনেদেরও সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে হার্দ্য বিনিময়ের। এই ব্যাপারে চীন সরকার কতটা সফল হচ্ছেন বলা কঠিন। সাত লক্ষ গ্রাম নিয়ে চীনদেশে কৃষিভূমির বিস্তার, এবং অন্তত চল্লিশ কোটি লোকের জীবিকা কৃষিকর্ম। এত লক্ষ গ্রাম এবং এত কোটি লোককে বশংবদ করতে পারলেই তবে কৃষিতে উন্নতি সম্ভব, উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা চালানো সম্ভব। একনায়কতন্ত্রের দেশে সব-কিছুই নিয়ন্ত্রণ করা চলে, এ-ধরনের একটা কুসংস্কার আমাদের অনেকেরই মনে আছে। কিন্তু আইন ও দণ্ডের ভয় দেখিয়ে চল্লিশ কোটি লোককে বশে আনা যায় না, সেজন্য প্রয়োজন অন্যবিধ প্রতিভার। শতাব্দীর তিরিশ শতকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির যে-ব্যূহব্যাপ্তি ছিল, এমন হ'তে পারে, তুলনায় চীনের গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমানে অধিকতর প্রভাব। তা হ'লেও সন্দেহ হয়, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যস্থতা পেরিয়ে অতিরিক্ত-কিছু করার প্রয়োজনীয়তা চীন কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি

করেছেন, এবং সেজন্যই গ্রামাঞ্চলে 'কমিউন' গঠনের হিড়িক। কমিউনের সপক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে, তবে শুভফল যা-যা পাওয়া যাচ্ছে, উদাহরণ-স্বরূপ তাদের একটির উল্লেখ করছি। কমিউন প্রথা শুরু হবার পর থেকে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ঘরের কাজের বহর অনেকটাই ক'মে গেছে, ফলে অনেক সমর্থ মেয়ে বাড়তি উপার্জনের জন্য বাইরে যেতে পারছেন ; অতএব একদিকে কৃষির উৎপাদনও যেমন বাড়ছে, অধিকাংশ পরিবারের গড় উপার্জনের পরিমাণও সেই সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। এ-রকম যদি কয়েকটি বছর নিস্তরঙ্গ অতিবাহিত হয়, গ্রামাঞ্চলে সন্তুষ্টির মাত্রা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং এমন হ'তে থাকলে কর্তৃপক্ষ কৃষিজীবীদের কাছ থেকে অধিকতর সহযোগিতা আশা করতে পারেন।

চীনের কর্তৃপক্ষ হয়তো সফল হবেন, হয়তো হবেন না। প্রসঙ্গটি ইচ্ছে ক'রেই আমি উত্থাপন করেছি, কারণ চীনে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার হদিশ রাখা এক হিসেবে ভারতবর্ষের পক্ষে মস্ত প্রয়োজন। আমাদের আর্থিক অবস্থার প্রতিস্ব খুঁজতে হলে বাইরের পৃথিবীতে চীন ছাড়া অন্য কোনো দেশই নেই। না সোভিয়েট দেশ, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, না ব্রাজিল, না অন্য-কোথাও, একমাত্র চীনেই আমাদের মতো পুঞ্জ-পুঞ্জ সমস্যা ঃ শিল্প বিদ্যুৎ-পরিবহনের অভাব, কৃষিক্ষেত্রে জরাজীর্ণতা, জনসংখ্যাবৃদ্ধির বর্ধমান হার। চীনের যেমন, আমাদেরও প্রধানতম সমস্যা হলো পাঁচ লক্ষ গ্রামে ছড়ানো প্রায় পঁয়তিরিশ কোটি কৃষিজীবীর মন-বোঝা মন পাওয়ার সমস্যা ঃ কৃষি-উৎপাদন স্রোতস্বিনী না-হ'লে আমাদেরও মুক্তির আশা পরাহত।

১৯৫১ সালে দেশে আর্থিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে, কিন্তু এই বারো-তেরো বছরে কৃষির ব্যাপারে আমরা তেমন-কিছু অগ্রসর হয়েছি ব'লে মনে হয় না ; গত দু'তিন বছরে কৃষি-উৎপাদন আদৌ বাড়েনি। সর্বসাকুল্যে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভবত ১৯৫১ সালের তুলনায় শতকরা তিরিশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কৃষিজীবীর সংখ্যা বেড়েছে তারো বেশি হারে, অতএব কৃষকের গড় উৎপাদনের সূচক আসলে হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়া উৎপাদন যা বেড়েছে তা প্রধানত সম্ভব হয়েছে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়িয়ে, প্রণালীতে উৎকর্ষ থেকে আদৌ শস্যসম্ভার হয়নি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতি ছিল সম্পূর্ণ চাহিদার শতকরা পাঁচ ভাগ পরিমাণ ঃ এত অর্থব্যয়-অধ্যবসায়-আন্দোলন সত্ত্বেও ঘাটতির আনুপাতিক অঙ্ক একই রকম আছে, এবং এখনো প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ টনের মতো খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। আপাতত অবশ্য খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য অপরের সাহায্যে আহরণ করতে পারছি। কিন্তু পরদেশীদের মহানুভবতায় একদিন-না-একদিন ক্লান্তির ঢল নামবেই, আমরা ইতিমধ্যে যদি কৃষি উৎপাদনে উচ্চকিত বিপ্লব ঘটাতে না-পারি, তা হ'লে সহানুভূতির ঘড়াও শূন্যে গিয়ে

ঠেকবে, বাড়তি কৃষিজমিও আর অবশিষ্ট থাকবে না যে আবাদ বাড়িয়ে কোনোক্রমে সঙ্কট রোধ করবো। আমরা যে-তালে এগোচ্ছি তাতে মাঝে-মাঝে আশঙ্কা হয় শেষের সেদিন ভয়ংকর খুব বেশি দূরে নেই। এখন পর্যন্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের সঙ্গে কৃষি-উৎপাদন প্রসারের হার কোনোক্রমে পাল্লা দিতে পেরেছে, কিন্তু তাতে আত্মপ্রসাদের অবকাশ কোথায়? কৃষিপণ্যে উদ্‌বৃত্ত আমাদের অন্বিষ্ট, সে-উদ্‌বৃত্তের অভাবে শিল্প শ্লথগতি হবে, বৈদেশিক মুদ্রার অনটন অব্যাহত থাকবে নয় তো বাড়বে, কিছুতেই সেই আশ্বাসের ঋতুকে টেনে এনে হাজির করা যাবে না যার আবেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো, আমাদের বিজয়-কেতন ওড়াবার সময় আগত, আমাদের জন্য সব প্রস্তুত এবার আমরা হু-হু এগোবো। অন্য সব-কিছু ছেড়ে দিলেও, দেশের শতকরা সত্তর ভাগ কর্মজীবী এখনো কৃষি থেকে জীবিকা আহরণ করেন সুতরাং চাষবাদের হাল না-ফিরলে তাঁদের অবস্থাও ফেরবার নয়। তাঁদের অবস্থা উন্নত হ'লেই শিল্পেও উদ্দামগতি আসবে, তার আগে নয়। শিল্পজাত পণ্য কেনবার সঙ্গতি চাই দেশে, কৃষির প্রসার ঘটলেই তা সম্ভব। শিল্পে যে-মজুরসম্প্রদায় খাটবে, তাদের খাদ্যও আসবে কৃষিগত উদ্বৃত্ত থেকে, এবং এই একই উদ্বৃত্ত মেটাবে কাঁচামালের চাহিদা।

সোনারকাঠি-রূপোরকাঠি সব-কিছুই তাই কৃষিসম্পদ; এই সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি এখনো যেহেতু ধরাছোঁয়ার বাইরে, আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বত্র এক অপ্রচ্ছন্ন নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এই উৎকণ্ঠা এক হিসেবে ভালো ঃ উদ্‌বেগ থেকেই প্রশ্নের উৎস, আত্মবিশ্লেষণের আরম্ভ। এমন নয় যে কৃষির জন্য আদৌ কিছু করা হয়নি; সে-রকম অভিযোগ অন্যায় অনৃতভাষণ হবে। রাষ্ট্রের তরফ থেকে গত বারো-তেরো বছর অন্তত তিন হাজার কোটি টাকা কৃষিসম্প্রসারণে বিনিয়োগ করা হয়েছে; এই বিনিয়োগের অর্থ প্রায় সম্পূর্ণই অ-কৃষিজীবীদের কাছ থেকে এসেছে, কৃষকদের উপর করভার চাপিয়ে সংগ্রহ করা হয়নি। ভূমিসংস্কার যেটুকু হয়েছে তাতে বড়ো-বড়ো রাজা-মহারাজাদের একটু অসুবিধে হ'লেও অধিকাংশ ভূম্যধিকারীর আদৌ অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটেছে ব'লে মনে হয় না। রাষ্ট্রকর্তৃক সেচের জল বাড়াবার, উন্নত কৃষিপ্রণালী শেখাবার, শস্যের উচিত মূল্য বজায় রাখবার, উন্নত বীজশস্য এবং উৎকৃষ্ট সার পৌঁছবার হরেকরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে, হচ্ছে; কৃষিতে তা হ'লেও ব্যাপ্তি আসছে না কেন?

সন্দেহ না-হয়েই পারে না, আমাদের সমস্ত ব্যবস্থায় কোথাও একটা মস্ত ফাঁকি থেকে যাচ্ছে, গ্রামোন্নয়নের গঠন প্রণালীতে কোনো অবহেলা প্রবেশ করেছে। খুঁটিয়ে দেখলে অনেকগুলি অর্ধপ্রত্যয় মনে স্থান পাবে; হয়তো যে-সব সাহায্য বিলোনো হচ্ছে, অর্ধপথে তারা লক্ষভ্রষ্ট হচ্ছে। আমাদের পল্লীসমাজ এখনো অসাম্য দিয়ে ঘেরা ঃ শ্রেণী-ও বর্ণভেদহেতু অনাচার এখনো প্রচুর, সমাজতন্ত্রের ধুয়ো আওড়ানোর

সঙ্গে-সঙ্গে বিত্তবানদের সমৃদ্ধতর করবার সুযোগ-সুবিধে বাড়ছে বই কমছে না। কাগজে-কলমে পুঁথি-পত্রে সংবিধানে-সনদে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, যেহেতু গ্রামাঞ্চলে এখনো ধনীপক্ষই প্রবল, এমন হ'তে পারে সেচের জল, উন্নত বীজশস্য, রাসায়নিক সার সমস্ত-কিছুই উচ্চবিত্ত কৃষিজীবীদের করায়ত্ত হচ্ছে, সুতরাং রাষ্ট্রীয় সাহায্যের শুভফল সর্বব্যাপী হ'তে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে ব'লে শোনা গেছে, কৃষিপ্রসারের উদ্দেশ্যে যে-অর্থানুকূল্য করা হয়েছে, তা কতিপয় মহাজনের হাতে গিয়ে পড়েছে। এবং তাঁরা কৃষিকার্যে সে-অঙ্ক ব্যয় না-ক'রে হয় সুদে খাটাচ্ছেন, নয় মজুতদারিতে নিয়োগ করেছেন। সাদামাঠা হিশেব-নিকেশ থেকে মনে হয়, কৃষিক্ষেত্রে ধনবণ্টনের অসাম্য, গত দশ বারো বছরে, পরিকল্পনার নানা উদাত্ত বিঘোষণা সত্ত্বেও, আসলে বৃদ্ধিই পেয়েছে। আমাদের দেশের অন্তত এক-চতুর্থাংশ কৃষিজীবীর কোনো চাষের জমি নেই, আরেক চতুর্থাংশের জমির পরিমাণ গড়প্রতি চার-পাঁচ বিঘের বেশি নয়, অন্য পক্ষে নানা ভূমিসংস্কার আইনের পরেও, পুরো কৃষিভূমির অর্ধেকেরও বেশি উচ্চবিত্ত চাষীদের অধিকারে ঃ এঁরা সংখ্যায় সমগ্র কৃষককুলের মাত্র এক-দশমাংশ। সরকারি প্রসাদে সবচেয়ে সুবিধে হচ্ছে এই শাঁসালো মহাজন চাষীদেরই। সাধারণ মজুরচাষী অথবা ভাগ-চাষীদের মনে হতাশা এবং অনীহা উদ্রিক্ত হবেই। খাটবার বেলায় আমরা, কিন্তু লাভের বেলায় মহাজন, সুযোগ-সুবিধে ভোগ করবার বেলায় মহাজন। এরকম তিক্ততা একবার মনে প্রবেশ করলে উৎপাদনবৃদ্ধির মহান্ ব্রতে শ্রমজীবী-কৃষকশ্রেণীর সায়-সমর্থন পাওয়া সম্ভব নয়। শাঁসালো মহাজন হ'লেই কেউ যে কৃষিকর্মে সুনিপুণ হবেন এমন নয়, তাই এ-রকমও হয়েছে যে, মূল্যবান রাসায়নিক সার যে-জমিতে ঢালা দরকার সেখানে পৌঁছয়নি, কালো-বাজারে ঘুরে-ফিরে কোনো অপাত্রের হাতে গিয়ে ঠেকেছে, ভুল জমিতে অপব্যয়িত হয়েছে।

পণ্যমূল্য বেঁধে দিয়ে সরকার কৃষিজীবীদের ত্রাণ করার যে-প্রয়াস ক'রে থাকেন, উচ্চবিত্ত চাষীদের লাভের বহর তাতে অবশ্যই বেড়ে যায়, কিন্তু মজুরচাষীদের বরঞ্চ ক্ষতিই হয় বেশি। মজুরচাষীরা, এবং এমন কি ভাগ-চাষীরাও, কখনো-কখনো মহাজনদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে বাধ্য হন ঃ শস্যের মূল্য উর্ধ্বমান হ'লে যে-বাড়তি লাভ হয়, তার ছিটেফোঁটাও তাঁদের ভাগ্যে জোটে না, কিন্তু অন্য দিকে খিদের খাবারটুকু চড়া দাম দিয়েই কিনতে হয়।

অধিকাংশ কৃষকের অভাব-অসন্তোষের ভিত্তিতে নতুন পৃথিবী গড়া সম্ভব নয়, উৎপাদনে উদ্দাম বন্যার ঢল এ-অবস্থায় নামবার নয়। গণতন্ত্রের ছায়ায় যে-মস্ত পরীক্ষা আমাদের দেশে চলছে তাকে সফল করতে হ'লে তাই বিনম্রচিত্তে কৃষিসমস্যার উৎসানুসন্ধানে যেতে হবে, নিরপেক্ষ তুলাদণ্ড নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে কোথায়

স্খলন-পতন ঘটেছে, কোথায় কোন ধরনের উন্নতি সম্ভব। আমরা সর্বজ্ঞ নই, আমাদের ভুল হ'তে পারে, ভুল না-শোধরালে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এক দিকে প্রয়োজন এরূপ স্বীকৃতির ; অন্য দিকে, যাকে দেখতে পারি না তার আপাতবাক্য চলনেও কী জানি হয়তো কোনো অপরূপ মাধুরী লুকিয়ে থাকতে পারে, সে-রকম ঔদার্যেরও সমান প্রয়োজন। এই নির্দ্বিধা আত্মবিশ্লেষণের, এবং নির্মোহ পরানুশীলনের আরো বিলম্ব ঘটলে ঘোর অমঙ্গল ঃ সত্যিই আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।

১৯৬৪